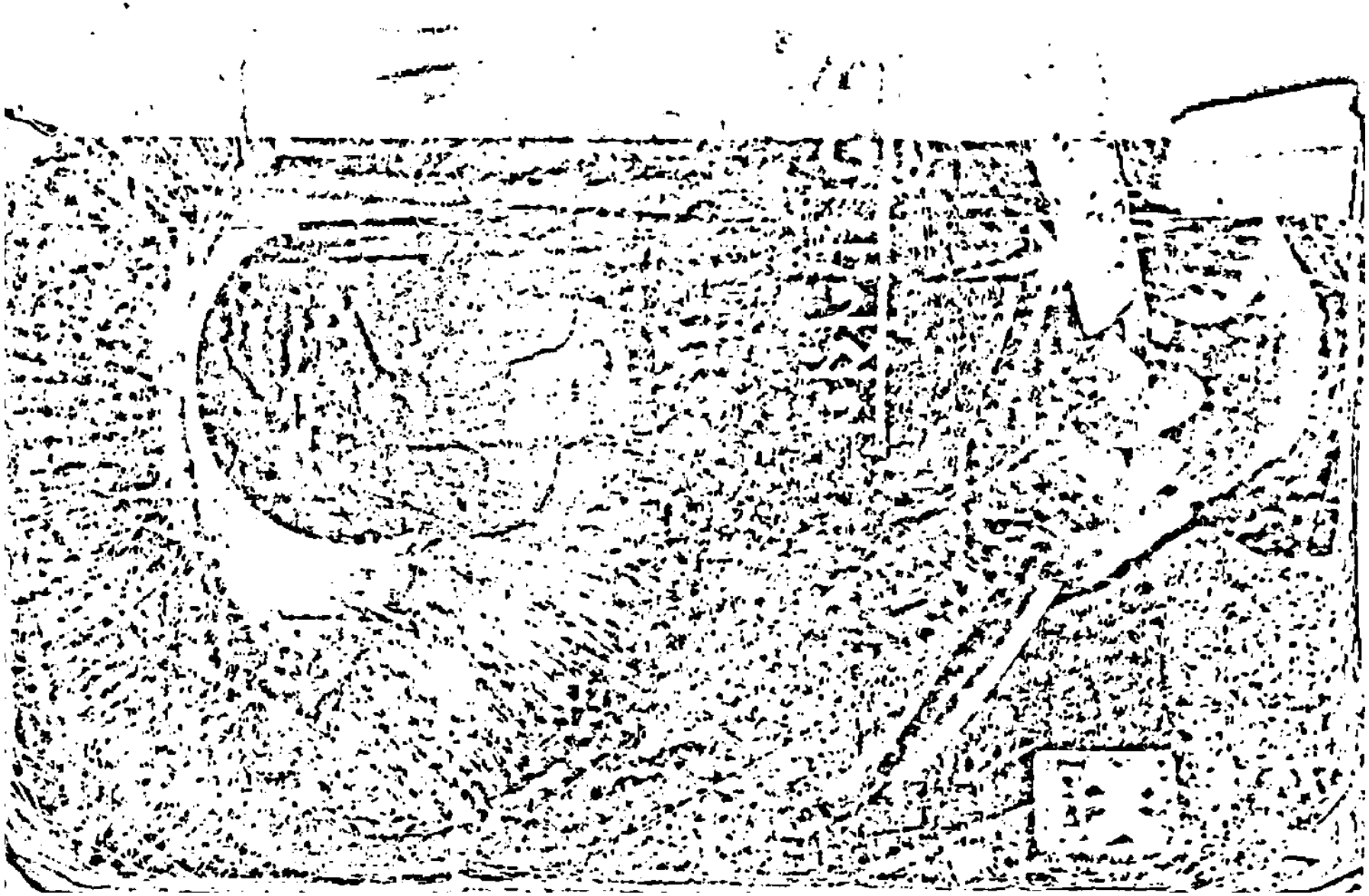

তৃতীয় নয়ন

একখণ্ডে সমাপ্ত আধি-ভৌতিক কাহিনী

রোকসানা নাজনীন

খুন হলেন শরীফ খান।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সদালাপী নির্বিরোধী
জাহিদ হাসানের দোরগোড়ায় এসে হাজির হ[illegible]
অকাট্য প্রমাণ রয়েছে তাদের হাতে, তিনিই
[illegible] জাহিদ হাসানের মাথায়
কী করে এদেরকে বিশ্বাস করাবেন খুন কেন[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

তৃতীয় নয়ন

রোকসানা নাজনীন

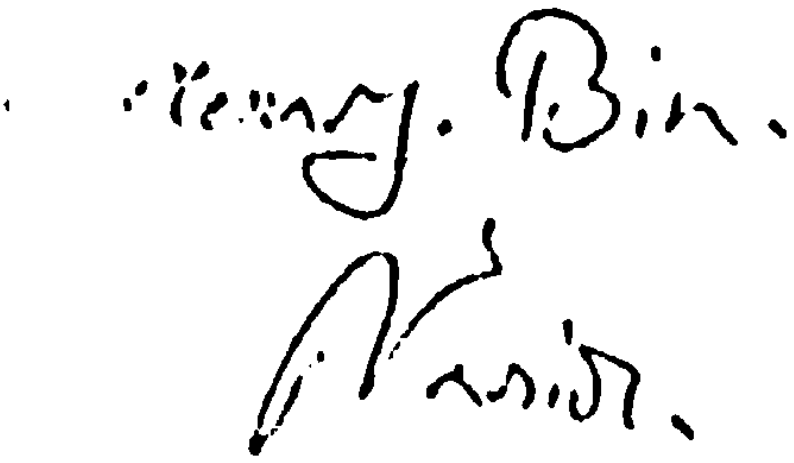

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি উপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন ঃ হলো না, রক্তা; দাঁড়াও পথিক-১, ২,বন্দিনী, বিষ

শেখ আবদুল হাকিম ঃ দড়াবাজ শাই-১, ২, কামিনী, আততায়ী-১, ২, বিষদাঁত

রকিব হাসান ঃ বিদেশ যাত্রা-১, ২, অবসর বিনোদন, মৃত্যুচুম্বন

ইউসুফ ফারুক ঃ দ্বীপ বিভীষিকা

উর্মি রহমান ঃ তাহলে কে, মধুচন্দ্রমা, ওরা কোথায়, রক্তাক্ত বড়দিন

শওকত হোসেন ঃ রানওয়ে জিরো এইট, শুভ্রশত্রু, অন্তর্ঘাত, উপদ্রব, সন্ত্রাস

হিফজুর রহমান ঃ ধূসর দেয়াল, অতল প্রলোভন

সুধাময় কর ঃ কামিনী কাঞ্চন-১, ২

কাজি মাহবুব হোসেন ঃ গ্যালাক্সি পেরিয়ে, উত্তরাধিকার

মোবারক হোসেন খান ঃ হত্যাকারী

বিশু চৌধুরী ঃ ছায়া শিকারী-১, ২, অন্ধচক্র

হাসান উৎপল ঃ ফেরারী, মৃত্যুদূত

মামনুন শফিক ঃ নগ্নমুখ

রওশন জামিল/কাজী আনোয়ার হোসেন ঃ দাগী আসামী-১, ২

নিয়াজ মোরশেদ/কাজী আনোয়ার হোসেন ঃ স্যাবটাজ-১, ২

নিয়াজ মোরশেদ ঃ মরণ ফাঁদ-১, ২, বন্দীশিবির-১, ২

মার্থা মেকেনা ঃ আমি গুপ্তচর

সেলিম হোসেন টিপু ঃ গুপ্তা, শোধ নেবে?

মোস্তাফিজুর রহমান ঃ আমি উন্মাদ?

খন্দকার মজহারুল করিম ঃ সব মানুষের পৃথিবী

ইফতেখার আমিন ঃ মরীচিকা-১, ২, ক্ষুরদাঁত

কাজী সারওয়ার হোসেন ঃ আড়াল

বাবুল আলম ঃ নর্তক, ডোবারম্যান

মোনা চৌধুরী ঃ তিন মিনারে খুন

মানুষের জীবন—দৈহিক সত্তার বাইরে সত্যিকারের যে জীবন—তা যে-কোন বয়সেই শুরু হতে পারে। জাহিদ হাসানের সত্যিকারের জন্ম হয় ১৯৬০ সালে, যখন ওর বয়স এগারো বছর। ওই বছর ওর জীবনে দুটো ঘটনা ঘটে। প্রথমটি ওর ভবিষ্যৎ জীবনের অনুপ্রেরণা জোগায়, আর দ্বিতীয়টি ওর জীবন প্রায় শেষ করে এনেছিল।

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র জাহিদ আন্তঃস্কুল রচনা প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করে নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার পায়। সেটা ছিল জানুয়ারি মাস। পুত্র-গর্বে গর্বিত জাহিদের মা-বাবা প্রতিবেশী এবং আত্মীয় পরিজনদের ভুরিভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন। সেই উৎসবের রাতে এক অতিথির প্রশ্নের উত্তরে জাহিদ বলেছিল বড় হয়ে সে লেখক হতে চায়। বাবা আবুল হাসানের হাস্যোজ্জ্বল চোখে ছায়া নেমে আসে। হাত ধরে ওকে তিনি বাইরে বাগানে নিয়ে এলেন।

'জাহিদ, একটু আগে কাশেম চাচাকে যা বললে সেটা কি তোমার মনের কথা?' একটু ভারি শোনায় তাঁর কণ্ঠ।

'হ্যাঁ, বাবা,' ভয়ে ভয়ে বলেছিল জাহিদ। ও ঠিক বুঝতে পারছিল না অপরাধটা কোথায় হয়েছে।

'হুঁ।' এরপর কয়েক মিনিট কোন কথা না বলে জাহিদের হাত ধরে বাগানের মাঝখানের সুরকি বিছানো পথটায় পায়চারি করলেন তিনি। অবশেষে বললেন, 'দ্যাখ, জাহিদ, তুমি আমাদের একমাত্র ছেলে। তোমার উপর আমাদের অনেক আশা। আমি চাই তুমি ডাক্তার বা

ইঞ্জিনিয়ার হবে। লেখকদের জীবন বড় অনিশ্চিত, আমি চাই না জীবনে তুমি কোন কষ্ট পাও। কি বললাম তা হয়ত তুমি এখন বুঝতে পারবে না, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে মানুষের জীবনে কোন লক্ষ্য না থাকলে ভবিষ্যতে উন্নতি হয় না। তাই এখনি তোমাকে কথাটা বললাম।"

আবুল হাসান সাহেব পেশায় ছিলেন নৌ বাহিনীর অফিসার। প্রখর নিয়মানুবর্তিতা ছিল তাঁর অস্থিমজ্জায়। স্বভাবে ছিলেন দয়ালু এবং পরোপকারী। চাকরিসূত্রে দেশের বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হলেও জাহিদের ছেলেবেলা কেটেছে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায়। আবুল হাসান সাহেব নিজেও ছিলেন তাঁর বাবা-মার একমাত্র সন্তান। তাই পতেঙ্গার পৈতৃক সূত্রে পাওয়া বাড়িটার ভাগীদার না থাকাতে চট্টগ্রামে পোস্টিং পাবার পর ওখানেই স্থায়ীভাবে থেকে গেলেন। মাঝে মাঝে তাকে বাইরে যেতে হলেও জাহিদ ও তার মা বরাবর পতেঙ্গাতেই থেকেছে। লাল ইঁটের তৈরি পুরানো দোতলা বাড়ি এবং কয়েক একর নিয়ে বিছিয়ে থাকা ঘন গাছপালা ঢাকা বাগানে জাহিদের শৈশব এবং কৈশোর কেটেছে চমৎকার। তবে বাবার সঙ্গে এই ছোট্ট আলাপচারিতা ওর সাফল্যের আনন্দে অনেকখানি জল ঢেলে দিল।

১৯৬০ সালে দ্বিতীয় যে ঘটনাটি ঘটে, তা শুরু হয়েছিল মার্চ মাসে। মাথাব্যথা। প্রথমে অতটা কষ্ট দিত না। সপ্তায় দু'সপ্তায় একবার দেখা দিত। কিন্তু রমজানের ছুটির পর স্কুল খুলতেই মৃদু চাপ চাপ ব্যথাটা মাথার সামনে থেকে পিছনে ছড়িয়ে ধীরে ধীরে ঘাড়ের দিকে নেমে আসতে থাকল। একই সঙ্গে বাড়তে লাগল কষ্ট। অবশেষে এমন হল যে মাথাব্যথা শুরু হলে অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে বালিশে মাথা গুঁজে ছটফট করতে করতে জাহিদ মৃত্যু কামনা করত। চোখে এক ফোঁটা আলো গেলে ঝিনঝিন করে উঠত সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী, শ্বাস নেবার মত যথেষ্ট অক্সিজেন থাকত না বাতাসে। কোন অষুধপত্রেই কাজ হল

না। বড় বড় ডাক্তার দেখানো হল। হাসান দম্পতি পাশে বসে থেকে সন্তানের কষ্ট দেখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলেন না।

এই মাথাব্যথা শুরু হবার একটা লক্ষণ ছিল। শত শত হাজার হাজার পাখির কলধ্বনি আর ডানা ঝাপটানর শব্দ শুনতে পেত জাহিদ, মনে হত যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। বলাবাহুল্য আর কেউ তা শুনতে পেত না। কিন্তু অভিজ্ঞতাটা এতই বাস্তব ছিল যে জাহিদের মনে হত পাখিগুলোকে ও দেখতেও পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ও জানত পাখিগুলো চড়ুই—সার বেঁধে বসে আছে টেলিফোনের তারে, গাছের ডালে, বাড়ির ছাদে—সর্বত্র।

কোরবানীর ঈদের ঠিক দু'দিন আগে জাহিদের স্কুল থেকে ফোন এল। মাঠে খেলতে খেলতে জাহিদ হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। অনেক চেষ্টা করেও জ্ঞান ফেরাতে না পেরে অ্যাম্বুলেন্সে করে ওকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওর বাবা তখন অফিসে। মিসেস হাসান ছুটলেন হাসপাতালে।

সন্ধ্যার আগেই জাহিদের জ্ঞান ফিরে এল। তখন ও সম্পূর্ণ সুস্থ। কষ্টের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক আরও দু'দিন জাহিদকে হাসপাতালে আটকে রাখলেন কিছু টেস্ট করার জন্যে।

দু'দিন পর নিউরোলজিস্ট রফিক উদ্দীনের অফিসে ডাক পড়ল হাসান সাহেব আর তাঁর স্ত্রীর। ভদ্রলোক কথাবার্তায় আন্তরিক, নামকরা অন্যান্য বড় ডাক্তারদের মত অধৈর্য নন।

'লক্ষণ দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক আপনাদের ছেলের মৃগীরোগ হয়েছে,' চশমার ভারী কাঁচ মুহূর্তে মুহূর্তে বললেন তিনি, 'কিন্তু আমার তা মনে হয় না।'

কি বলবেন বুঝতে পারলেন না হাসান সাহেব।

টেবিলের উপর রাখা কটা-হলদে রঙের বড় একটা খাম থেকে এক্স-রে শীট বের করলেন ডাক্তার। 'মৃগী হলে সেটা "গ্র্যাণ্ড মল্"

টাইপের হত, অন্তত লক্ষণ তাই বলে। কিন্তু জাহিদ "লিটন লাইট টেক্টে বিয়্যাক্ট" করেনি।'

'তাতে কি বোঝায়?' হাসান সাহেব রীতিমত বিরক্ত হলেন। ডাক্তাররা কি সহজ ভাষায় কথা বলতে পারেন না।

'তার মানে এটা মৃগী নয়। বিশেষ করে এর আগে এরকম যখন আর হয়নি।' এবার তিনি এক্স-রে শীটটা হাসান সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিলেন, 'যে জায়গাটা হলুদ পেন্সিল দিয়ে দাগিয়ে রেখেছি, সেটা ভাল করে দেখুন।'

মাথার এক্স-রে। লাগিয়ে রাখা জায়গাটা আবছা কালচে একটা ছায়া। হাসান সাহেব কিছুই বুঝলেন না। মিসেস হাসান ফ্যাকাসে মুখে এক্স-রেটা টেনে নিয়ে দেখতে লাগলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

স্থির চোখে চেয়ে আছেন ডাক্তার। 'যতদূর মনে হচ্ছে ওর মগজে একটা টিউমার রয়েছে। মাথাব্যথার কারণটাও এই টিউমার।'

ঘরের মধ্যে বাজ পড়ল। মিসেস হাসান অস্ফুট আর্তনাদ করে স্বামীর বাহু আঁকড়ে ধরলেন। হাসান সাহেবের মনে হল তিনি নিজের মৃত্যুদণ্ড শুনলেন। অনেকক্ষণ পর অনেক চেষ্টা করে শুধু বললেন, 'ও আমাদের একমাত্র ছেলে।'

ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে হাসান সাহেবের কাঁধে হাত রাখলেন। "আমারও জাহিদের বয়সী ছেলে আছে। আপনি সচ্ছল লোক। ওকে বিদেশের কোন হাসপাতালে নিয়ে যান। লণ্ডনে এ ধরনের বেশ ক'টা সার্জারি হয়েছে। মিথ্যে আশা আপনাকে দেব না। বিদেশে নিলে অন্তত চেষ্টা করা হবে। এদেশে এর কোন চিকিৎসা নেই। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত, টিউমারটা এখনও বেশ ছোট, আপনার ছেলের যথেষ্ট আশা রয়েছে।'

ডাক্তার রফিক উদ্দীনই লণ্ডনের হাসপাতালে জাহিদের চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। দেড় মাসের মধ্যে হাসান সাহেব জাহিদকে

নিয়ে শওনে পৌছে গেলেন। এক সপ্তাহ পরে অপারেশনের তারিখ দেয়া হল।

এটা ডক্টর জে. ম্যাকলিনের তৃতীয় ব্রেন টিউমার অপারেশন। অপারেশন থিয়েটারে ঢুকে প্রথমেই তিনি সহকারী ডাক্তার এবং নার্সদের উদ্দেশ্যে পরবর্তী কয়েক ঘন্টার কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিলেন। তারপর তৎপরতার সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন। প্রথম বিশ মিনিট প্রাণরক্ষাকারী বিদ্যুতে যন্ত্রটার হিসহিস, খুলি কাটার করাতের (NEGLI SAW) গা শিউরানো শব্দ আর চাপা গলায় যন্ত্রপাতি এগিয়ে দেবার জন্যে ডাক্তার ম্যাকলিনের আদেশ ছাড়া কোন শব্দ শোনা যায়নি।

সহকারী ও. আর. নার্সই প্রথমে দেখল।

মহিলার উঁচু পর্দার বিলম্বিত চিৎকার মুহূর্তের জন্যে উপস্থিত প্রতিটা মানুষের হৃৎপিণ্ডে ছুরি বসিয়ে দিল। প্রচণ্ড ভয়ে সে পিছিয়ে আসতে লাগল, বাঁ হাতে মুখ চেপে ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করছে বুকচেরা আর্তনাদটা গিলে ফেলতে। পিছাতে গিয়ে ধাক্কা খেল রস্ ট্রের সাথে। ঝনঝন শব্দ করে মেঝেতে ছিটকে পড়ল ছোটবড় দুই ডজন যন্ত্রপাতি, একটু আগে ও নিজেই এগুলো সাজিয়ে রেখেছিল ট্রের ওপর।

'প্যাম!' হেড নার্স ধমকে উঠল দরজার দিকে ধেয়ে যাওয়া নার্সের উদ্দেশ্যে, কিন্তু খেয়াল করেনি নিজেও ওকে অনুসরণ করার জন্যে পা বাড়িয়েছে, ভয় এমনি সংক্রামক!

ডক্টর হেমিংস্, যিনি ম্যাকলিনকে সাহায্য করছেন, ও.টি.-তে ব্যবহারের কাপড়ের মোজা পরা পায়ে হেড নার্সের পায়ে ছোট্ট চাঁটি কষালেন, 'ভুলে যেয়ো না কোথায় আছ!'

'ইয়েস, ডক্টর!' সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল হেড নার্স, বহু কষ্টে চোখ সরিয়ে নিল দরজা থেকে। এখান থেকেও যেন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে

করিডরে প্যামের আর্তনাদ, মনে হচ্ছে ভূতে তাড়া করেছে ওকে।

ডক্টর ম্যাকলিনকে দেখে মনে হচ্ছে এসব কিছুই তিনি লক্ষ্য করেননি। গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি চেয়ে আছেন জাহিদের মাথার খুলিতে কাটা ছোট্ট জানালাটার দিকে।

'অদ্ভুত!' বিড়বিড় করে বললেন তিনি, 'আশ্চর্য! বই পত্রেও এমন ঘটনা পড়িনি! নিজের চোখে যদি না দেখতাম—'

স্টেরিলাইজারের হিস হিস শব্দে তাঁর চমক ভাঙল, সরাসরি তাকালেন ডক্টর হেমিংসের দিকে।

'সাক্‌শন! সাক্‌শন চাই এক্ষুণি! তারপর তোমাকে একটা জিনিস দেখাব, বব্, বাজি ধরতে পারি তুমি কেন, তোমার চোদ্দপুরুষ কেউই এমনটা দেখেনি!'

রবার্ট হেমিংস্ যতটা দ্রুত সম্ভব সাকশন পাম্পটা নিয়ে এলেন গড়িয়ে. উত্তেজনায় ঘামতে শুরু করেছেন। হেড নার্স ইতিমধ্যে মেঝেতে ছড়ানো যন্ত্রপাতি সরিয়ে ট্রেতে নতুন সেট সাজিয়ে ফেলেছে।

ম্যাকলিন এবার অ্যানেসথেশিওলজিস্টের দিকে চাইলেন।

'একটা ভাল বি.পি. চাই, বন্ধু, আর কিছু না।'

'ওয়ান-ও-ফাইভ ওভার সিক্সটি-এইট। এর চেয়ে ভাল কিছু হতেই পারে না,' উত্তেজনা সংক্রমিত হয়েছে তাঁর মধ্যেও।

হেমিংস সাক্‌শন ব্যবহার করে অতিরিক্ত রক্ত শুষে নিলেন ধীরে ধীরে। মনিটরিং ইকুইপমেন্টের একঘেয়ে বিপ বিপ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। নাহ! আর রক্ত নেই। কৌতূহলী চোখে তাকালেন তিনি সদ্য পরিষ্কার করা গর্তটার ভিতরে, সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কেউ যেন লাথি কষিয়েছে তলপেটে।

'ও, মাই গড! ওহ্, যিসাস ক্রাইস্ট!' মাস্ক এবং টুপিতে ঢাকা থাকায় শুধু চশমার পিছনে হেমিংসের ভয় পাওয়া গোল-গোল চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। 'এটা---এটা কি?'

'যা দেখছ তাই,' ম্যাকলিন শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'ঈভৎস, কিন্তু সত্যি। এরকম সম্ভাবনার কথা বইতে পড়েছি, কিন্তু কখনও কোথাও ঘটেছে কিনা জানি না। নিজের চোখে দেখব তা চিন্তাও করিনি।'

জাহিদ হাসানের ধূসর-গোলাপি মগজের মসৃণ জমি থেকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে একটা চোখ। বিকৃত কিন্তু জ্যান্ত একটা চোখ। মগজটা একটু একটু কাঁপছে, সঙ্গে সঙ্গে কাঁপছে ভৌতিক চোখটাও! হেমিংস মর্মে মর্মে বুঝলেন শ্যাম কেন দৌড়ে পালিয়েছে।

'হায় আল্লাহ্! এটা কি!' আবার বিড়বিড় করে একই সুরে বলে উঠলেন হেমিংস।

'কিচ্ছু না,' ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ম্যাকলিন। 'কোন এক সময় জীবন্ত মানবদেহের অংশ ছিল। এখন এটা ঝামেলা ছাড়া আর কিছু না। আর এই ঝামেলাটা ঝেঁটিয়ে বিদায় করা কঠিন কিছু নয়।'

অ্যানেসথিশিওলজিস্ট এবার গলা বাড়ালেন, 'স্যার, আমি একটু দেখতে পারি?'

'রোগীর অবস্থা কেমন?'

'একদম ঠিক।'

'তাহলে আসুন। ভবিষ্যতে নাতি-নাতনিদের কাছে গল্প করতে পারবেন। তবে তাড়াতাড়ি করুন।'

দেখার পর ভদ্রলোক ভাবলেন না দেখলেই ভাল হত। দুঃস্বপ্নের মধ্যে তাড়া করে ফিরবে চোখটা কতদিন কে জানে!

ডক্টর ম্যাকলিন ফিরলেন তাঁর দিকে। 'নেগলিটা চাই। খুলির ফুটো আর একটু বড় করতে হবে। এরপর ওটা ধরব। আমি জানিনা পুরোটা তুলে আনতে পারব কি না, তবে যতটুকু পারা যায় ততটুকুই লাভ।'

অ্যানেসথেশিওলজিস্ট এখন অনুপস্থিত শ্যামের জায়গা নিয়েছেন। চাওয়ামাত্রই স্টেরিলাইজ করা প্রোবটা ম্যাকলিনের বাড়ানো হাতে তুলে দিলেন। ম্যাকলিন গুনগুন করে কি একটা সুর ভাঁজছেন আর একমনে

কাজ করে চলেছেন। আশ্চর্য নার্ভ ভদ্রলোকের!

চোখটার সঙ্গে আরও পাওয়া গেল নাকের কিছু অংশ, তিনটে নখ, দুটো দাঁত। চোখটা কেটে আনার আগে নিডল্ ফালপেল দিয়ে খুঁটে দেবার সময় ডক্টর ম্যাকলিনের মনে হল যেন চোখটা নড়ে উঠল। অজান্তেই শিউরে উঠলেন তিনি। আধ ঘন্টার মধ্যেই সব কাজ হয়ে গেল। জাহিদের কামানো মাথার পাশে রাখা রস্ ট্রেতে জমা পড়ল পাঁচটা ছোট ছোট ভিজে ঘিনঘিনে মাংসের ডেলা।

'মনে হয় সবটুকুই বের করতে পেরেছি,' অবশেষে ঘোষণা করলেন ডক্টর ম্যাকলিন। 'ফরেন টিস্যুগুলো রুডিমেন্টারি গ্যাঙগ্লিয়া দিয়ে যুক্ত ছিল। কিছু অংশ যদি ভেতরে থেকেও থাকে, আমার মনে হয় সেটুকু আর জ্যান্ত নেই।'

'কিন্তু সেটা কেমন করে হয়! ছেলেটা তো এখনও পর্যন্ত জ্যান্ত! মানে...বলতে চাচ্ছিলাম যে এগুলো তো ওর দেহেরই অংশ। তাই নয় কি?' অ্যানেসথেশিওলজিস্ট আমতা আমতা করে প্রশ্ন করলেন।

তর্জনী তুলে ট্রের দিকে তাক করলেন ম্যাকলিন। 'কি কি পেয়েছি আমরা? একটা চোখ, কয়টা দাঁত আর নখ। তা-ও ছেলেটার মগজ থেকে। আপনি এখনও ভাবছেন ওগুলো ওর দেহের অংশ? আপনি পরীক্ষা করে দেখুন তো ছেলেটার চোখ, দাঁত আর নখ সব জায়গামত আছে কিনা, নাকি খোয়া গিয়েছে!'

'কিন্তু...স্যার, ক্যানসারও তো রোগীর দেহেরই অংশ...'

'এটা ক্যানসার নয়।' ম্যাকলিনের হাত কিন্তু থেমে নেই, কথা বলতে বলতেই কাজ করে চলেছেন তিনি। 'ভ্রূণ অবস্থায় মানবশিশু যখন জীবন শুরু করে, অনেক সময়ই তা শুরু হয় যমজ ভ্রূণ থেকে। এমনকি প্রতি ১০ জনের মধ্যে ২ জনের ক্ষেত্রেই এটা হতে পারে। একটা ভ্রূণ পুরোপুরি মানবদেহে পরিণত হয়। বাকি ভ্রূণটার ভাগ্যে কি লেখা থাকে? শক্তিশালী ভ্রূণটাই যুদ্ধে টিকে যায় দুর্বলটাকে আত্মসাৎ

করে!'

'আত্মসাৎ করে!' তাঁকে উদ্বিগ্ন দেখায়। 'আপনি বলতে চাইছেন শক্তিশালী ভ্রূণ দুর্বলটাকে খেয়ে নেয়! ইন্ট্রাইউটেরাইন-ক্যানিবালিজম!'

'যা খুশি নাম দিতে পারেন, এটা খুবই ব্যতিক্রমী ঘটনা। তবে আমরা যত বা দেখলাম তা একেবারেই অস্বাভাবিক। ছেলেটার যমজ ভ্রূণের কিছু অংশ পুরোপুরি নষ্ট হয়নি। সেটুকু অংশই নিয়েছে ছেলেটার মস্তিষ্কের প্রিফ্রন্টাল লোবে। মস্তিষ্ক না হয়ে পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড, যেকোনও যে কোন জায়গাতেই টিস্যুগুলো বাসা বাঁধতে পারত,' ম্যাকলিনের হাত চলছে।

'আশ্চর্য!'

'কোন কারণে টিস্যুগুলো বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কেন তা হয়ত কোনদিনই জানা যাবে না। ছেলেটার মাথাব্যথার শুরুও সম্ভবত তখন থেকে। শুধুমাত্র ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশারেই মাথাব্যথা এবং আনুষঙ্গিক শারীরিক কষ্টের জন্যে যথেষ্ট।'

'কিন্তু...কেন এরকমটা হল!'

'ত্রিশ বছর পরে প্রশ্নটা করলে হয়ত উত্তর দিতে পারতাম। এ মুহূর্তে শুধু এটুকুই জানি, ছেলেটার মগজ থেকে দুর্ভাগা একটা "বেনাইন টিউমার" সরিয়েছি। ছেলেটার বাবাও যেন এর চেয়ে বেশি কিছু না জানে। ভয় পাইয়ে কি লাভ! যেমন ভাল হয়ে উঠবে এটাই ভদ্রলোকের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উনি বলছিলেন ছেলেটা নাকি ভবিষ্যতের শেক্সপিয়ার,' একটুক্ষণ থেমে কি যেন ভাবলেন ডক্টর ম্যাকলিন, তারপর উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'যে নার্সটি বেকুবের মত চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে গেল, ওকে এই হাসপাতালে আমি আর চাই না।'

'ইয়েস, ডক্টর।'

ঠিক এক মাস পর জাহিদ দেশের পথে বিমানে চাপল বাবার সঙ্গে।

প্রায় ছ'মাস শরীরের বাম দিকে ও কোন জোর পেত না, একটু পরিশ্রম করলেই চোখে রঙধনু খেলত। তবে ধীরে ধীরে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল জাহিদ। অপারেশনের পর পাখির কাকলি আর শুনতে পায়নি ও একদিনের জন্যেও।

এক

২৩ মে ১৯৯২-র 'সাপ্তাহিক শনিবার'-এর সংখ্যাটা অন্যান্যবারের চেয়ে কোনদিক দিয়েই অসাধারণ ছিল না। প্রচ্ছদে বিরোধী দলীয় এক রাজনৈতিক নেতার ক্লোজ আপ, ভেতরে সাক্ষাৎকার। বার্সেলোনা অলিম্পিকের জন্যে নির্বাচিত বাংলাদেশ দলের খবরাখবর। সৌদুকের শিকার আসিয়া বেগমের আত্মহত্যা। আন্তর্জাতিক খবরের মধ্যে আছে আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী বুশ এবং ক্লিনটনের সম্পর্কে কিছু ভবিষ্যৎবাণী আর ফারিয়েডোর গৃহযুদ্ধ।

তবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক জাহিদ হাসান ওসব কিছু পড়ছিল না। পত্রিকার তেত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠাটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল সে। শিরোনামে বড় বড় করে ছাপা আছে 'ডক্টর জাহিদ হাসানঃ না বলা এক অতীত।'

'সাপ্তাহিক শনিবার' ঢাকার প্রথম সারির পত্রিকা। একটু আগেই সম্পাদক নির্মল হাজারি ফোনে জানিয়েছেন এ হপ্তার সংস্করণ গরম কেকের মত বিকিয়েছে। কিন্তু জাহিদ হাসান কেন যেন কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। মোনা সকাল থেকেই লক্ষ্য করছে পত্রিকাটা হাতে পাওয়ার পর থেকেই জাহিদ চুপ মেরে আছে। রূপক আর রুমকি, ওদের দশ মাসের যমজ ছেলেমেয়েকে গোসল করাতে বাথরুম থেকেই একটু উঁচু গলায় চেঁচিয়ে উঠল মোনা, 'কি ব্যাপার, জাহিদ? তোমার কি কোন

অনুশোচনা হচ্ছে? সকাল থেকে যে একনাগাড়ে বসে পড়ছের ছানা!'

দূর থেকে একটু অস্পষ্ট শোনালেও তাঁহাদের বুঝতে কোন অসুবিধা হল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও. 'প্রথমত, এটা একা আমার সিদ্ধান্ত ছিল না। দু'জনেই আমরা এক সাথে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।' [illegible] মোনা আর ওর [illegible] ছবিটার [illegible] কোন [illegible] একটা [illegible] না, দু'জনকেই দেখাচ্ছে এক [illegible]।

[illegible] মোনা কাচ ভাঙা [illegible] মাকে হাসতে দেখে [illegible] ওদেরকে [illegible] শুরু করল মোনা। 'তুমি যাই বল না কেন, আমার মনে হয় আমরা ঠিক কাজটাই করেছি। যতদিন বাপেরটা [illegible] ছিল, কেন যেন আমি কিছুতেই স্বস্তি পেতাম না।'

মূল ছবিটা ছাড়াও আধ পৃষ্ঠা জুড়ে ছাপা হয়েছে আর একটা ছবি। চোখে না পড়েই যায় না এমন একটা ছবি। ছবিতে জাহিদ হাসানের হাতে একটা কোদাল, মোনা দাঁড়িয়ে আছে পাশে। ওদের বাঁ দিকে দেখা যাচ্ছে একটা সমাধি। পায়ের কাছে ফুলের তোড়া। সমাধি স্তম্ভে লেখা প্রতিটা শব্দ পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে।

কল্লম শের

১৯৮৩—১৯৯১

মন্দ এক লোক ছিল সে

বলাবাহুল্য এটা একটা সাজানো ছবি। 'শনিবারের' এক নাম্বার রিপোর্টার খান জয়নুল তার উদ্ভাবনী শক্তির পুরোটাই ব্যবহার করেছে

দৃশ্যটাকে নাটকীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে। ছবিটা তুলেছে আর্ট কাগজের ছবিটি ফ্রি ল্যান্সার সোহানা মল্লিক। তবে ছবির পরিকল্পনার পুরোটাই মাথা জয়নুলের। সোহানাও এতে মজা কম পায়নি। 'হাসুন...হাসুন...একটু ডানদিকে...ব্যাস্! দারুণ!' বলতে বলতে খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠেছিল সে। জাহিদ কেন যেন তখন অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে ছিল নকল সমাধি ফলকটার অবাস্তব লেখাগুলোর দিকে।

অবাক হয়ে গেছিল সে।

সত্যিই, সাংবাদিক মেয়েটা কোত্থেকে জোগাড় করল ফলকটা! একেবারে আসল বলে মনে হচ্ছে।

দু'পৃষ্ঠা সুদীর্ঘ হলেও আর্টিকেলটার বিষয়বস্তু খুবই সহজ সরল। প্রফেসর জাহিদ হাসান তাঁর শিক্ষক পরিচয়ের বাইরেও একজন বিখ্যাত লেখক। তাঁর লেখা তিনটি বইয়ের মধ্যে একটা বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু সমালোচকরা ছাড়া সাধারণ মানুষ তাঁর লেখা নিয়ে একটুও মাথা ঘামায়নি। অর্থাৎ জাহিদ হাসানের লেখা বই বিক্রি হয়নি।

মানুষ যাকে গ্রহণ করেছে সে আদৌ রক্তমাংসের মানুষই নয়, কাল্পনিক এক চরিত্র মাত্র। জাহিদ হাসান, 'রুস্তম শের' ছদ্মনাম নিয়ে পর পর চারটি রহস্য কাহিনী লেখেন যার প্রতিটা রেকর্ড পরিমাণ সাফল্য বয়ে আনে—আর্থিক এবং পরিচিতি দু'দিক থেকেই। কিন্তু আজকের আগে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি জাহিদ হাসান আর রুস্তম শের একই ব্যক্তি। এতদিন রুস্তম শের তার সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মতই ছিল রহস্যে মোড়া, আজ যবনিকাপাত হল। হালকা বিষয়বস্তু নিয়ে লেখার লজ্জাই জাহিদকে ছদ্মনাম নিতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু আজ ঝোলার বেড়াল বের হয়ে যাওয়ার পর জাহিদ অস্বীকার করতে পারছে না, লজ্জার বাইরেও এ এক মুক্তির আনন্দ। সাহিত্যের আসরে জাহিদ

হাসানের সমাদর এতে কমে যাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু গোপনীয়তার বেড়াজাল ছিল এর চেয়েও বেশি বেদনাদায়ক।

সাক্ষাৎকার নেবার সময় খান জয়নুল প্রশ্ন করেছিল, 'আচ্ছা, জাহিদ ভাই, রুস্তম শের কেমন লোক ছিল?'

মৃদু হেসে জাহিদ উত্তর দিয়েছিল, 'মন্দ লোক ছিল সে।' সমাধি ফলকে এই মন্তব্যটাই ব্যবহার করেছে খান জয়নুল।

নাটকীয়তাই আজকাল প্রচারের মূলধন। কি অদ্ভুত ছেলেমানুষী।

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল জাহিদ মোনাকে চমকে দিয়ে।

ছবিটার শিরোনামে লেখা হয়েছে, 'মৃতব্যক্তি এদের দু'জনেরই অতি পরিচিত ছিলেন। তাহলে এই দম্পতি হাসছেন কেন?'

'কারণ প্রতিটা মানুষই অদ্ভুত এক জন্তু,' হাসতে হাসতে নিজের মনেই বলে উঠল জাহিদ। তারপরই নানান কথা মনে আসতে লাগল। কেন এই লেখাটা আমাকে এত বিব্রত করছে? সহকর্মীদের টিটকারির ভয়? ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রদ্ধা হারানর ভয়? এই লেখাটা এতদিনের শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনে কতটুকু আলোড়নই বা তুলতে পারে! নাহ্! এসব কিছু নয়। জেনেশুনেই তো পুরো ব্যাপারটাতে সম্মতি দিয়েছে সে। হঠাৎ করেই বুঝতে পারল জাহিদ—সমাধি ফলকটা।

রুস্তম শের

১৯৮৩—১৯৯১

মন্দ এক লোক ছিল সে

গোটা গোটা কালো অক্ষরগুলোই বিব্রত করছে ওকে। শব্দ করে পত্রিকাটা আছড়ে ফেলল জাহিদ কফি টেবিলের ওপর।

'তাতে কিইবা আসে যায়!' বিড়বিড় করে নিজেকে শোনাল, 'বেজন্মাটা এখন মৃত।'

বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে কটে শুইয়ে দিয়ে মোনা লিভিংরুমে এল, 'অ্যাই, চা খাবে?'

কিন্তু তা কানে গেল না জাহিদের, একদৃষ্টে চেয়ে আছে ও মোনার টানা টানা কাজল কালো চোখের দিকে, 'আচ্ছা, মোনা, রুস্তম শেরকে কি আমি খুন করেছি?'

'কি যে ছাই আজেবাজে বকছ তুমিই জান!' বিরক্ত হয়ে মোনা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল, হয়ত চা বানাতে।

জাহিদ সিড়ি বেয়ে ওপর তলার স্টাডিতে উঠে এল। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেই ওদের কোয়ার্টার, তবে হেঁটে যাবার জন্যে ডিপার্টমেন্ট একটু দূর হয়ে যায়। জাহিদ সাধারণত ওর ইট রঙা পাবলিকা ড্রাইভ করেই যায়। কোথাও বাইরে যাবার দরকার হলে মোনাই অসুবিধেয় পড়ে। এদিকটা এত নির্জন যে রিকশা পাওয়া যায় না। বড় রাস্তা পর্যন্ত হেঁটে যেতে হয়। এই রাস্তায় তিনটে মাত্র কোয়ার্টার। ওদের উল্টোদিকে থাকেন ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান ডক্টর রকিব চৌধুরী, ছেলেমেয়ে দুটোই ঢাকায় থেকে পড়ে। পাশের বাসার সুনীল দত্ত দর্শন বিভাগের শিক্ষক। কাছাকাছি বয়সের কারণে এই পরিবারের সাথেই জাহিদ-মোনার সখ্যতা গড়ে উঠেছে।

জাহিদ ওর লেখার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। পুরানো হলেও টাইপ রাইটারটা ঝকঝক করছে। জাহিদ নিজেই লেখার সাজসরঞ্জাম গুছিয়ে রাখে। বাঁশের তৈরি পেন্সিল হোলডার থেকে হলুদ রঙের এইচ-বি পেন্সিলটা তুলে নিল জাহিদ। এমনিতে ও টাইপ রাইটারে কাজ করে। কিন্তু রুস্তম শের ছদ্মনামে লেখা চারটি বইয়ের প্রতিটা ও লিখেছে এই পেন্সিল দিয়ে। এই পেন্সিলেই ও সৃষ্টি করেছে গালকাটা জয়নালের মত উন্মাদ এক খুনীকে যার পাশবিক ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা পড়তে পড়তে শিউরে উঠেছে পাঠকরা আর বিক্রি বেড়েছে রুস্তম-শেরের বইয়ের। কিন্তু ওই ক'টা বছর জাহিদ কি সুখে ছিল?

'না, রুস্তম শেরকে আমি হত্যা করিনি,' বিড়বিড় করে বলে উঠল জাহিদ, 'সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণেই মৃত্যু ঘটেছে ওর,' পেন্সিলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ও ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে।

দুই

সেরাতে জাহিদ দুঃস্বপ্ন দেখল।

স্বপ্নের পুরো সময়টা রুস্তম শের ওর সঙ্গে ছিল, কিন্তু সর্বক্ষণ সে ওর পেছনে থাকাতে ওকে জাহিদ দেখতে পায়নি। কালো রঙের একটা ফোর্ড এসকর্ট চালিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে ওরা। যদিও জাহিদ গাড়ির ভেতরে বসে আছে, তবুও যেন পেছনের বাম্পারে লাগানো কার্টুনের রঙিন স্টিকারটা দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার—'ওস্তাদের মাইর শেষ রাতে'। আরে! এযে রুস্তম শেরের গাড়ি! তাই যদি হয়ে থাকে, গাড়ির নাম্বার প্লেট নিশ্চয়ই খুলনার। প্রকাশকের দপ্তরে রুস্তম শেরের কাল্পনিক ঠিকানা খুলনার। নদীর পাশ দিয়ে রাতের আঁধার কেটে ওরা একসময় ডানদিকের কাঁচা রাস্তা ধরল। রাস্তার শেষে কাঠের রেলিং ওয়ালা লাল ইঁটের তৈরি পুরানো একটা দোতলা বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় এসে থামল ওরা।

'সুন্দর দেখতে বাড়িটা, তাই না?' রুস্তম শেরের চমৎকার পুরুষালী কণ্ঠ ভেসে এল জাহিদের কাঁধের পেছন থেকে।

'এটা তো আমারই বাড়ি,' জাহিদ বলল।

'না, এ বাড়ির মালিক মৃত। স্ত্রী-ছেলেমেয়েকে খুন করে নিজেও সে আত্মহত্যা করেছে।' বলতে বলতে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল রুস্তম শের, জাহিদ ওকে দেখতে পেল না কিন্তু ইশারা বুঝে নিয়ে ঠিকই

দরজার উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল ; রুস্তম শেরের অদৃশ্য হাত এক গোছা চাবি ওর নাকের সামনে ধরল। চাবি দিয়ে দরজা খুলে জাহিদ ভেতরে পা দিল। নিজেরই বাড়ি, কিন্তু ভেতরের কিছুই জাহিদ চিনতে পারল না। সমস্ত আসবাবপত্র কারা যেন প্রচণ্ড আক্রোশে ভেঙে চুরে রেখে গেছে দরজা-জানালাগুলোও ভাঙা। সোফার ফোমগুলো বেরিয়ে পড়েছে, সারা ঘরে চেয়ার-টেবিলের ভাঙা অংশ। সবকিছুর ওপর পুরু ধুলো। আস্তরণ মাকড়সার জাল। মনে হচ্ছে বহুবছর কেউ এ বাড়িতে ঢোকেনি। হঠাৎ প্রচণ্ড ভয় পেল জাহিদ, ঘুরে দৌড় দেবার ইচ্ছেটাকে বহুকষ্টে দমন করে টিকে রইল ; রুস্তম শেরের সামনে ভয় পাওয়া চলবে না। দেখতে না পেলেও জাহিদ জানে রুস্তম শেরের ডান হাতে একটা ক্ষুর আছে, যে ক্ষুরটা দিয়ে গালকাটা জয়নাল তার রক্ষিতাকে ফালাফালা করে কেটে ফেলেছিল। নিজের অজান্তেই জাহিদ এগিয়ে গিয়ে ঘরের একমাত্র আস্ত টেবিলটার পাশে দাঁড়াল। আশ্চর্য! ফুলদানিটাও আস্ত আছে। আলত করে হাত ছোঁয়াল জাহিদ ফুলদানিটার কানায় ; ঝনঝন শব্দ তুলে হাজারো টুকরো হয়ে মাটির তৈরি ফুলদানিটা গুঁড়িয়ে গেল। জাহিদ টেবিলের ওপর হাত রাখল। নিমেষে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল সেটাও। আতঙ্কে ঘামতে শুরু করল জাহিদ। হারামজাদা রুস্তম শের! কি করেছিস তুই আমার বাড়িটার! কিচেনের দরজায় পড়ে আছে মোনার বাদামি রঙের চামড়ার হ্যান্ডব্যাগটা। দৌড়ে এল জাহিদ। মিটসেফের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে মোনা। গত বছর বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে জাহিদের দেয়া মেরুন টাঙাইল শাড়ি পরনে, মাথাটা সামনে ঝুঁকে থাকায় একরাশ খোলাচুলে ঢেকে আছে মুখটা। বুঝতে অসুবিধা হয় না ওর দেহে প্রাণ নেই। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে জাহিদ দৌড়ে গেল ওর কাছে, চুল সরিয়ে দু'গালে হাত দিয়ে মুখটা উঁচু করে ধরে আকুল হয়ে ডাকল, 'মোনা!' ক্ষুরার তাপে দগ্ধ মাটির মত ফেটে গেছে মোনার হালকা বাদামি ত্বক। কাজল

কালো চোখ দুটো বিস্ফোরিত হল, গরম সবজেটে পদার্থ ভিজিয়ে দিল জাহিদের শার্ট। দাঁতগুলো ছিটকে বেরিয়ে এল, মাথা নামিয়ে নেয়ায় জাহিদের কপালে দু'একটা আঘাত করল। কালচে রক্ত গড়িয়ে নামছে মোনার দু'কশ বেয়ে, জিভটা খসে পড়ল কোলে। কাঁপতে শুরু করল জাহিদ, মনে হল এক্ষুণি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। পেছন থেকে রুস্তম শের হিসহিস করে উঠল, 'আমার সাথে বিটলামি!' সাপের মত ঠাণ্ডা ঘিনঘিনে সেই কণ্ঠস্বর, 'মনে রাখিস, লাগতে এলে সব ছারখার করে দেব...সব...'

চিৎকার করে ঘুম ভেঙে উঠে বসল জাহিদ। সারা গা ঘামে ভিজে গেছে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁপুনি থামাবার চেষ্টা করল।

'জাহিদ,' ঘুমঘুম গলায় মোনা জিজ্ঞেস করল পাশ থেকে, 'কি হয়েছে? বাচ্চারা ঠিক আছে?' কেন ঘুম ভেঙেছে তা হয়ত বুঝতে পারেনি।

'অ্যাঁ...হ্যাঁ,' অনেক কষ্টে গলায় স্বর ফোটাল জাহিদ। হাত দিয়ে দেখল বালিশটা ভেজা। ঘাম, নাকি চোখের জল?

বিড়বিড় করে কি যেন বলে মোনা পাশ ফিরল। তারপর নিশ্চিন্তে তলিয়ে গেল ঘুমে। আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে এল জাহিদ। জানালায় দাঁড়িয়ে খোলা বাতাসে শ্বাস নিল। ভয়টা ধীরে ধীরে কমে আসছে। বাচ্চাদের কটের পাশে দাঁড়াল। ডিম লাইটের আবছা আলোতে ওদের ঘুমন্ত ছোট্ট শরীর দুটোকে কেমন অপার্থিব মনে হচ্ছে। দু'জনের দু'গালে চুমু খেয়ে আবার বিছানায় ফিরে এল জাহিদ।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর জাহিদ আবিষ্কার করল, স্বপ্নের কোন অংশই ভোলেনি ও।

তিন

পতেঙ্গা এলাকার গোরস্থানটা ছোট। কেয়ার-টেকার করিম বক্স পাশেই থাকে বৌ-বাচ্চা নিয়ে। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে করিম বক্স এই গোরস্থানের দেখাশোনা করছে, ফলে আশেপাশে যারা থাকে সবাইকেই প্রায় চেনে। বলতে গেলে ওর চোখের সামনেই গড়ে উঠেছে শহরটা।

ফজরের নামাজ পড়ে প্রতিদিনের অভ্যাসমত আজও করিম বক্স সুরেলা গলায় দোয়া পড়তে পড়তে গোরস্থানে পায়চারি করছে। সবুজ গাছপালা আর রঙবেরঙের ফুলের গাছ সাজানো গোরস্থানটাকে পার্ক বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়। করিম বক্স নিজের হাতে এসবের পরিচর্যা করে। কবরগুলোর মাঝে সুরকিঢাকা সরু পথে হাঁটতে হাঁটতে করিম বক্স শুকনো ডাল-পাতা কুড়িয়ে তুলে ফেলে দিচ্ছে, মাঝে মাঝে ঘুচিয়ে নিচ্ছে ফুলগাছের গোড়ার মাটি।

'পোলাপানের জ্বালায় দেহি আর শান্তি নাই।' দূরে সদ্য খোঁড়া একটা গোল গর্ত দেখে রাগে গজগজ করতে করতে সেদিকে এগোল করিম বক্স। ফাঁক পেলেই বস্তির ছেলেপিলেরা দেয়াল ডিঙিয়ে ঢুকে ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যায়। নিশ্চয়ই তাদের কাজ! এ বয়সে কত শয়তানিই যে মাথা খেলে! 'মনে কয় মাথাত তুলি আছাড় দি,' বিড়বিড় করতে করতে ক্ষতির পরিমাণ যাচাই করতে লাগল।

কোন কবর ছিল না জায়গাটাতে। গর্তটা বেশ গভীর,

এবড়োখেবড়ো। গর্তের চারপাশে মাটি, শুধু কিনারার একটা জায়গা মসৃণ, ঢালু হয়ে আছে কিছুর চাপ খেয়ে। হঠাৎ কেমন যেন ভয় ভয় লেগে উঠল করিম বক্সের। মনে হচ্ছে যেন জ্যান্ত কাউকে গোর দেয়া হয়েছিল জায়গাটাতে। জেগে উঠে মাটি সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে লোকটা। জোরে জোরে আয়াতুল কুরসি আউড়ে ভয় তাড়াতে চেষ্টা করল করিম বক্স।

যতসব আজেবাজে চিন্তা! করিম বক্স ভাল করেই জানে এখানে কাউকে কবর দেয়া হয়নি। কয়েকদিন আগে ঢাকা থেকে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে সুন্দরমত দেখতে এক আপা এসে জাহিদ সাহেব আর তার বিবিকে দাঁড় করিয়ে ঠিক এই জায়গাটাতেই ছবি তুলেছিলেন। এই জায়গাটাতেই করিম বক্সের দুই সহকারী শরীফ সাহেবের নির্দেশে নকল কবর খোদে, শরীফ সাহেব এ জন্যে ভাল বখ্‌শীশও দেন। শরীফ সাহেব জাহিদ সাহেবের বাবার বন্ধু। করিম বক্সের সাথে ভাল পরিচয় আছে। এই এলাকার সবাই ওঁকে শ্রদ্ধা করে। জাহিদ সাহেবদের বাড়ির পাশেই ওঁর বাড়ি। জাহিদ সাহেবদের মত শরিফ সাহেবরাও এই এলাকার আদি বাসিন্দা। জাহিদ সাহেব আজকাল সাভারে থাকেন বলে খালি বাড়িটা শরীফ সাহেবই নিয়মিত দেখাশুনা করেন। সেদিন ওনার গাড়িতে করেই ছবি তোলার ছোট্ট দলটা যন্ত্রপাতি নিয়ে এখানে আসে। শরীফ সাহেব সেদিন সকালে এসে করিম বক্সের সঙ্গে কথা বলে যায় এই ছবি তোলার ব্যাপারে। আপত্তির কোন কারণ দেখেনি করিম বক্স। ওনারাই তো সমাজের মাথা, কোন বাজে কাজ তো আর করবেন না। তাছাড়া জাহিদ সাহেবের দাদাই তো এই গোরস্থানকে জমি দিয়েছিলেন। কোন মুখে না করবে করিম বক্স?

ঠিক এখানেই ছবিটা তোলা হয়েছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে ভাল করে চারদিক পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করল করিম বক্স। পায়ের ছাপ! ঘাসের উপর পায়ের ছাপ। তাতে কি হল, নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা

করল সে। যে গর্ত খুঁড়েছে সে তো আর হাওয়ায় উড়ে আসেনি, পায়ে হেঁটে এসেছে। পায়ের ছাপ অনুসরণ করে গর্তের কিনারায় এসে দাঁড়াল করিম বক্স। সদ্য খোঁড়া মাটিতে ছাপ গভীর হয়ে বসেছে। দুটো ব্যাপার লক্ষ্য করে বিস্মিত হল সে। প্রথমত, পায়ের ছাপটা পূর্ণবয়স্ক মানুষের, কোন কিশোরের নয়। দ্বিতীয়ত, ছাপগুলো খালি পায়ের নয়, জুতো পরা পায়ের ছাপ। জুতো পায়ে কোন্ বুদ্ধু এখানে গর্ত খুঁড়তে আসবে! তৃতীয় ব্যাপারটা লক্ষ্য করে করিম বক্সের ঘাড়ের পিছনের চুল সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল। ছাপগুলো গর্ত থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু গর্তের দিকে এগিয়ে যাবার কোন চিহ্ন নেই। অর্থাৎ বাইরে থেকে কেউ আসেনি। কিন্তু না এলে কেউ গর্ত থেকে বেরুবেই বা কেমন করে! গতকাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি হয়েছে। যাবার পায়ের ছাপ গভীর হয়ে পড়েছে, আর আসার ছাপ পড়বে না, এটা একটা কথা হল?

ভয়ের চেয়ে কৌতূহল বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। করিম বক্স গর্তের কিনারায় উপুড় হয়ে বসে অনুসন্ধান চালাল। জুতোয় কাদা লেগে থাকার কারণেই ঘাসের উপর ছাপগুলো এমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতগুলো বছর কেটেছে এই গোরস্থানে, কিন্তু একদিনের জন্যেও ভৌতিক কিছু দেখেনি করিম বক্স। গর্তের কিনারার যে জায়গাটায় মাটির ঢিবি ঢালু হয়ে আছে, তার দু'দিকে হাতের ছাপ, গর্ত বেয়ে উঠতে গিয়ে ডান হাতটা ভিজে মাটিতে পিছলে গিয়েছিল সেটাও বোঝা যাচ্ছে। আশ্চর্য! বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না, গর্ত থেকে উঠে কোন লোক দেয়াল টপকে বাইরের রাস্তায় চলে গেছে। কিন্তু লোকটা এল কোন পথে? ভূত বলেও বিশ্বাস হতে চায় না, কারণ এখানে কোন কবর কখনোই ছিল না। গুণ্ডা-বদমাশের কাজ হতে পারে।

ব্যাপারটা কি থানায় রিপোর্ট করা দরকার? গন্ডেরা থানার ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমানকে চেনে করিম বক্স। বয়স কম হলে কি হবে,

কাজকামে খুব ভাল। ভদ্র আর সৎ। আগের জনের মত ঘুষখোর নয়। কিন্তু গোরস্থানে বিনা অনুমতিতে গর্ত খোঁড়া কি শাস্তিযোগ্য অপরাধ? কোন কিছু তো চুরি যায়নি। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে থানায় গেলে ওরা যদি হাসাহাসি করে? ভেবেচিন্তে ঝামেলা না করারই সিদ্ধান্ত নিল করিম বক্স।

দুপুরে জুমার নামাজ আদায় করার জন্যে গোরস্থান সংলগ্ন মসজিদে গিয়ে খবরটা শুনল। শরীফ খান সাহেবকে কারা নাকি খুন করে ফেলে রেখে গেছে সমুদ্রের কাছাকাছি নদীর পারে বোল্ডারের আড়ালে। ভোরে নৌকা নামাতে গিয়ে মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে স্থানীয় এক জেলে। শুনে আর বসে থাকতে পারল না করিম বক্স, থানার দিকে হাঁটা দিল চোখ মুছতে মুছতে।

শরীফ খানের হত্যাকাণ্ড ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমানকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। পতেঙ্গা থানায় পোস্টিং পাবার পর থেকে চোরাচালানীদের তাড়িয়ে বেড়ানই ওর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া ছুটকোছাটকা দু'একটা চুরি-ডাকাতি কিংবা ছিনতাইয়ের কেস আসে। কালেভদ্রে জাহাজীরা ঝামেলা পাকায়। কিন্তু খুনের ক্ষেত্র এই প্রথম। তার ওপর শরীফ খানের মত গণ্যমান্য একজন লোকের খুন। যাকে এলাকার সবাই মুরুব্বী বলে মানে, সমাজসেবা করেন বলে সকলেই চেনে। ষাট বছরের বেশি বয়স, শান্ত-নির্বিরোধী ভালমানুষ লোকটাকে কে মারতে পারে? কেনই বা মারবে? শরীফ খান সরকারী চাকুরে ছিলেন, বছর তিনেক আগে অবসর গ্রহণ করেন। স্ত্রী আছেন, তবে নিঃসন্তান। সমাজসেবা করেই দু'জনের সময় কাটে। গতরাতে মিসেস খান থানায় ফোন করে জানিয়েছিলেন স্বামী বাড়ি ফেরেননি রাত দুটোর পরেও। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উনি অফিসার্স ক্লাবে যান, রাত বারোটার মধ্যেই ফিরে আসেন।

ডিউটিরত অফিসার ধারণা করে অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে হয়ত ক্লাবেই পড়ে রয়েছেন, গাড়ি চালিয়ে আসতে পারেননি। তবুও সরেজমিনে তদন্তের জন্যে ক্লাবে গিয়ে জানতে পারল শরীফ খান বেরিয়ে গেছেন এগারোটার আগেই। ঘুম চোখে দারোয়ান আরও জানাল গত বিশ বছরে কেউ শরীফ খানকে মদ্যপান করতে দেখেনি।

অফিসার যখন থানায় ফেরে, তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। রিপোর্ট লিখে ডিউটি শেষে বাড়ি ফিরে যায় সে। ইন্সপেক্টর শাহেদ সকালে অফিসে এসেই ঘটনাটা জানতে পারে। মৃতদেহ আবিষ্কার হয় ঘন্টাখানেক পরে।

অফিসার্স ক্লাব থেকে শরীফ খানের বাড়ির দূরত্ব মাইল আটেকের বেশি হবে না। দোকানপাট অত রাতে নিশ্চয়ই বন্ধ ছিল। তাই শুধু রাস্তার পাশের বাড়িগুলোতেই জিজ্ঞাসাবাদ করার সিদ্ধান্ত নিল শাহেদ। শরীফ খানের টয়োটা করোনাটার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি, যতদূর মনে হয় মানিব্যাগেও কেউ হাত দেয়নি। শুধু প্রচণ্ড আক্রোশে কেউ ধারাল অস্ত্র দিয়ে কালাফালা করে কেটেছে বৃদ্ধের সমস্ত শরীর। ব্যক্তিগত আক্রোশ না থাকলে এমন পাশবিক কাণ্ড কেউ করতে পারে না।

বেশ কয়েকটা বাড়ি ঘুরে আসার পর বার্মা ইস্টার্নের কোয়ার্টারের বাসিন্দা মিসেস আমান কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেন।

'আমার ইনসোমনিয়া আছে। রাতে ভাল ঘুম হয় না। কিছুক্ষণ পরপরই বিছানা থেকে উঠে পড়ি। কাল রাতে বাথরুমে যাবার সময় জানালা দিয়ে গাড়িটা দেখেছি।'

'তখন ক'টা বাজে মনে আছে?'

চোখ বন্ধ করে একটু চিন্তা করলেন মিসেস আমান। 'সোয়া এগারোটা কি সাড়ে এগারোটা হবে। কারণ তার খানিকটা আগে সাড়ে দশটার দিকে আমেরিকা থেকে আমার ভাই ফোন করেছিল, তখন ঘড়ি

দেখেছিলাম।'

'মিস্টার আমান কোথায় ছিলেন?'

'ও তো ঘুমে কাদা। আমি জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলাম গাড়িটা থামল।'

'থামল?' চমকে উঠল শাহেদ। 'গাড়িটা থেমেছিল? আপনি ঠিক দেখেছিলেন?'

মিসেস আমানের কপালে বিরক্তির ভাঁজ পড়ল। এমনিতেই রান্নাঘরে বাসনের কাজ পড়ে আছে, পুলিস লোকটা বিদায় হলেই বাঁচেন তিনি। 'না দেখলে কি আর বলছি ভাই?'

শাহেদের কৃতার্থ গলার স্বরে গদগদ ভাব নিয়ে এল, 'না না, শুনছিলাম। আমি সেভাবে বলিনি। আপনি এমনিতেই আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছেন। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া কি আর আমি চাকরি করতে পারতাম! পুলিসে চাকরি নিলে কত রকম ট্রেনিং যে দরকার হয়!'

'পুলিস হয়েছেন বলেই না আমরাও এত ভয় পেয়েছি। এই এলাকাতেই তো ঘটনা। এখন তো ঘর থেকে বেরোতেই ভয় লাগছে।' উঠে গিয়ে ফ্যানটা এক দাগ বাড়িয়ে দিলেন মিসেস আমান। দরজার কাছে দাঁড়ানো ও বাড়ির কাজের মেয়েটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন 'হাসিনা যা তো, ওদের দুকাপ চা করতে বল।'

'না না চা লাগবে না,' মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল শাহেদ, 'আপনার সময় নষ্ট করছি, এতেই আমি লজ্জিত। শত হলেও শরীফ সাহেবের মত লোকের খুন...'

'শরীফ সাহেবকে আমি চিনতাম না, নাম শুনেছি। ওই গাড়িটা যে ওনার তাও জানতাম না। আমি ছবিটা দেখার পরেই গাড়িটা চিনতে পেরেছি। প্রায়ই এই রাস্তায় আসা যাওয়া করতে দেখতাম গাড়িটাকে।' শাহেদ গাড়ির ছবিটা জোগাড় করেছে মিসেস শরীফ

খানের কাছ থেকে।

'গাড়িটা থামল কেন কিছু বুঝলেন?' চট করে শাহেদ প্রসঙ্গে চলে এল।

'একটা লোক হাত দেখাল যে!'

'লোক!' আবার চমকে উঠল শাহেদ, নোটবুকে দ্রুত লিখতে শুরু করল। 'লোকটাকে ভাল করে দেখতে পেরেছিলেন?'

'রাস্তার আলোতে যতটুকু দেখা যায়। তবে খুব লম্বা, গাঢ় রঙের সুট পরা ছিল। দাঁড়িয়েছিল রাস্তার ওপাশে। গাড়িটা শহরের দিক থেকে আসছিল, দেখে লোকটা হাত তুলে ইশারা করে,' আঁচলে গলার ঘাম মুছতে মুছতে বললেন মিসেস আমান।

'তখন গাড়িটা থেমে দাঁড়াল?' শাহেদের প্রশ্নের উত্তরে মিসেস আমান ওপর-নিচ মাথা নাড়লেন। 'তারপর কি হল?'

'তারপর লোকটাকে তুলে নিয়ে গাড়িটা চলে গেল।'

'গাড়ির চালককে দেখেছিলেন?'

'না, অন্ধকার ছিল, অত খেয়াল করিনি।'

'বাইরে দাঁড়ানো লোকটার সম্বন্ধে আর কিছু বলতে পারবেন?'

চোখ বন্ধ করে কয়েক সেকেণ্ড ভাবলেন মিসেস আমান, তারপর বললেন, 'যতটুকু দেখেছি, মনে হয়েছে লোকটা খুব ফর্সা...আর ...আর...খুব হ্যাণ্ডসাম।'

'লম্বা বলছেন, ঠিক কতটা লম্বা হবে?' দ্রুত চলছে শাহেদের কলম।

'কম করেও ছ'ফিট, কিন্তু এতদূর থেকে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব না, তাছাড়া কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। বাথরুমে যাবার সময় জানালার পর্দা টেনে দেবার জন্যে দাঁড়াতেই লোকটাকে দেখি, সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটা এল আর ওতে উঠে চলে গেল লোকটা।'

'সুটের রং কি কালো ছিল, না ডিপ ব্লু?'

'বলতে পারব না, কালচে ছিল এটুকুই মনে আছে। তবে সুটটা দামি সন্দেহ নেই। লোকটাকে দেখে মোটেই সাধারণ লোক মনে হচ্ছিল না, সেজন্যেই আমি লক্ষ্য করেছিলাম।'

'গাড়িটা কি যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকেই গেছে?'

'হ্যাঁ।'

সেটাই স্বাভাবিক। মৃতদেহ পাওয়া গেছে সাগরের কাছাকাছি। কিন্তু অত রাতে শরীফ খান একটা অপরিচিত লোককে গাড়িতে তুলবেন কেন? নাকি লোকটা পরিচিত?

ডিউটিরত সার্জেন্ট মাসুদ আলম যাত্রাবাড়ির কাছে ডোবার ধারে পার্ক করা ক্রিম কালারের টয়োটা করোনাটা দেখে বাইক থামাল। গাড়ির আশেপাশে কেউ নেই। দোকানপাট সবে খুলতে শুরু করেছে, শুক্রবার বলে রাস্তায় লোকজন কম। গাড়ির মালিক হতে পারে এমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কাছে গিয়ে নোটবুক খুলে নাম্বারটা মিলিয়ে দেখল, কোন সন্দেহ নেই এটাই সেই পতেঙ্গা থেকে হারিয়ে যাওয়া গাড়িটা। মাত্র কিছুক্ষণ আগেই চিটাগাং থেকে গাড়িটার নাম্বার যাত্রাবাড়ির থানায় জানানো হয়েছে নিয়মমত। চুরি যাওয়া গাড়িগুলো সাধারণত অন্য শহরে আবিষ্কৃত হয় বলে দ্রুত সবখানে খবর পাঠাবার নির্দেশ আছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি গাড়িটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে সার্জেন্ট মাসুদ চিন্তাই করতে পারেনি।

সাবধানে গাড়ির নিচে একা ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ভেতরটা ভাল করে লক্ষ্য করতেই চমকে উঠল সার্জেন্ট। অতি বড় গর্দভও বুঝবে সামনের সিটের হালকা সোনালী কভারে কালচে মত দেখতে ওগুলো শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ। সিটের নিচে কয়েকটা খালি কোকের ক্যান, আলু ভাজার টুকরা, ছেঁড়া পরোটার কিছু অংশ, ঠোঙা ইত্যাদি আবর্জনা দেখা যাচ্ছে। আধ খাওয়া

কয়েকটা সিগারেটও আছে, কিছু নিচে কিছু সিটের ওপর। কিন্তু রক্তের দাগটাই সার্জেন্টকে চিন্তায় ফেলে দিল। শুধু সিটে নয়, স্টিয়ারিঙ হুইলেও শুকনো রক্ত লেগে আছে, কিছু ছিটকে পড়েছে সামনের উইণ্ড শীল্ডে। মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যায় রিয়ার ভিউ মিররেও লেগে আছে ছোপ ছোপ রক্ত, দরজার হাতলও বাদ যায়নি। খাকি রঙের কাগজের ঠোঙা রক্তে ভিজে চুপসে গেছে।

সাবধানে গাড়ির দরজায় চাপ দিতেই খুলে গেল, লক্ করা ছিল না। ভেতরে ঝুঁকে ভালমত দেখতে গিয়ে রক্তভেজা ঠোঙাটা তুলে ধরল সার্জেন্ট। কয়েকটা চুল আটকে আছে চটচটে রক্তে। হঠাৎ একটা বদগন্ধ নাকে যেতেই ঝটিতে মাথা বের করে আনল সার্জেন্ট। রক্তপচা গন্ধ নয়, কিন্তু তার চেয়েও খারাপ গা গুলিয়ে ওঠার মত গন্ধ, যা সার্জেন্টের অভিজ্ঞতার বাইরে। খারাপ, খুব খারাপ একটা গন্ধ।

সার্জেন্ট দ্রুত গাড়িটার কাছ থেকে দূরে সরে এল। নিজের বাইকে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ লম্বা করে শ্বাস নিল। তারপর ওয়াকি-টকিতে সহকর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। কেন যে দিনে দুপুরে এমন ভয় লাগল কে জানে!

থানায় ফিরে প্রথমেই পতেঙ্গা থানায় ফোন্ করল সার্জেন্ট মাসুদ আলম।

চার

আমেনা বেগম তাঁর বিশাল শরীরটা টেনে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে

উঠতে দোতলায় বিশ্রামের জন্যে থামলেন। সাঁই সাঁই করে নিঃশ্বাস বইছে, ঘামে ভিজে উঠেছে চুলের গোড়াগুলোও। আর পারি না! মনে মনে আর্তনাদ করে উঠলেন ভদ্রমহিলা। স্বামীর মৃত্যুর পর সব ঝামেলা এসে পড়েছে ঘাড়ে। ছেলেমেয়েগুলোও সব শয়তানের ঝাড়। তা নাহলে অত বড় ছেলেমেয়ে আছে যার তাকে কষ্ট করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভাড়া তুলতে হয়! না করেও তো পারেন না তিনি, আট ফ্ল্যাটের এই বাড়িটাই যে তাঁকে খাওয়াচ্ছে। প্রতি মাসের পাঁচ তারিখে প্রতিটা ফ্ল্যাটে ঘুরে ঘুরে ভাড়া তোলেন তিনি। আজ ভাড়া নেবার তারিখ নয়। কিন্তু বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে। প্রায় ছ'মাস হল তিনতলার একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে আমিন ইকবাল নামের অল্পবয়েসী এক ছোকরা। একাই থাকে। এমনিতে আমেনা বেগম ব্যাচেলারদের বাড়ি ভাড়া দেন না। কিন্তু বড় ছেলে এই ছোকরাকে নিয়ে এলে না করতে পারেননি, ল' কলেজে ওর সঙ্গে নাকি পড়ে। এমনিতে ছোকরা কোন কাগজে সাংবাদিকের চাকরি করে। কিন্তু বজ্জাত ছোকরা গত ছ'মাসের ভাড়া বাকি রেখে আমেনা বেগমকে বিপদে ফেলেছে। ছেলের বন্ধু-টন্ধু মানেন না, আজ আমেনা বেগম শেষ কথা জানিয়ে দিতে এসেছেন—সামনের মাসে একবারে পুরো তিন মাসের ভাড়া না পেলে লোক ডেকে তিনতলা থেকে ওর জিনিসপত্র সব ফেলে দেবেন। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব! ঢাকা শহরের মত জায়গায় গোপীবাগে বড় রাস্তার ওপর দু'কামরার খুপরি মত ফ্ল্যাট কখনও খালি পড়ে থাকে! আমেনা বেগম আজই একটা হেস্তনেস্ত করবেন। নিচ থেকে দেখেছেন ছোঁড়ার ফ্ল্যাটের জানালা খোলা, তার মানে বাসাতেই আছে।

একটু দম নিয়ে আবার সিঁড়ি বাইতে গিয়েই মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল। উপরের কোন ফ্ল্যাটে প্রচণ্ড জোরে ক্যাসেট বাজছে—'দেখা হ্যায় প্যাহলি বার, সাজানকে আঁখো মে পেয়ার'! তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজখাঁই স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন আমেনা বেগম 'এত জোরে গান বাজায়

কে র‍্যা! বিয়েবাড়ি নাকি!' সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ করে গেল। গজগজ করতে করতে তিনতলায় উঠে এলেন তিনি মেদবহুল দেহটাকে টানতে টানতে। বিরক্ত মুখে কোমরে হাত দিয়ে একপাশে হেলে দাঁড়িয়ে আবার খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিলেন। ছোঁড়া নাকি আবার সাংবাদিক, ঝামেলা করবে না তো! অবশ্য পড়েই যদি তার ক্ষতি আর কতটা হবে। ছেলের কাছ থেকে আম্মেনা বেগম শুনেছেন আমিন ইকবাল বিখ্যাত সব লোকের পিছনে লেগে থেকে বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি ছবি তোলে, তারপর মোটা টাকার বিনিময়ে পত্রিকার কাছে বিক্রি করে দেয়। যাই হোক না কেন আম্মেনা বেগমের সাথে কেউ জোচ্চুরি করে ছাড় পায় না।

নিজের মনে গজ গজ করতে করতে আমিন ইকবালের দরজায় ধাক্কা দিলেন আম্মেনা বেগম। হাতের মুঠি দরজায় পিছলে গেল, দরজাটা খোলাই ছিল। ও, ছোঁড়া তাহলে গলার আওয়াজ পেয়েছে। দরজাটার খোলা অংশ দিয়ে ছোট করিডরের শেষে বেডরুমটা দেখা যাচ্ছে: এলোমেলো জিনিসপত্র—বাসাটাকে শুয়োরের খোঁয়াড় করে রেখেছে।

'আমিন!' দরজার কড়া ধরে নাড়লেন আম্মেনা বেগম। কোন সাড়া না পেয়ে দরজা ঠেলে ছোট্ট সিটিংরুমটায় ঢুকে পড়লেন, 'আমিন, বাবা, এদিকে একটু শুনে যাও তো!'

ভক করে চিমসে একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল। কিছু পচেছে? নাকে শাড়ির আঁচল চেপে আরও এক পা এগিয়ে গেলেন আম্মেনা বেগম। 'আমিন, কোথায় তুমি, বাবা?' ঘরের কোথাও নিচু ভলিউমে রেডিও বাজছে। গন্ধটা বিকট আকার ধারণ করেছে। আম্মেনা বেগমের ইচ্ছে হল ছুটে বেরিয়ে যান, গন্ধটা কেমন যেন অশুভ সঙ্কেত বয়ে আনছে। বাইরে এখনও আঁধার কাটেনি, তবে ঘরে আলো জ্বলছে। ভয়ের চেয়ে কৌতূহলটাই বড় হল। বইয়ের বড় আলমারিটা পেরিয়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন তিনি। রাস্তার উপরের জানালাটা

খোলা, তবে পর্দা টেনে দেওয়া। পায়ের নিচে কি যেন পড়তে উপুড় হয়ে দেখলেন সোফার কুশন। মাথাটা তুলে ডানদিকে তাকাতেই শরীরের সমস্ত রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

খুব বেশি হলে তিন সেকেণ্ডের জন্যে তাকিয়ে ছিলেন আমেনা বেগম, কিন্তু ওই স্বল্প সময়ে ঘরের দৃশ্যের প্রতিটা খুঁটিনাটি মনের পর্দায় ছবির মত ছাপ ফেলে গেল—জীবনের বাকি সময়টা যা তাড়া করে বেড়াবে তাঁকে।

টেবিলের উপরে সিগারেটের আধপোড়া অংশ, আমেনা বেগম ভাল করেই জানেন আমিন সিগারেট খায় না, ছোট একটা প্লাস্টিকের কৌটা থেকে টেবিলের উপর ছড়িয়ে পড়েছে অসংখ্য বোর্ড-পিন, কয়েকটা পড়ে আছে 'সাপ্তাহিক শনিবারে'র খোলা পাতায়—যেখানে জাহিদ হাসান আর তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন রুস্তম শেরের কবরের পাশে, দু'জনের মুখেই হাসি।

সোফায় নয়, আমিন ইকবাল বসে আছে দেয়াল ঘেঁসে রাখা একটা কাঠের চেয়ারে। উলঙ্গ, দড়ি দিয়ে চেয়ারের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। জামাকাপড় মেঝেতে লুটোচ্ছে। পেটের কাটা অংশ থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে। বাম চোখটা কোটর ছেড়ে বেরিয়ে গালের উপর ঝুলছে। জিভটা কেটে নেয়া হয়েছে, সেটাকে দেয়ালের গায়ে বোর্ড-পিন দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে। কাটা জিভ থেকে টপ টপ করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে দেয়াল বেয়ে। আর একটা বোর্ড-পিন দিয়ে আমিনের বুকের ওপর আটকে দেয়া হয়েছে 'শনিবারে'র আর একটা পৃষ্ঠা—রক্তে ভিজে চুপসে গেলেও জাহিদ হাসান আর তাঁর স্ত্রীকে চিনতে ভুল হয় না। রক্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে চেয়ারে বসা আমিনের চারদিক। সেই রক্তে আঙুল বুলিয়ে দেয়ালে সাঁটানো জিভটার ঠিক ওপরে লেখা হয়েছে কয়েকটা শব্দ, সাদা হোয়াইটওয়াশের পটভূমিকায় শব্দ ক'টা বড় স্পষ্ট—

'পাখিরা আবার উড়ছে!'

এই অবস্থাতেও অস্পষ্ট একটা শব্দ আমেনা বেগমের কানে ঠিকই পৌছল। বুকফাটা আর্তচিৎকারটা গলা দিয়ে কেমন ঘড়ঘড় শব্দ হয়ে বেরোচ্ছে, বাতাসে সাঁতার কাটার মত টলতে টলতে আমেনা বেগম অতি ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। আশ্চর্য! এখনও বোধবুদ্ধি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি!

দরজাটা বন্ধ! খোদা! দরজাটা কেউ বন্ধ করে দিয়েছে! আমেনা বেগম নিশ্চিত তিনি দরজা বন্ধ করেননি ঘরে ঢোকার পর। তার মানে খুনী তখনও ঘরের ভেতরেই ছিল, তাঁকে ঢুকতে দেখে দরজার পেছনে লুকিয়ে পড়ে। এখন সুযোগ বুঝে বেরিয়ে গেছে, যাবার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে গেছে!

জীবনে এই প্রথমবার আমেনা বেগম জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন কাটা কলাগাছের মত।

পাঁচ

পুলিস যখন আসে জাহিদ তখন দোতলার স্টাডিতে, মোনা বসার ঘরে রূপক-রুমকিকে কার্পেটের উপর ছেড়ে দিয়ে সোফায় শুয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' পড়ছে। শেষ বিকেলের সোনালী আলো জানালায়।

বেলের শব্দ কানে যেতে বিন্দুবাসিনীর ঠাকুরঘর থেকে নিজেকে

জোর করে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল মোনা, বিরক্ত হয়ে এগিয়ে গেল সদর দরজার দিকে।

পিপহোল দিয়ে বাইরে দাঁড়ানো ইউনিফর্ম পরা পুলিস দেখে অন্য যে কোন লোকের মত মোনারও অস্বস্তি হল। কি ব্যাপার! পুলিস! এই অসময়ে! সাথে সাথে মনে হল—কি ছেলেমানুষী চিন্তা—পুলিসের আবার সময়-অসময় আছে নাকি!

'কাকে চাই?' দরজা খুলে মোনা বাইরে গলা বাড়াল।

'আপনি কি মিসেস জাহিদ হাসান?' তিনজনের একজন জিজ্ঞেস করল গম্ভীর কণ্ঠে।

'জ্বী...কি ব্যাপার?'

'আপনার স্বামী কি বাসায় আছেন?' এবার আর একজন প্রশ্ন করল।

'কেন তা কি জানতে পারি?' দরজাটা মুখের ওপর বন্ধ করে দেবার ইচ্ছেটাকে বহুকষ্টে দমন করছে মোনা।

তৃতীয় পুলিস অফিসার, ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান—মোনা তখনও তাকে চেনে না—অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'পুলিসী কাজ। আপনি কি দয়া করে ওনাকে একটু ডেকে দেবেন?'

মোনা যখন ওপরে ডাকতে এল, টাইপরাইটার থেকে উঠতে পেরে খুশিই হল জাহিদ। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে চিন্তা করতে লাগল হঠাৎ পুলিস কেন এল। হলের ছেলেরা কোন গণ্ডগোল করেনি তো!

ওরা এখনও বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে।

'স্লামালেকুম,' সহাস্যে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল জাহিদ।

'আপনিই জাহিদ হাসান?' রূঢ় প্রশ্নটা শুনে একটু থমকে গেল জাহিদ। সালামের জবাব তো দেয়ইনি, আবার নাম ধরে সম্বোধন

করল! 'ডক্টর' নয় 'মিস্টার' নয়—শুধু জাহিদ হাসান! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জাহিদ হাসান বহুদিন এমন সম্বোধন শোনেনি। অথচ দেখে মনে হচ্ছে অফিসার কম করেও পাঁচ বছরের ছোট হবে বয়সে। 'আমি ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান, পতেঙ্গা থানায় আছি। আপনি হাতটা ফেরত নিতে পারেন, হ্যাণ্ডশেক করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।'

বিমূঢ় জাহিদ হাতটা গুটিয়ে নিয়ে বিস্মিত চোখে চেয়ে রইল। হঠাৎ করেই কেন যেন মনে হল অস্বীকার করে কোন লাভ নেই, সত্যিই ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছে ও। ভয় পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়ানো যোনার দিকে চাইল। এদিক-ওদিক মুখে 'তা তা দা দা' শব্দ তুলে আপনমনে খেলা করছে, যোনার সেদিকে মনোযোগ নেই। ভয় পাওয়া বড় বড় চোখ মেলে যোনা একদৃষ্টে চেয়ে আছে পুলিস অফিসারের দিকে, রক্তশূন্য চেহারা, এক হাতে রেলিঙ আঁকড়ে ধরে আছে।

হঠাৎ করেই জাহিদের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। কি অধিকার আছে পুলিসের নিরীহ নাগরিকের বাড়িতে ঢুকে অভদ্র ব্যবহার করার, অকারণে ভয় দেখাবার?

'খুব ভাল। হ্যাণ্ডশেক না হয় নাই করলেন, কিন্তু আসার কারণটা দয়া করে বলবেন কি?' ব্যক্তিত্ব ফিরে পেল জাহিদ, এখন শুধু বিরক্তিই বোধ করছে।

হঠাৎ করে মনে হল, পতেঙ্গা থানার ইন্সপেক্টর এই সাভারে কি করছে!

কঠোর চোখে চেয়ে আছে ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান। 'খুনের তদন্তে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে আমরা এখানে এসেছি। যদি ইচ্ছে করেন তবে উকিলের সঙ্গে পরামর্শের আগে কোন রকম বক্তব্য নাও দিতে পারেন, আপনার অধিকার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনি সচেতন—শিক্ষিত লোক যখন,' কোনরকম ভাবান্তর ছাড়াই এক

নিঃশ্বাসে বলে গেল সে।

'খোদা! কি হচ্ছে এসব!' ডুকরে কেঁদে উঠল মোনা। রূপক-রুমকি খেলা থামিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে অবাক চোখে।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান! কি বলতে চাচ্ছেন আপনি?' প্রচণ্ড রাগে অপমানে চিৎকার করে উঠল জাহিদ।

কিন্তু শাহেদ রহমান যেন তা শুনতেই পেল না, একই ভাবে বলে যেতে থাকল, 'আপনার সামর্থ্য না থাকলে সরকার আপনার জন্যে উকিল ঠিক করে দেবে। এ মুহূর্তে আপনাকে আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে।'

'জাহিদ!' ভয় পাওয়া ছোট্ট মেয়েটির মত চেঁচিয়েই উঠল মোনা, দৌড়ে গিয়ে রূপক-রুমকিকে ছোঁ মেরে মেঝে থেকে কোলে তুলে নিল—ওরা একযোগে কাঁদতে শুরু করেছে।

'এ মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে কোথাও যাবার কোন ইচ্ছে নেই আমার। আইন সম্বন্ধে যতটুকু ধারণা আছে, তাতে মনে হয় আমাকে জোর করার কোন অধিকারও আপনাদের নেই,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল জাহিদ, কপালে ঘাম জমতে শুরু করেছে।

শাহেদের ডান পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোক এবার বললেন, 'তাহলে আমাদেরকে থানায় ফিরে গিয়ে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ইস্যু করিয়ে আনতে হবে, জাহিদ সাহেব। আমাদের কাছে যা তথ্য আছে তাতে কাজটা খুব একটা কঠিন হবে না।' তারপর আড়চোখে ইন্সপেক্টর শাহেদের দিকে একবার চেয়ে যোগ করলেন, 'ইন্সপেক্টর শাহেদ ওয়ারেন্ট নিয়েই আসতে চেয়েছিলেন। আপনি একজন সম্মানিত এবং বিখ্যাত লোক বলে আপনার ভালর জন্যেই আমরা তা সমর্থন করিনি।'

শাহেদকে দেখে মনে হল কথাটা বলার জন্যে অফিসারের উপর সে খুব খেপে গেছে। আশ্চর্য! লোকটা এমন অস্থির হয়ে আছে কেন, কি এমন ঘটেছে! কে খুন হয়েছে?

'আমি বুঝতে পারছি আপনারা শুধু কর্তব্য পালন করছেন,' জাহিদ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে, কণ্ঠস্বরেই তা বোঝা গেল, 'কিন্তু অফিসার, আমি তো ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'আপনি সত্যিই যদি কিছু বুঝতে না পারতেন, তবে আমাদের এখানে আসার দরকার হত না,' হিসহিসিয়ে উঠল শাহেদ।

আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারল না জাহিদ, চিৎকার করে উঠল স্বর ফাটিয়ে, 'আপনি কি জানেন আর না জানেন তার থোড়াই পরোয়া করি আমি। পতেঙ্গায় আমার পৈতৃক বাড়ি, এলাকার সবাই আমাকে ভাল করেই চেনে। পতেঙ্গা থেকে কয়েক শো মাইল দূরে নিজের এলাকার বাইরে কোন্ রাজকাজে আপনি এখানে এসেছেন তাতেও আমার কোন আগ্রহ নেই। কোন কিছু না জেনে বাড়ির বাইরে এক পাও দিচ্ছি না আমি। কিন্তু মনে রাখবেন, আজকের পুরো ঘটনার দায়দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকেই। কারণ আমি খুব ভাল করেই জানি আমি নিরপরাধ।'

দুই পুলিস অফিসারকে একটু বিব্রত মনে হল, কিন্তু জাহিদের কথা ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমানকে স্পর্শ করতে পেরেছে বলে মনে হল না।

রূপক-রুমকি তারস্বরে চিৎকার শুরু করেছে এই গোলমালে। জাহিদ ওদের দিকে চেয়ে সোনাকে বলল, 'ওদেরকে নিয়ে ওপরে চলে যাও।'

'কিন্তু...' সোনা ইতস্তত করতে লাগল।

'সব কিছু ঠিক আছে, সোনা, চিন্তা কোরো না। ওরা ভয় পাচ্ছে, ওদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাও,' জাহিদ দৃঢ়স্বরে বলল।

সোনার দু'চোখে মিনতি ঝরে পড়ছে, যেন বলছে সত্যি কথা দিচ্ছ তো তুমি? এক পলক মাত্র, তারপর বাচ্চাদের নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল ও।

'শরীফ খান হত্যা সম্পর্কে আপনাকে আমরা কিছু প্রশ্ন করতে চাই,' নীরবতা ভাঙল শাহেদ।

'কে?' শুনতে ভুল করেছে কি জাহিদ?

'আপনি কি বলতে চান তাঁকে আপনি চেনেন না?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শাহেদের চোখে।

'অবশ্যই না! শরীফ চাচা! পতেঙ্গায় আমাদের বাড়ির পাশে থাকেন, সেই শরীফ খানের কথা বলছেন আপনারা! উনি খুন হয়েছেন? কি বলছেন আপনারা!' জাহিদের চোখে নির্ভেজাল বিস্ময়। কিন্তু কেউ কোন উত্তর না দেয়াতে নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কে এমন কাজ করল? কখন?'

'আমাদের হাতে অকাট্য প্রমাণ আছে ঘটনাটা আপনিই ঘটিয়েছেন, জাহিদ সাহেব,' অফিসারের কণ্ঠ বরফের মত শীতল, 'সেজন্যেই আমরা এখানে এসেছি।'

শূন্যচোখে চেয়ে রইল জাহিদ, বিড়বিড় করে উঠল, 'অসম্ভব! কি যা-তা বলছেন আপনারা!'

'আপনি কি পোশাক বদলে নিতে চান?' তৃতীয়জন এতক্ষণে কথা বলল।

'আমি আপনাদের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছি না,' ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে জাহিদের মাথায়।

'আপনাকে আমাদের সঙ্গেই যেতে হবে, জাহিদ সাহেব,' শাহেদ পলকহীন চোখে চেয়ে আছে জাহিদের চোখে, 'এখন অথবা এক ঘন্টা পরে।'

'তাহলে নাহয় এক ঘন্টা অপেক্ষাই করি,' ব্যঙ্গের সুরে বলল জাহিদ। আশ্চর্য! শরীফ চাচা খুন হয়েছেন অথচ জাহিদকে খবরটা কেউ জানাল না! 'শরীফ চাচাকে কখন খুন করা হয়েছে?'

রূপক-রুমকিকে ওদের কটের ভেতর বসিয়ে রেখে মোনা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিল, প্রশ্নটা কানে যেতে ফুঁপিয়ে উঠল, 'শরীফ চাচা

খুন হয়েছেন! হায় আল্লাহ্!'

ওদিকে নজর দিল না শাহেদ। 'আপনাকে তথ্য দেবার জন্যে আমাদেরকে পাঠানো হয়নি, জাহিদ সাহেব!'

কোণের টেবিলে রাখা টেলিফোনটার দিকে ছুটল মোনা, আঁচলে চোখ মুছছে, 'চাচী না জানি কি করছে! হায় আল্লাহ্! কি করে হল!'

শাহেদ ওকে বাধা দিল, 'টেলিফোন পরেও করতে পারবেন, আপাতত জাহিদ সাহেবের দু'একটা দরকারি জিনিসপত্র গুছিয়ে দিন।'

বোকার মত কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মোনা, তারপর ঝড়ের বেগে এগিয়ে এসে পর পর ওদের তিনজনের দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে চেঁচিয়ে উঠল অপ্রকৃতস্থ গলায়, 'আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে! বাড়ি বয়ে এসে অপমান করছেন! কি করেছি আমরা? বেরিয়ে যান, এক্ষুনি বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে!' উত্তেজনায় কাঁপছে ও।

হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে নিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করল জাহিদ। মোনা ওর কাঁধে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। জাহিদ চোখ বুজে একটু ভাবল। তারপর মুখ তুলে বলল, 'ইন্সপেক্টর, শুনুন, আমি শরীফ চাচাকে হত্যা করিনি। কিন্তু আপনারা যদি ভেতরে এসে একটু বসেন, তাহলে হয়ত আমরা এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে পারি। এভাবে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে...'

'আপনি দয়া করে তৈরি হয়ে নিন, আমরা সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না,' মনে হল শাহেদ ওর কথা শুনতেই পায়নি।

হাল ছেড়ে দিয়ে জাহিদ অন্য দু'জনের দিকে ঘুরে তাকাল, 'আপনারা কি ওনাকে একটু বোঝাতে পারেন না? উনি যদি শুধু খুনের সময়টা আমাকে জানান, তাহলে অনেক ঝামেলা থেকে বেঁচে যাই আমরা।' একটু চিন্তা করে জাহিদ যোগ করল, 'কোথায় খুনটা হয়েছে? ঢাকা বা সাভারে যদি হয়ে থাকে...কিন্তু ঢাকায় এলে শরীফ চাচা অবশ্যই আমাকে জানাতেন। আর আমি পতেঙ্গা থেকে ফিরেছি প্রায়

মাসখানেক হয়ে গেল। এরমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছেড়ে বাইরে কোথাও যাইনি আমি।'

ভদ্রলোক একটু চিন্তা করে বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন আমরা নিজেদের মধ্যে একটু আলাপ করে দেখি।'

অনিচ্ছুক শাহেদকে একরকম জোর করে টেনে নিয়ে দুই অফিসার রাস্তায় দাঁড়ানো নিজেদের জীপের কাছে চলে গেল। ওদের নিচু স্বরের কথাবার্তা এ পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। মোনা চোখ ভরা জল নিয়ে ব্যাকুল হয়ে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকল জাহিদকে। আলতো করে ওর ঠোঁটে চুমু খেয়ে থামিয়ে দিল ওকে জাহিদ, 'মোনা, কিচ্ছু চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। যে অপরাধ করিনি, তার জন্যে কোন বিচারে ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করবে? তুমি বরং বাচ্চাদের কাছে যাও, ওরা একা আছে।'

চোখ মুছতে মুছতে মোনা ওপরে চলে গেল। জাহিদ দরজা থেকে সরে এসে জানালায় দাঁড়াল। সন্ধ্যা নেমে আসছে। আবছা হলেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওরা তিনজন একইভাবে দাঁড়িয়ে কথাবার্তায় মগ্ন। অফিসার দু'জন ইন্সপেক্টর শাহেদকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে, শাহেদ বিরক্ত হয়ে দু'দিকে মাথা নাড়ছে। আশ্চর্য! লোকটা কেন এত রেগে আছে? মনে হচ্ছে যেন ব্যক্তিগত আক্রোশ। পতেঙ্গা থানার ইন্সপেক্টর, নিশ্চয়ই শরীফ চাচার সঙ্গে পরিচয় ছিল। শুধু একারণেই জাহিদের উপর এত রাগ? কিন্তু কি এমন করেছে জাহিদ? জানালা থেকে সরে সোফায় এসে বসল জাহিদ পেছনে মাথা হেলিয়ে।

মোনা রূপক-রুনকিকে কোলে নিয়ে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। সামলে নিয়েছে নিজেকে। জিজ্ঞাসু চোখে চাইল, 'ওরা এতক্ষণ কি করছে?'

হাত বাড়িয়ে রূপককে ওর কাছ থেকে নিজের কোলে নিল জাহিদ। 'মনে হয় ইন্সপেক্টর শাহেদকে ওরা বোঝাবার চেষ্টা করছে

যাতে আমাকে সবকিছু খুলে বলে।'

কর্ণিকাকে নিয়ে ওর পাশে বসল সোনা। কর্ণিকা দু'হাতে মায়ের খোলা চুল নিয়ে খেলছে মুখে নানা শব্দ তুলে। একদম বোনের দেখা-দেখি মুখে একই রকম শব্দ তুলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জাহিদের ছোট ক্যাণ্টো নিয়ে। বাচ্চা দুটো সবসময় একইরকম আচরণ করে। একজন হাসলে অন্যজন হাসে, কাঁদলে সাথি তার সুর মেলায়। যমজ বলেই কি?

'বিশ্বাসই হচ্ছে না শফিক চাচার মত এমন ভালমানুষ পরোপকারী লোককে কেউ খুন করতে পারে,' সোনা ভাঙা গলায় বলল। 'মনে হচ্ছে যেন দুঃস্বপ্ন দেখছি।'

প্রায় দশ মিনিট পর ঘরে এল ওরা।

'ঠিক আছে,' ইন্সপেক্টর শাহেদের চোখমুখ লাল হয়ে আছে, 'আমার সহকর্মীদের অনুরোধে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়েছি।' থেমে একটু দম নিল সে, '২৭ মে, মানে গত পরশু রাত এগারোটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন?'

দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করল জাহিদ আর সোনা। হঠাৎ করে জাহিদের বুক থেকে কেউ যেন ভারী একটা পাথর সরিয়ে নিল। সোনার সুন্দর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'গত পরশু রাত, মানে বৃহস্পতিবার রাতেই তো, তাই না সোনা?' জাহিদের বিশ্বাস হতে চাইছে না। ভাগ্যদেবী ওকে এতটা দয়া করলেন।

'কোন সন্দেহ নেই, বৃহস্পতিবার রাতেই,' উজ্জ্বল চোখে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টরের সামনাসামনি দাঁড়াল সোনা।

শাহেদ বিব্রত হল, 'দেখুন, আমি জানতে চেয়েছি ওই সময়টায় উনি কোথায় ছিলেন,' মনেপ্রাণে আশা করছে জাহিদ বলবে সে সময়টায় ও শোবার ঘরে ঘুমোচ্ছিল, সেটাই তো স্বাভাবিক। তবে

প্রমাণ করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে স্ত্রী ছাড়া অন্য কারও সাক্ষ্য না পেলে।

'বৃহস্পতিবার রাত! খোদা! কি যে ভয় পেয়েছিলাম!' বাচ্চা মেয়ের মত খুশি হয়ে উঠল মোনা।

একটু রেগে গেল এবার শাহেদ, 'দয়া করে প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি?'

'আমাদের বাড়িতে সে রাতে একটা পার্টি ছিল। ঘর ভর্তি মেহমান ছিল, তাই না, জাহিদ?' চোখে জল মুখে হাসি নিয়ে জাহিদের দিকে ফিরল মোনা।

'ঠিক তাই, ইন্সপেক্টর,' তৃপ্তির সঙ্গে বলল জাহিদ।

'ঠিক ওই রাতেই পার্টি! সেটাও একটা সন্দেহের কারণ হতে পারে,' সরু চোখে চেয়ে আছে শাহেদ, কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে আগের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে।

'ভারি অদ্ভুত লোক তো আপনি!' ভয় দূর হয়ে যাচ্ছে মোনার চেহারা থেকে, স্বতঃস্ফূর্ত হাসিখুশি ভাবটা ফিরে এসেছে। ঘুরে তাকাল ও বাকি দু'জন অফিসারের দিকে, 'জাহিদের অ্যালিবাই থাকলেও কি আপনারা ওকে জেলে পুরে দেবেন নাকি? কেন?'

'মোনা, তুমি থাম। ওনারা শুধু কর্তব্য পালন করছেন। ইন্সপেক্টর শাহেদ যদি একা আসতেন, তাহলে আমি ভাবতাম উনি আন্দাজে ঢিল মারছেন। কিন্তু উনি একা আসেননি, তারমানে সত্যিই কিছু একটা ঝামেলা বেধেছে,' জাহিদের কণ্ঠে শুধুই ব্যঙ্গ।

সাপের মত শীতল হয়ে এল শাহেদের দৃষ্টি, 'সেরাতের পার্টি সম্বন্ধে বলুন।'

ছোট্ট কাজের ছেলেটা এতক্ষণ কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে রান্নাঘরের দরজা থেকে উঁকিঝুঁকি মারছিল। মোনা ওকে ডাকল, 'পিচ্চি, ওপর থেকে বাবুদের খেলনা গাড়িটা নিয়ে এস তো।' বছর দশেকের ফুটফুটে ছেলেটা দৌড় লাগাল সিঁড়ির দিকে, উত্তেজনাকর ঘটনার

কোন অংশই বাদ দিতে চায় না সে।

খুক খুক করে গলা পরিষ্কার করল জাহিদ, 'আমার সহকর্মী ডক্টর সিরাজুল ইসলাম আমেরিকা যাচ্ছেন এক বছরের জন্যে। সেজন্যেই বন্ধুবান্ধবদের দাওয়াত করেছিলাম।'

'মেহমানরা কতক্ষণ ছিলেন?'

'বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক আমরা। একসঙ্গে বসলে সারারাত কাটিয়ে দিতে পারি। সেরাতে সবাই আসতে শুরু করে আটটার পরপর। পরদিন শুক্রবার, ছুটির দিন। তাই বেশ রাত পর্যন্তই গল্প গুজব চলেছে।' চোখ বুজে একটু ভাবল জাহিদ, তারপর মোনার দিকে তাকাল, 'আচ্ছা, কারা সবচেয়ে শেষে বেরিয়েছিল?'

'ওই যে কেমন যেন অদ্ভুত মত ভদ্রলোক...ভুঁইয়া সাহেব আর তাঁর স্ত্রী।' পিচ্চির এনে দেয়া খেলনা দিয়ে রূপক-রুমকিকে কার্পেটে বসিয়ে দিয়েছে মোনা। পিচ্চিও ওদের সঙ্গে খেলার ভান করে কান খাড়া করে রেখেছে এদিকে।

'হ্যাঁ, আবুল হাশেম ভুঁইয়া, আমার সহকর্মী, খুব ঘনিষ্ঠ না হলেও আমরা বন্ধু।'

'হুঁ। ঠিক ক'টায় ওনারা বের হন?'

উত্তরটা দিল মোনা, 'দেড়টার দিকে।'

'অত রাতে!' ভুরু কোঁচকাল শাহেদ।

'এমন কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় সেটা,' মোনার কণ্ঠ শ্লেষ মাখা, 'এর চেয়েও বেশি রাতে দাওয়াত খেয়ে ফিরেছি আমরা বহুদিন। পরদিন শুক্রবার বলে কারোই বাড়ি যাবার তাড়া ছিল না। তাছাড়া সবাই আশেপাশেই থাকেন, পাঁচ মিনিটও হাঁটতে হয় না। সারা রাত চৌকিদার পাহারা দেয়, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা খুবই নিরাপদ। তাই রাত জেগে আড্ডা মারতে কারোই আপত্তি থাকে না।'

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। অফিসার দু'জন মুখ নিচু করে

আছে, ইন্সপেক্টর শাহেদকেও একটু বিচলিত মনে হচ্ছে।

অবশেষে লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শাহেদ। 'হুঁ। ধরে নিচ্ছি আপনি সত্যি কথা বলছেন। তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। আপনার মেহমানদের সাথে কথা না বলে এ মুহূর্তে কিছুই বলা যাবে না।' এত সহজে ছেড়ে দিতে ইতস্তত করছে সে, তা উপস্থিত কারও অনুভব করতে অসুবিধা হচ্ছে না।

'এখন বলুন তো খুনটা হয়েছে কোথায়?' জাহিদ প্রশ্ন করল।

'পতেঙ্গায় লাশ পাওয়া গেছে গতকাল সকালে। খুনটা হয়েছে রাত এগারোটা থেকে চারটার মধ্যে কোন সময়।'

'ধরুন সব মেহমানরা চলে গেল, আর আমি সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে...অথবা যে কোন যানবাহনেই হোক না কেন...চেপে বসলাম চিটাগাঙের উদ্দেশে। কিন্তু পৌঁছাতেই তো ভোর হয়ে যাবে, খুন করব কখন?'

শাহেদের সহকর্মীদের একজন নড়েচড়ে উঠল, বলল, 'তাছাড়া বার্মা ইস্টার্নের ওই মহিলা তো রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ...'

শাহেদ দ্রুত বাধা দিল, 'এখন সবকিছু আলোচনা করার দরকার নেই।'

দু'হাত শূন্যে তুলে বিরক্তির একটা ভঙ্গি করল মোনা। লোকটা কেন এমন করছে! স্বামীর দিকে ফিরে মোনা বলল, 'রাত একটা পর্যন্তও প্রচুর লোক ছিল বাড়িতে, তাই না, জাহিদ?' তারপর চকিতে ফিরল শাহেদের মুখোমুখি, 'ইন্সপেক্টর, কেন আপনি আমার স্বামীর পেছনে লেগেছেন? প্রথম থেকেই আপনি খারাপ ব্যবহার করে আসছেন। ব্যাপারটা কি?'

'দেখুন, ম্যাডাম...'

জাহিদ বাধা দিল, 'আপনি নিশ্চিত আমিই খুনটা করেছি, তাই না?'

'এখনও আপনার বিরুদ্ধে তেমন কোন অভিযোগ আনা হয়নি।'

'কিন্তু আপনি তো তা বিশ্বাস করেন।'

একটু ইতস্তত করল শাহেদ, তারপর বলল, 'হ্যাঁ। আপনি এবং আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার পরেও সেরকমই আমার বিশ্বাস।'

অবাক হল জাহিদ। কেমন করে লোকটা এত নিশ্চিত হচ্ছে? শিড়দাঁড়া বেয়ে হঠাৎ করে শীতল একটা স্রোত উঠে এল। তারপর অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। প্রায় ত্রিশ বছর পর জাহিদ আবার শুনতে পেল লক্ষ লক্ষ পাখির পাখা ঝাপটানর শব্দ, কিচিরমিচির কাকলি। মনে হল যেন গত জন্মের কোন ঘটনা, কেমন যেন ঔতিক, অপার্থিব সেই শব্দ।

মাথা নিচু করে ডান হাতে কপালের হালকা সাদাটে দাগটায় আঙুল বোলাল, আবার শিউরে উঠল।

মোনা ওর দিকে চেয়ে আছে, 'জাহিদ, অ্যাই, কি হল?'

'উঁ?' প্রশ্নবোধক চোখে চাইল জাহিদ।

'কি হল হঠাৎ? মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে!'

'না। ঠিক আছে সব। কিছু হয়নি,' শব্দটা আর শুনতে পাচ্ছে না জাহিদ, শুধু কেমন যেন ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। শাহেদের দিকে ফিরল ও, 'ইন্সপেক্টর, আপনার ধারণা শরীফ চাচাকে আমি খুন করেছি। কিন্তু আমি জানি এটা সত্যি নয়। বইয়ের পৃষ্ঠায় ছাড়া কোনদিন কাউকে খুন করিনি আমি।'

'জাহিদ সাহেব...'

'আমি আপনার অবস্থাটা বুঝতে পারছি। শরীফ চাচাকে একবার যে দেখবে, সে কোনদিনই ভুলতে পারবে না। এমন ভালমানুষ হাসিখুশি লোকটার হত্যাকারী অবশ্যই আপনার ঘৃণার পাত্র। আমি, আমার স্ত্রী, আমরাও কম কষ্ট পাইনি। আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব সবই করব আপনাদের কাজে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু দয়া করে চোর

পুলিস খেলাটা বন্ধ করুন। সবকিছু খুলে বলুন।'

শাহেদ একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল ওর দিকে, তারপর আস্তে করে বলল, 'মনে হচ্ছে আপনি সত্যি কথাই বলছেন, জাহিদ সাহেব।'

'উঃ! এতক্ষণে একটা ভাল কথা শুনলাম,' নিঃশ্বাস ছাড়ল মোনা।

শাহেদ ওর দিকে তাকাল না, 'যদি প্রমাণ হয় আপনি সত্যি কথা বলছেন, তবে এ. এস. আর. আই. ডিপার্টমেন্টের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব আমি।'

'এ. এস. আর. আই.—সেটা আবার কি?'

'আর্মড্ সার্ভিসেস রেকর্ডস অ্যাণ্ড আইডেনটিফিকেশন। আজ পর্যন্ত ওদেরকে ভুল করতে দেখিনি আমি। অবশ্য "প্রথমবার" বলে একটা কথা আছে সবখানেই।'

'সবকিছু খুলে বলা যায় না?'

'এতদূর এসেছি যখন, বলেই ফেলি,' জাহিদের মুখোমুখি সিঙ্গেল সোফায় বসল শাহেদ, সঙ্গীদেরও বসতে ইঙ্গিত করল। মোনা পিচ্চিকে চা বানাতে পাঠাল রান্নাঘরে, পিচ্চি পরনের দু'সাইজ বড় হাফ প্যান্টটা উপর দিকে টানতে টানতে প্রবল অনিচ্ছায় বেরিয়ে গেল। 'আপনাদের শেষ মেহমান কখন গেছেন সেটা আসলে খুব একটা জরুরি ব্যাপার নয়। মোটামুটি যদি প্রমাণ করতে পারেন যে রাত বারোটা পর্যন্ত বাসাতেই ছিলেন, তাহলেই...'

'রাত বারোটায় সকলেই ছিলেন, কম করেও দশ বারোজন,' মোনা দিল উত্তরটা।

'তাহলে বোধহয় আপনি বেঁচে গেলেন। একটু আগে আমার সহকর্মী বার্মা ইস্টার্নের যে মহিলার কথা বললেন, তাঁর সাক্ষ্য, আর পোস্ট মর্টেম রিপোর্টের ভিত্তিতে নিশ্চিত করেই বলা যায় শরীফ সাহেব খুন হয়েছেন রাত বারোটা থেকে তিনটার মধ্যে।' মাথা নিচু করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শাহেদ। 'খুনী ধারাল কোন অস্ত্র দিয়ে

হয়। ওই কার্টনেই জাহিদ সাহেবের ফিঙ্গারপ্রিন্টের রেকর্ড পেলাম। কৌতূহলবশেই মিলিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম, ভাবতেই পারিনি মিলে যাবে। তাছাড়া একটা দুটো নয়, সারা গাড়িতে অসংখ্য ছাপ পাওয়া গেছে। এ. এস. আর. আই.-এর ভুল হয়নি। আমি নিজেও লে-আউট দেখেছি। শুধু মিল হলে কথা ছিল, ছাপগুলো হুবহু এক।'

রূপক আর কর্নিক নীরবতা ভেঙে একযোগে কাঁদতে শুরু করল, ওদের খিদে পেয়েছে।

ছয়

রাত দশটায় আবার যখন ডোরবেল বাজল, তখন মোনাই এগিয়ে গেল দরজা খুলতে। জাহিদ ওপরের স্টাডিতে। পিজ্জি খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, ভূমিকম্প হলেও এখন সে জাগবে না। মোনা নিচের বাথরুমে রূপক আর কর্নিকির গা মুছিয়ে রাতের শোবার পোশাক পরাচ্ছিল। শোবার আগে গা মুছিয়ে না দিলে রাতে গরমে ওদের ভাল ঘুম হয় না। গায়ে পাউডার ছিটিয়ে পাতলা মলমলের জামাগুলো পরাতে যেতেই বেলের শব্দ কানে এল। ওদের দু'জনকে সোফার সামনে দাঁড় করিয়ে দরজা খুলতে গেল মোনা।

পিপ হোল দিয়ে উঁকি দিতেই অবাক হয়ে গেল। ঘন্টা চারেক হয়নি বিদায় হয়েছে, আবার কেন এসেছে ইন্সপেক্টর সাহেব! দৌড়ে সিঁড়ির গোড়ায় এসে জাহিদের উদ্দেশ্যে চেঁচাল মোনা, 'জাহিদ,

ইন্সপেক্টর সাহেব এসেছেন।'

জাহিদ কোন উত্তর দিল না। অপেক্ষা করতে করতে আবার ডাকার জন্যে মোনা মুখ খুলতেই জাহিদকে দেখা গেল। খালি পায়ে স্লিপিং সুট পরে আছে। নিচু, ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কে?'

'ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান,' জাহিদকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, মোনার ভয় ভয় করতে লাগল, 'জাহিদ, কি হয়েছে? শরীর খারাপ?'

'না না, ঠিক আছে। দরজাটা খুলে দাও, আমি আসছি।'

শাহেদ বাইরে থেকে মোনার গলা শুনেছে, তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল। গম্ভীর মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে দরজা খুলল মোনা।

জাহিদ স্টাডিতে বসে বসে ঘামছে। কেন এত ভয় লাগছে! একদিনে পরপর এত কিছু ঘটে যাওয়াতেই ভয় হচ্ছে? প্রথমেই বিনা নোটিশে পুলিস এল, অদ্ভুত এক অভিযোগ নিয়ে। তার উপর শাহেদ রহমানের অস্বস্তিকর আচরণ। তারপরই জাহিদ শুনতে পেয়েছিল পাখির শব্দ। প্রথমে বুঝতেই পারছিল না কিসের শব্দ, কিন্তু কেমন যেন বড় পরিচিত মনে হচ্ছিল ওই অদ্ভুত শব্দ।

রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে উপরে এলে শব্দটা আবার শুনতে পেয়েছিল জাহিদ।

নতুন একটা লেখায় হাত দিয়েছে সম্প্রতি। টাইপরাইটারে সেই কাজই করছিল। একটা বানান ভুল হয়ে যেতে ঝুঁকে পড়ে ঠিক করতে গেলেই আবার শব্দটা ভেসে আসে।

চড়ুই পাখি!

হাজার হাজার কোটি কোটি চড়ুই পাখি! ঘরবাড়ির ছাদে, গাছের ডালে, ইলেকট্রিক তারে সার বেঁধে বসে আছে। কিচিরমিচির শব্দ উঠছে চারপাশ থেকে।

মাথার ব্যথাটা কি আবার ফিরে আসছে! ওহ্! খোদা! ভয়ে কুঁকড়ে গেল জাহিদ। টিউমার! টিউমারটা কি আবার গজিয়েছে? বড় হতে

শুরু করেছে?

পাখিদের কিচিরমিচির ডাক আস্তে আস্তে বাড়তে থাকল, এক সময় কানে তালা ধরিয়ে দিল। সঙ্গে যোগ হয়েছে পাখা ঝাপটানর শব্দ। জাহিদের মনে হল যেন ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সার বেঁধে বসে থাকা পাখিগুলো একযোগে পাখা মেলেছে, ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

'উত্তর দিকে যেতে হবে, দোস্ত,' বিড়বিড় করে আওড়াল জাহিদ শব্দ ক'টা, কিন্তু এর অর্থ কি নিজেই জানে না।

এরপর হঠাৎ করেই সব শব্দ মিলিয়ে গেল। এটা ১৯৯২ সাল, ১৯৬০ নয়। স্টাডিতে বসে আছে জাহিদ। প্রাপ্ত বয়স্ক, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে ওর, আর আছে একটা টাইপরাইটার।

লম্বা করে শ্বাস নিল জাহিদ। না, মাথাব্যথা হয়নি। সবকিছু ঠিকই আছে। কিন্তু...

টাইপরাইটারে আটকানো পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার দিকে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেল জাহিদ। একটা নতুন লাইন লেখা হয়েছে, কখন লিখেছে মনে পড়ল না ওর।

'পাখিরা আবার উড়ছে।'

কিন্তু শব্দগুলো টাইপ করা নয়, এইচ-বি পেন্সিলে লিখেছে ও, পেন্সিলটা পড়ে আছে টাইপরাইটারের পাশে। আশ্চর্য! কখন লিখল ও! তাছাড়া পেন্সিল তো সে ব্যবহারই করে না! পেন্সিল নির্বাসনে দিয়েছে ওর মৃত অতীতের সঙ্গেই। কাঁপা কাঁপা হাতে পেন্সিলটা তুলে হোল্ডারে রেখে দিল জাহিদ।

ঠিক তখনি মোনা নিচ থেকে ডাকল। জাহিদের ইচ্ছে হল ওকে সবকিছু খুলে বলে। কিন্তু কি এক অজানা সঙ্কোচ ওকে চেপে ধরেছে। যদি টিউমারটা সত্যিই গজিয়ে থাকে, মোনা খবরটা কিভাবে নেবে? ভয়টা কিছুতেই দূর হচ্ছে না। ব্যাপারটা কি হল? হঠাৎ করে কেন

পুরানো স্মৃতি মনে পড়ে গেল এত বছর পর! আর কাগজের লেখা কথাটার মানেই বা কি?

হাত দুটো চোখের সামনে ধরল জাহিদ। থরথর করে কাঁপছে এখনও।

ঠিক পাঁচ মিনিট পর নিচে নামল জাহিদ। কেন ফিরে এসেছে আবার শাহেদ রহমান? 'কি ব্যাপার, ইন্সপেক্টর?' কণ্ঠে শুধুই কাঠিন্য।

উত্তরে ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান সিগারেটের খোলা প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল, 'জাহিদ সাহেব, যদি কিছু মনে না করেন আমি আপনাদের দু'জনের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'ধন্যবাদ, ইন্সপেক্টর। আমি সিগারেট খাই না। ভেতরে আসুন।'

টেলিভিশনে কি একটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। ভল্যুম কমিয়ে দিয়ে জাহিদ সোফায় বসল, মুখোমুখি বসেছে ইন্সপেক্টর। মোনা বাচ্চাদেরকে শুইয়ে দেবার জন্যে ওপরের শোবার ঘরে চলে গেল, দু'জনেই চুপচাপ কিছুক্ষণ টেলিভিশনের দিকে চেয়ে রইল।

বাচ্চাদেরকে শুইয়ে দিয়ে মোনা নেমে এল। জাহিদের পাশে বসে পড়ল সোফায়।

শাহেদ নীরবতা ভাঙল, 'জাহিদ সাহেব, আপনি এখন একটা নয়, দুটো খুনের সাসপেক্ট।'

আঁৎকে উঠল মোনা, 'কী!'

'আমি সবই বলব। বলার জন্যেই এসেছি। জানি দ্বিতীয় খুনের জন্যেও আপনার স্বামীর অ্যালিবাই আছে, না থেকেই পারে না।'

'কে খুন হয়েছে?' জাহিদের কণ্ঠ বরফের মত শীতল।

'আমিন ইকবাল নামের এক সাংবাদিক। ঢাকায়, গোপীবাগে ভদ্রলোকের নিজের ফ্ল্যাটে লাশ পাওয়া গেছে।' মোনা থরথর করে কেঁপে উঠল। মৃদু হেসে শাহেদ বলল, 'মনে হচ্ছে ভদ্রলোক আপনাদের পরিচিত!'

'কি হচ্ছে এসব!' ফিসফিস করে বলে উঠল মোনা।

'কেমন করে বলব, মিসেস হাসান, ভাবতে গিয়ে তো আমার মাথাও খারাপ হবার জোগাড় হয়েছে। আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করতে আসিনি, জাহিদ সাহেব। আমি এসেছি আপনাদের কাছে সাহায্য চাইতে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জাহিদ। 'এবারও কি আমিন ইকবালের মৃতদেহের আশেপাশে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে?'

'ঠিক তাই। অসংখ্য। আচ্ছা, গত সপ্তাহে "শনিবার"-এ আপনার উপর একটা লেখা বেরিয়েছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'পত্রিকার ওই সংখ্যাটা আমিন ইকবালের ঘরে পাওয়া গেছে, একটা পৃষ্ঠা মৃতদেহের বুকে বোর্ড পিন দিয়ে আটকানো ছিল।'

'খোদা!' দু'হাতে মুখ ঢাকল মোনা।

'আমিন ইকবালের সঙ্গে আপনাদের কি সম্পর্ক বলতে আপত্তি আছে কি?'

'মোটেই না।' নড়েচড়ে বসল জাহিদ, চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে অকারণেই কাঁচটা মুছতে লাগল। 'লেখাটা পড়েছেন?'

'আমার স্ত্রী রুস্তম শেরের ভক্ত, ওই পত্রিকাটা কিনে এনেছিল। তবে সত্যি বলতে কি আমি লেখাটা পড়িনি, ছবিগুলো দেখেছি। তবে খুব তাড়াতাড়িই পড়ার ইচ্ছে আছে।'

'পড়ার দরকার নেই। তবে লেখাটা ছাপা হবার পেছনে আমিন ইকবালের অবদান আছে।'

'আচ্ছা, ও বিষয়ে পরে আসছি। শরীফ খান থেকে শুরু করি। ওনার গাড়িতে যেসব ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে, আর আমিন ইকবালের ফ্ল্যাটে যেসব ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে, তা হুবহু এক। অর্থাৎ একই লোকের কাজ। দুটো খুনের পদ্ধতিও সেটাই প্রমাণ করে।

ছাপগুলো যদি আপনার না হয়, তবে এই ঘটনা নিঃসন্দেহে গিনেস বুক অফ ওয়ার্লড রেকর্ডস-এ স্থান পাবে।'

'জানি, পৃথিবীর প্রতিটা মানুষের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ভিন্ন। একজনের সঙ্গে অন্য একজনের ছাপের মিল হয় না।'

'আচ্ছা, আপনার বাচ্চা দুটো তো যমজ, তাই না?'

খাপছাড়া প্রশ্নে একটু অবাক হল জাহিদ। 'হ্যাঁ।'

'ওরা কি আইডেন্টিকাল টুইন্স্?'

এবার মোনা উত্তর দিল, 'ছেলে-মেয়ের জোড়া কখনও আইডেন্টিকাল হয় না। শুধু ছেলে বা মেয়ে হলেই সেটা হতে পারে। তবে রূপক আর রুমকি দেখতেও একই রকম।'

মাথা নাড়ল শাহেদ। 'আইডেন্টিকাল টুইন্সের ফিঙ্গারপ্রিন্টও কখনও আইডেন্টিকাল হয় না।' একটু থেমে হঠাৎ সরাসরি চাইল জাহিদের দিকে, 'আপনার কি কোন যমজ ভাই আছে, জাহিদ সাহেব?'

এ প্রশ্নটাই আশা করছিল জাহিদ। দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, 'না। যমজ ভাই কেন, আমার কোন ভাই বোনই নেই। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান আমি। সত্যি বলতে কি রূপক আর রুমকি ছাড়া পৃথিবীতে আমার রক্তসম্পর্কের আত্মীয় কেউ নেই। যে ক'জন ছিলেন, সবাই মারা গেছেন।' একটু থেমে যোগ করল, 'ভাবছেন এত বয়স্ক লোকের অতটুকু ছেলেমেয়ে কেন, তাই না? বিয়ের পরপরই ডক্টরেট করার জন্যে আমি ইংল্যাণ্ডে যাই, মোনাও সঙ্গে যায়। পাঁচ বছর পর ফিরে আসি। তারপর থেকেই সন্তানের আশায় দিন গুনছি আমরা। অবশেষে এতদিন পরে হল। নতুন বাবা-মা হিসেবে আমরা একটু বুড়োই, কিন্তু কি আর করা যাবে!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করল জাহিদ। 'ওরা জন্মাবার পরেই আমি আবার নিজের নামে লেখায় হাত দিয়েছি।'

'ছদ্মনামটা তো রুস্তম শের, তাই না?'

'হ্যাঁ।' একটু বিষণ্ন দেখাল জাহিদকে। 'তবে ওই পর্ব শেষ হয়ে গেছে। বাবা হবার পর আবার নতুন জীবন শুরু করেছি আমি।'

কিছুক্ষণের জন্য নিশ্ছিদ্র নীরবতা নেমে এল ঘরে। হঠাৎ জাহিদ বলে উঠল, 'স্বীকার করুন, ইন্সপেক্টর।'

ভুরু কুঁচকে চাইল শাহেদ, 'মাফ করবেন, কি বললেন?'

হাসল জাহিদ। 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি আপনি কি ভাবছেন। আপনি ভাবছেন আমার এক যমজ ভাই আছে, যে দেখতে হুবহু আমার মত। তাকে লোকজনের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি চিটাগাঙ গিয়ে শরীফ চাচাকে খুন করে এসেছি। তারপর তাঁর গাড়িতে চেপে ঢাকায় পৌঁছেছি, গাড়ির সর্বত্র হাতের ছাপ রেখে দিয়েছি আপনাদের জন্যে। তারপর গোপীবাগে গিয়ে আমিন ইকবালকেও খুন করলাম, হাতের ছাপ রেখে এলাম সেখানেও। এরপর বাড়ি ফিরে ভালমানুষ সেজে বসে আছি, যমজ ভাইকে লুকিয়ে রেখেছি কোথাও। দাওয়াতের মেহমানরা এবং আমার ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে দেখেনি, দেখেছে আমার যমজ ভাইকে, তাই না?'

অবাক হয়ে চেয়ে রইল ওর দিকে শাহেদ, একবারও বাধা দিল না।

'জাহিদ, কি বলছ এসব!' চেতনা ফিরে আসতে রাগত কণ্ঠে ওকে মৃদু ভর্ৎসনা করল মোনা।

'সরি, মোনা। কিন্তু আমাদের ইন্সপেক্টর ঠিক এমনটাই ভাবছেন।'

'খুব একটা মিথ্যে বলেননি,' শাহেদ বিস্মিত কণ্ঠে বলল। 'তবে আপনার কল্পনাশক্তি চমৎকার। রুস্তম শেরের নামে গোয়েন্দা কাহিনীগুলো আপনারই লেখা তা বিশ্বাস করতে এখন আর কষ্ট হচ্ছে না।'

'আপনি রুস্তম শেরের ভক্ত নন, তাই না?'

'ঠিকই ধরেছেন। তবে আমার স্ত্রী রুস্তম শেরের নামে পাগল। ওর

কাছ থেকেই ভাবছি লেখাগুলো সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেব।'

'ইন্সপেক্টর সাহেব, আমার জন্ম পতেঙ্গা মাতৃসদনে। ছেলেবেলাটা কেটেছে পতেঙ্গাতেই। একটু খোঁজখবর করলেই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। আমার কথা বিশ্বাস করার কোন প্রয়োজন নেই।'

'আপনার মেহমানদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। তাঁরা সবাই আপনাদের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন।'

'মিথ্যে কথা বলার তো কোন কারণ নেই, সবাই শিক্ষিত মান্যগণ্য লোক,' ফোড়ন কাটল মোনা।

'আর যেহেতু আপনার যমজ কোন ভাই নেই, সেহেতু আপনাকে আর ঝামেলায় জড়ানো হবে না।'

'তাহলে ফিঙ্গারপ্রিন্টের রহস্যের সমাধান হবে কেমন করে?' জাহিদ প্রশ্ন করল। 'যদি আমি এত প্ল্যান করে যমজ ভাইকে প্ল্যান্ট করে একের পর এক খুনখারাবী করার মত বুদ্ধি রাখি, তাহলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছেড়ে আসার মত বোকামি করব কেন? আমাকে দেখে খুব বোকা মনে হয়?'

'মোটেই না। আপনি দেশের গৌরব। তাছাড়া এতদিন পুলিসে চাকরি করছি, মানুষ চেনার ক্ষমতাটা আমাকে অর্জন করতে হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি আপনি মিথ্যে কথা বলছেন না। মিথ্যে কথা বলা বড় কঠিন, সবাই পারে না।'

'কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্টের ব্যাপারটাই আমাকে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে। আপনি যেভাবে বলছেন, তাতে মনে হচ্ছে ছাপগুলো ইচ্ছেকৃত ভাবে এমন জায়গায় ফেলা হয়েছে যাতে সহজেই আপনাদের চোখে পড়ে।'

'আমরাও ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি।'

'ফিঙ্গারপ্রিন্ট কি নকল করা যায়?'

'না। অনেকে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হতে পারেনি। আমেরিকায় একটা কিডন্যাপিঙের কেসে এরকম একটা চেষ্টা করা

হয়েছিল, কিন্তু কাজ হয়নি।'

মোনা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'ইন্সপেক্টর সাহেব, আপনাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া করেছেন তো?'

শব্দ করে হেসে উঠল শাহেদ, 'মেয়েদের চোখ বড় সাংঘাতিক। খাওয়ার সময় আর পেলাম কই! এখান থেকে থানায় পৌঁছেই আমি ইকবালের খবরটা পেলাম। খুন হবার আধ ঘন্টার মধ্যেই পুলিস খবর পায়, সাভারে খবরটা দেয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, তা ওরা জানত। এই খুনটার সঙ্গেও যে আপনার সম্পর্ক আছে, তা বুঝতে বুদ্ধির দরকার হয় না। আমিনের বুকে গাঁথা পত্রিকার ছবিটাই তা বলে দেয়। খবরটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় ঘটনাস্থলে চলে যাই, রাস্তায় পাঁচ মিনিট থেমে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্পেশালিস্টকে তুলে নেই। ওখান থেকেই সরাসরি আসছি।'

ত্বরিতে উঠে দাঁড়াল মোনা, 'ভাত বোধহয় আর নেই। একটু রান্না করব? নাকি ক'টা স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে দেব?'

বিব্রত হল শাহেদ, 'না না, এত রাতে রান্না করার ঝামেলা করবেন না। একটু বিস্কুট-টিস্কুট হলেই চলবে।' মোনা উঠে দাঁড়াতে কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল, 'ধন্যবাদ, ভাবী।'

সম্বোধনটা কানে লাগল। ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু হেসে মোনা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

পকেট থেকে একটা ছোট নোটবুক বের করে খুলল শাহেদ, 'আপনি কি সিগারেট খান?'

'না। প্রায় আট বছর হয়ে গেল ছেড়েছি।'

'কোন্ ব্র্যাণ্ড খেতেন? ফাইভ ফিফটি ফাইভ?'

অবাক হল জাহিদ, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কিভাবে জানলেন?'

উত্তর না দিয়ে আবার প্রশ্ন করল শাহেদ, 'আপনার রক্তের গ্রুপ এ-নেগেটিভ?'

'এখন বুঝতে পারছি বিকেলে কেন আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিলেন। শক্ত অ্যালিবাই না থাকলে এতক্ষণে আমি হাজতে থাকতাম, তাই না?'

'ঠিক ধরেছেন। শরীফ খানের গাড়িতে ফাইভ ফাইভের আধপোড়া টুকরো পাওয়া গেছে, আমিনের ফ্ল্যাটেও। দু'জনের একজনও সিগারেট খেতেন না। শরীফ খানের গাড়িতে পাওয়া টুকরোগুলোর গোড়ার থুথু থেকে পুলিসের সেরোলজিস্ট ব্লাড টাইপ নির্ণয় করেছে। এ-নেগেটিভ। আমিনের ফ্ল্যাটেরগুলো পরীক্ষার জন্যে পাঠানো হয়েছে, এখনও রিপোর্ট আসেনি। তবে আমি নিশ্চিত ওটাও এ-নেগেটিভই হবে।'

'আশ্চর্য! আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না!' সোফায় এলিয়ে পড়ল জাহিদ।

'তবে একটা জিনিস মিলছে না। লালচে চুল। শরীফ খানের গাড়িতে বেশ কিছু লম্বা লালচে রঙের চুল পাওয়া গেছে, হঠাৎ করে দেখে মনে হয় অবাঙালী কারও চুল। এই চুল দেখে এলাম আমিন ইকবালের ফ্ল্যাটে সোফার কাভারে, যেখানে খুনী বসেছিল। আপনার চুল কুচকুচে কালো, ছোট করে ছাঁটা। আমার মনে হয় না আপনি পরচুলা পরেছেন।'

'না, কোন বোকাও এগুলোকে পরচুলা বলে ভুল করবে না,' রেগে উঠে টাক হবো হবো মাথায় হাত বুলাল জাহিদ। 'তবে খুনী হয়ত পরচুলা ব্যবহার করছে। পত্রিকায় ঘন ঘন ছবি ছাপার ফলে অনেকেই রাস্তায় আমাকে চিনে ফেলে আজকাল।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে। তবে চেহারা যদি আপনার মতই হয়, তবে পরচুলা পরলেও লোকে চিনতে পারে। পারে না?'

'তা পারবে, একটু লক্ষ্য করলেই পারবে।'

'তবে মিসেস আমান, বার্মা ইস্টার্নের কোয়ার্টারের একজন ভদ্রমহিলা যাকে শরীফ খানের গাড়িতে লিফট নিতে দেখেছিলেন, খুনী

যদি সেই লোক হয়, তবে আপনার সঙ্গে তার আপাত দৃষ্টিতে কোন বাহ্যিক মিল নেই। তবে মিসেস আমানও খুব বেশি কিছু বলতে পারেননি। শুধু বলেছেন লোকটা ছিল খুব লম্বা, ছ'ফুটের মত, আর পরনে ছিল কালচে রঙের সুট।'

পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা দেহটাকে নিয়ে জীবনে প্রথমবারের মত স্বস্তি পেল জাহিদ। 'ভদ্রমহিলার ভুলও হতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে উচ্চতা বাড়ানো কঠিন কিছু নয়।'

দু'দিকে মাথা নাড়ল শাহেদ। 'তা নয়। ভদ্রমহিলা আপনাকে চেনেন, মানে সামনাসামনি দেখেছেন আগে। আপনার সঙ্গে ওই লোকের চেহারার কোন মিলই নেই। লোকটা অস্বাভাবিক লম্বা, তেমনি চওড়া। মানে মোটা নয়, কিন্তু বিরাট কাঁধ। দস্তুর মত চোখে পড়ার মত ফিগার। আপনি শত ছদ্মবেশ নিলেও ওরকম হতে পারবেন না। তবে এই লোকটাই খুনী কিনা, তা এখনও জানি না আমরা।' একটু চিন্তা করে শাহেদ জানতে চাইল, 'আচ্ছা, আপনার জুতোর মাপ কত?'

মোনা এসময় ট্রেতে স্যাণ্ডউইচ আর চায়ের তিনটে কাপ সাজিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। কফি টেবিলে রাখতেই জাহিদ চায়ের কাপ তুলে নিল। শাহেদ স্যাণ্ডউইচের প্লেটটা হাতে নিয়ে নোট বুকটা পাশে রেখে দিল। মোনাও চায়ের কাপ তুলে নিয়ে জাহিদের পাশে বসল।

'সাত,' চায়ে চুমুক দিল জাহিদ।

'আমাদের রিপোর্টে বিরাট জুতোর সাইজের কথা উল্লেখ আছে। তবে সেটা এই লোকের কিনা প্রমাণ করার উপায় নেই। এমনকি কোন ছবিও তুলে রাখা হয়নি। যে দেখেছে তার কথামত এগারো কি বারো সাইজের জুতো।'

'কোথায় পেয়েছেন এই জুতোর ছাপ?'

'বাদ দিন। ওটা জরুরি কিছু নয়। মনেও হয় না এই কেসের সঙ্গে কোন যোগ আছে। ছাপগুলো নকল হওয়াও খুব স্বাভাবিক। ছয়

সাইজের যে-কোন লোক বারো সাইজের জুতো পরে কাদার উপর হেঁটে ছাপ ফেলতে পারে। তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। তবে ব্লাড টাইপ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, সিগারেটের ব্র্যাণ্ড সবই আপনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।'

'ও তো সিগারেট খায় না...' বাধা দিল মোনা।

'যে ব্র্যাণ্ড আগে খেতেন, সেটা। আপনি ঝামেলায় পড়ে গেছেন, জাহিদ সাহেব। আইনত আপনি পতেঙ্গারও বাসিন্দা, যেহেতু ওই এলাকাতেও ট্যাক্স দেন। তাই আপনার প্রতি নজর রাখার অধিকার আমার রয়েছে, যেহেতু আমি পতেঙ্গা থানার ইন্সপেক্টর। কিন্তু সবচেয়ে বড় অদ্ভুত ব্যাপারটা কি, জানেন? আমিন ইকবাল যখন খুন হয়, তখন আপনি আমাদের সামনে বসে, শুধু আমি নই, আরও দু'জন পুলিস অফিসারও ছিলেন। কিন্তু আপনি যদি এখানে বসে থাকেন, তাহলে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট গোপীবাগে গেল কেমন করে?'

কেউ কোন উত্তর দিল না। জাহিদ আর মোনা নীরবে চায়ের কাপে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে।

স্যাণ্ডউইচ শেষ করে চায়ের কাপটা তুলে নিল শাহেদ, 'এবার আমিন ইকবালের ব্যাপারটা খুলে বলুন তো।'

জাহিদ মোনার দিকে তাকাল, 'তুমিই না হয় বল।'

চায়ের শূন্য কাপটা টেবিলে রেখে উঠে গিয়ে টিভিটা বন্ধ করে দিল মোনা। কোথা থেকে শুরু করবে ভাবতে গিয়ে একটু সময় নিল। তারপর বলতে শুরু করল। প্রথমদিকে শাহেদ দু'একবার থামিয়ে দু'একটা প্রশ্ন করল। বাকি সময়টা চুপচাপ শুনে গেল, দরকার মত নোটবুকে টুকে নিচ্ছে।

'আমিন ইকবাল বাজে লোক ছিল। মানে আমি বলতে চাচ্ছি না যে ওঁ খুন হওয়াতে আমি খুশি হয়েছি, কিন্তু সত্যিই বড় পাজি লোক ছিল।

কিছুদিনের জন্যে আমাদের জীবনে অশান্তির ঝড় তুলেছিল লোকটা। কিভাবে জানি না, ও জেনে যায় জাহিদই আসলে রুস্তম শের। রশিদ ভাইয়ের ধারণা ওনার প্রেসের কোন কর্মচারীই ঘটনাটা ফাঁস করে দেয়। কিন্তু সেই লোকই বা কিভাবে জানলো সেটাও এক রহস্য।'

'রশিদ ভাই...ইনি কে?' শাহেদ নোটবুকে পয়েন্ট টুকছে।

'"হীরক পাবলিশার্স"-এর মালিক। রুস্তম শেরের সব ক'টা বইয়ের প্রকাশক। ওনাদের...মানে উনি আর ওনার স্ত্রী—প্রাক্তন স্ত্রী, বছর দু'য়েক আগে ডিভোর্স হয়েছে—হাসনা আপার সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। হাসনা আপা আমার বড় বোনের ছেলেবেলার বান্ধবী।'

'আচ্ছা, আপনার পরিবারের সবাই কে কোথায় আছে?'

'বাবা বছর পাঁচেক আগে ইন্তেকাল করেছেন। মা যশোরে আমাদের বাড়িতেই থাকেন। বড় বোনের শ্বশুরবাড়ি ওখানেই, কাছাকাছি। বড় বোনই মায়ের দেখাশোনা করে। একমাত্র ভাই আমেরিকায় থাকে। দু'বছর পর পর আসে। ব্যস্, আর কেউ নেই। মামা-চাচা আছেন, সব যশোরে।' এ পর্যন্ত বলে মোনা জাহিদের দিকে তাকাল, 'অ্যাই, অনেকক্ষণ ওপরে যাওয়া হয়নি। ওদেরকে একটু দেখে আসবে?'

জাহিদ উঠে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ বসে থেকে পায়ে ঝিঁঝি লেগেছে। বোধশক্তি ফিরে পেতেই ওপরে রওনা দিল।

কানে এল শাহেদ জিজ্ঞেস করছে, 'তারপর? আমিন ইকবাল কি করল তথ্যটা জানার পর?'

'ব্ল্যাকমেইল,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মোনা।

'কি চেয়েছিল সে?'

'টাকা। এক লাখ টাকা।'

শাহেদ হেসে উঠল, 'মাত্র এক লাখ? আরে ব্যাটা, চাইবি যখন তখন নজর একটু উঁচু কর!'

মোনাও হেসে উঠল, 'টাকাটা বড় কথা নয়। ব্ল্যাকমেইলের ভিকটিম হওয়ার আঘাতটাই বড়। জাহিদ খুবই আপসেট হয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও।'

জাহিদ দোতলায় এসে শোবার ঘরে ঢুকল। কটের ভেতর বাচ্চারা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। খালি দুধের বোতল দুটো তুলে নিল ওদের শিথিল হাত থেকে। তারপর নিচে নেমে রান্নাঘরে ঢুকে বোতল দুটো ধুয়ে রাখল। তারপর বাথরুমে গেল, অনেকক্ষণ যাওয়া হয়নি। মোনা আর শাহেদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসছে।

'রশিদ ভাইয়ের কথা বললেন, ওনার পুরো নাম কি?'

'রশিদ তালুকদার। প্রেসের অর্ধেক মালিকানা হাসনা আপার। ডিভোর্স হয়ে গেলেও ওনাদের সম্পর্ক খুবই ভাল। তা নাহলে দিনের বেশির ভাগ সময় অফিসে একসঙ্গে কাটাতে পারতেন না। সংবত ব্যবসার কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। দু'জনের সঙ্গেই আমাদের বন্ধুত্ব আছে। জাহিদ যখন রুস্তম শের নাম লিখতে শুরু করে, তখন রশিদ ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেই করেছিল। ওনাকে অবিশ্বাস করারও কোন কারণ নেই। তাছাড়া বইগুলো প্রচুর লাভ করে। উনি আর হাসনা আপা ছাড়া কেউই এতদিন রুস্তম শেরের আসল পরিচয় জানত না।

'আমিন ইকবাল ছিল রুস্তম শেরের অন্ধ ভক্ত। "রুস্তম শের ফ্যান ক্লাবের" প্রতিষ্ঠাতাও সে-ই। ও-ই সম্ভবত একমাত্র লোক যে রুস্তম শের এবং জাহিদ হাসানের লেখা সব ক'টা বই পড়েছে। তারপর কোনভাবে সন্দেহ করে দু'জনের যোগসূত্র।

'জাহিদ প্রথমে ওকে পাত্তাই দেয়নি, কারণ তখন পর্যন্ত আমিন ইকবালের হাতে কোন প্রমাণ ছিল না। মরিয়া হয়ে আমিন ইকবাল রশিদ ভাই আর হাসনা আপাকে জ্বালাতন করতে শুরু করে। ওনারাও ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব দেননি, অফিস থেকে আমিনকে রীতিমত অপমান করে বের করে দেন।

'রশিদ ভাইয়ের পরামর্শে প্রতিটা বইয়ের পিছনে রুস্তম শেরের বানানো লেখক পরিচিতি সহ ছবি ছাপা হয়েছে। আমরাও ঠিক জানি না সে লোক কে। আমিন ইকবাল রশিদ ভাইয়ের কাছে ওই লোকের ঠিকানা দাবি করে।'

জাহিদ এ সময় ধীর পায়ে এক গ্লাস পানি হাতে এসে বসল। মোনা দু'পা তুলে সোফায় আরাম করে বসেছে।

'রশিদ ভাই সেবারও লোক ডাকিয়ে তাকে বের করে দেন।'

'ঠিক কবে এসব ঘটনা ঘটে?' শাহেদ প্রশ্ন করল।

'তারিখ বলতে পারব না, সাত/আট মাস তো হবেই।'

'আমিন ইকবাল কি আপনাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করত?'

'না। চিঠিতে। জাহিদের ডিপার্টমেন্টের ঠিকানায় চিঠি লিখত সে।'

'হুঁ। তারপর কি হল?'

'রশিদ ভাইয়ের ধারণা তাঁর প্রেসের কোন কর্মচারী আমিন ইকবালকে সাহায্য করেছে, হয়ত টাকা পয়সার বিনিময়ে। কারণ এর পরপরই "হীরক পাবলিশার্সের" সঙ্গে রুস্তম শেরের সই করা চুক্তিপত্র আর রুস্তম শেরের নামে ইস্যু করা একটা রয়্যালটি চেকের ফটোকপির সঙ্গে লেখা আমিন ইকবালের চিঠি পায় জাহিদ। চুক্তিপত্রে রুস্তম শেরের ঠিকানা খুলনার এক আবাসিক এলাকায়, তবে রয়্যালটি চেক পাঠাবার ঠিকানা ঢাকার জি. পি. ও-র একটা বক্স নাম্বার। চিঠিতে আমিন ইকবাল লেখে যে খুলনার ঠিকানাটার কোন অস্তিত্বই নেই, বাস্তবেও নেই। ওটাও ছবির মত আজগুবি। জাহিদ তখনও ভয় পেল না, কারণ প্রমাণ হিসেবে ফটোকপি দুটোর কোন মূল্য নেই।'

'পুলিসের কাছে গেলেন না কেন?'

'গিয়ে লাভ হত না। আমিন ইকবালকে আমরা দু'জন চোখে দেখিনি, চিঠিই পেয়েছি শুধু। চিঠিগুলোও লেখা হয়েছে খুব কায়দা

করে, কোন ভয় দেখায়নি সে। জানেন তো নাইটে ল' পড়ে। সব চেয়ে বড় কথা ব্যাপারটা জানাজানি হোক তা জাহিদ চায়নি তখনও পর্যন্ত। এদিকে আমিন ইকবাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। এর পরের রয়্যালটি চেক নেবার সময় এসে গেল। আমিন ইকবাল জি. পি. ও-র সামনে অপেক্ষা করতে থাকে পরপর কয়েকদিন। জাহিদ চিন্তাও করেনি সে এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে। ওর চেহারাও চিনত না। তাই জাহিদ যেদিন চেকটা নিতে গেল, সেদিন ওকে অনুসরণ করা আমিনের পক্ষে হল পানির মত সহজ কাজ। জাহিদও কিছু সন্দেহ করেনি, ও তো এমনিতেই আত্মভোলা টাইপের। পর পর কয়েকটা ছবি তোলে সে। সম্ভবত ক্যামেরাতে জুম ফিট করা ছিল। একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে জাহিদ ২১১ নং বক্সটা খুলছে, পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে নাম্বারটা। আমিন ইকবালের কথা যখন আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি, তখনই ছবিগুলো আসে। জাহিদ সাংঘাতিক খেপে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রশিদ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্যে ঢাকা চলে গেল। রশিদ ভাই-ই শেষ পর্যন্ত ভেবেচিন্তে বুদ্ধিটা দেন। আমিন ইকবালের আগে আমরাই যেন কাহিনীটা ফাঁস করে দেই। তাহলে অন্তত অনেক ক্যাঅাল থেকে রক্ষা পাবে জাহিদ। আমিনের হাতে যে ছবিগুলো আছে, তা যে কোন পত্রিকা মোটা দামে কিনে নেবে। ব্যাপারটা গোপন রাখার আর কোন উপায় নেই। বাড়ি ফিরে জাহিদ আমার সঙ্গে আলাপ করে। তখন আমরা দু'জনই অনুভব করি অনেকদিন ধরে ঠিক এটাই চাচ্ছিলাম আমরা। এ যেন এক মুক্তির আনন্দ। আমিন ইকবাল এক দিক থেকে উপকারই করেছে, তা নাহলে সিদ্ধান্তটা নিতে আর কদিন দেরি হত কে জানে। হাসনা আপাও এক বাক্যে রাজি। আমাদের ভয় ছিল ওনাদের হয়ত কিছুটা ক্ষতি হতে পারে, কারণ রুস্তম শেরের বই প্রচুর মুনাফা করেছে। সেটার লোভ ত্যাগ করা সহজ নয়। কিন্তু ওনারা দু'জন বরং উৎসাহই দিলেন। কার্যত "শনিবারে" লেখাটা বের হওয়াতে রুস্তম

শেরের লেখা বইয়ের বিক্রি বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। গতকালই রশিদ ভাই ফোন করে সেটা জানিয়েছেন।'

জাহিদ এতক্ষণ পর বলে উঠল, 'যদিও লোকটা খুন হয়েছে, ওর ওপর রাগটা কেন যেন এখনও যায়নি।'

মৃদু হাসল শাহেদ, 'এ খুনটার পিছনেও আপনার শক্ত মোটিভ আছে।'

'কিন্তু তাহলে তো ও আগেই মারা পড়ত, "শনিবারে"ও লেখাটা ছাপা হত না। সবকিছু ফাঁস হবার পর কেন ওকে মারতে যাব শুধু শুধু?'

'প্রতিশোধ। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি শুধু একটা কারণে, কিছু মনে করবেন না, একটা ছদ্মনামের জন্যে মানুষ খুন হয়ে গেল! এটা তো আর ক্ল্যাসিফায়েড ডকুমেন্ট বা মিলিটারি সিক্রেট নয়!'

'আমিও আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু কে করতে পারে এই কাজ!'

মোনা হঠাৎ সোজা হয়ে বসল। 'আচ্ছা, রুস্তম শেরের কোন ভক্তও তো করতে পারে। রুস্তম শের আর কখনও লিখবে না জেনে। হয়ত খেপে যায়, কোনভাবে জেনে যায় আমিন ইকবালই এজন্যে দায়ী। তাই বেচারাকে খুন করে সে...মানে গল্পটা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না, তাই না?'

'ঠিক তাই,' হাসল শাহেদ।

'কিন্তু ধরুন, লোকটা যদি উন্মাদ হয়? "শনিবারে" লেখাটা ছাপা হবার পর রুস্তম শেরের অসংখ্য ভক্ত রেগে গিয়ে কুৎসিত ভাষায় জাহিদকে চিঠি লিখেছে রুস্তম শেরকে মেরে ফেলার জন্যে। এক মহিলা তো অভিশাপ দিয়েছে গালকাটা জয়নাল যাতে তার ক্ষুর দিয়ে জাহিদকে ফালা ফালা করে কেটে ফেলে। এরকম লোক উন্মাদ ছাড়া আর কি?'

সোজা হয়ে বসল শাহেদ, 'এই গালকাটা জয়নালটা কে?'

হো হো করে হেসে উঠল জাহিদ, 'শান্ত হোন ইন্সপেক্টর, ও রক্তমাংসের কোন মানুষ নয়, রুস্তম শেরের বইয়ের নায়ক।'

'ওহ্! কল্পিত লেখকের সৃষ্ট কল্পিত চরিত্র!'

আবার হাসল জাহিদ, 'বা! ভালই বলেছেন।'

মোনা হাল ছাড়েনি, 'কিন্তু এমনটা তো হতে পারে! জন লেননকে তো এরকম কোন লোকই গুলি করে হত্যা করেছিল। এই সেদিন জোডি ফস্টারের এক ভক্ত ওর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে রেগানকে গুলি করেনি?'

'কিন্তু লোকটা যদি আমার ভক্তই হবে, তাহলে আমাকে জড়াবার চেষ্টা করছে কেন?'

মোনা হাল ছেড়ে দিল, 'আরে, ওতো তোমার ভক্ত নয়, রুস্তম শেরের ভক্ত। তুমি সাক্ষাৎকারে বলেছিলে রুস্তম শেরের মৃত্যুতে তুমি খুশি হয়েছ, এরপরও কি সে তোমাকে পূজো করবে?'

শাহেদ আড়মোড়া ভাঙল, 'তারপরেও ব্যাপারটা ঠিক খাপ খাচ্ছে না। ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলো...'

বাধা দিল জাহিদ, 'আচ্ছা, আপনি তো বলেছিলেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট নকল করা যায় না। যদি দু'জায়গাতেই একই ছাপ পাওয়া গিয়ে থাকে, তবে অবশ্যই তা নকল করা যায়। অন্তত এই লোক তা করেছে। সেক্ষেত্রে সে শুধু রুস্তম শেরের ভক্তই নয়...' বাকাটা শেষ না করেই চুপ করল ও।

'আপনি বলতে চাচ্ছেন...'

'ইন্সপেক্টর, আপনি কি কখনও চিন্তা করে দেখেছেন, এই লোকটা নিজেকেই রুস্তম শের বলে মনে করে কিনা?'

জাহিদ টের পেল মোনা আর শাহেদ দু'জনই শিউরে উঠল।

শাহেদ যখন উঠল, তখন গভীর রাত। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। আর আমার নাম্বার তো রইলই।'

'আমরা ভাবছিলাম দু'একদিনের মধ্যে একবার চাটগাঁ যাব। বিকেলে চাচী...মানে মিসেস শরীফ খানের সঙ্গে কথা হয়েছে, উনি খুবই ভেঙে পড়েছেন।'

'না, এ মুহূর্তে কোথাও যাবেন না।'

'কিন্তু ক'দিন পরেই তো ঈদ, আমাদের যশোর যাবার কথা।'

'টেলিফোনে মানা করে দিন। ব্যাপারটার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের বাসা ছেড়ে কোথাও যাওয়া উচিত হবে না। আমি অবশ্য কাল সকালেই পতেঙ্গা ফিরব। তবে নতুন কিছু ঘটলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ফোনে জানাবেন।' একটু থেমে চিন্তা করল শাহেদ। 'আর একটা ব্যাপার। আমিন ইকবালের ঘরের দেয়ালে খুনী ওরই রক্তে আঙুল ডুবিয়ে কয়েকটা শব্দ লিখেছে—"পাখিরা আবার উড়ছে"—আপনারা কি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন?'

'না,' মোনা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

'না,' একটু ইতস্তত করে জাহিদও উত্তর করল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল শাহেদ, 'শিওর?'

'অফ কোর্স,' ভাবলেশহীন জাহিদের কণ্ঠ।

জীপে উঠে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল শাহেদ।

ওপরে শোবার ঘরে এসে মোনা শাড়ি পাল্টে পাতলা সুতির নাইটি পরে নিল। জাহিদ বাথরুমে দাঁত ব্রাশ করছে। মোনা বাথরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল।

'জাহিদ, তুমি কিছু একটা গোপন করেছ।' মোনার কণ্ঠে অভিমান আর কষ্ট।

ট্যাপ খুলে বেসিনে কুলি করে তোয়ালে টেনে নিল জাহিদ। মুখ হাত মুছতে মুছতে জানতে চাইল, 'কখন টের পেয়েছ?'

'শাহেদ সাহেব দ্বিতীয়বার যখন ফিরে এলেন, তখন থেকেই তোমাকে কেমন যেন অস্থির মনে হচ্ছিল। যাবার সময় উনি যে প্রশ্নটা করলেন, সেটা শুনে তুমি চমকে গিয়েছিলে, তাই না?'

'কিন্তু শাহেদ সাহেব টের পাননি।' জাহিদ শোবার উদযোগ করতে লাগল। মোনাও ওকে অনুসরণ করে খাটের অন্যদিকে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

'শাহেদ সাহেব তো আর এক যুগ ধরে তোমার ঘর করছে না!' মোনার কণ্ঠে স্পষ্ট রাগ। 'তবে উনিও টের পেয়েছেন তোমার ভাবান্তর।' জাহিদ বিছানায় শুয়ে পড়েছে। 'তুমি যখন মিথ্যে কথা বল তখন খুব খারাপ লাগে।'

'আমি মিথ্যে বলিনি, মোনা। তোমাকে বলতাম। তবে ঠিক

কিভাবে বলব বুঝতে পারছিলাম না,' বলে ওর হাত ধরে টেনে পাশে শুইয়ে দিল জাহিদ, 'এত রাগছ কেন তুমি?'

জাহিদের বুকে মুখ লুকাল মোনা, 'কারণ আমার ভয় করছে। প্রচণ্ড ভয় করছে।'

মোনাকে বুকের মধ্যে শক্ত করে কিছুক্ষণ ধরে রাখল জাহিদ। কোত্থেকে শুরু করবে ভাবতে লাগল।

'কি হল? বল! দেয়ালে কি লেখা ছিল যেন?' মোনার তর সইছে না, সারাদিনের ধকলের পরে নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

'পাখিরা আবার উড়ছে,' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল জাহিদ। একটু থেমে বলতে শুরু করল, 'ছেলেবেলায় আমার টিউমার অপারেশনের ব্যাপারটা তো তুমি জান। অপারেশনের আগে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হত, সেটাও তো বলেছি, তাই না?' মোনার চুলে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে ও।

'উঁ।' আরামে চোখ বুজে আছে মোনা।

'তোমাকে হয়ত বলিনি যে মাথাব্যথা শুরু হবার আগে আমি ভৌতিক একটা শব্দ শুনতাম—অসংখ্য চড়ুই পাখির কিচিরমিচির আর পাখা ঝাপটানো শব্দ। ব্যাপারটা অবশ্য একটুও ভৌতিক নয়। মগজের টিউমারের ক্ষেত্রে এরকম হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এগুলোকে বলে "সেনসরি পারসেকিউটার"। সাধারণত এটা দেখা দেয় গন্ধ হয়ে। যেমন, পেন্সিল কাটার গন্ধ, পেঁয়াজের গন্ধ, ফল পচার গন্ধ—এগুলোই সাধারণত বেশি দেখা যায়। আমার সেনসরি পারসেকিউটার ঘ্রাণেন্দ্রীয় নয়, শ্রবণেন্দ্রীয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমি শুনতাম পাখিদের শব্দ। চড়ুই পাখি। মোনার হাত ধরে বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে এগুলো ও।

'কি হল?' মোনা একটু অবাক।

'চল, একটা জিনিস দেখাবো তোমাকে।'

স্টাডিটা ছোট। দোতলায় বাথরুম ছাড়া দুটো মাত্র ঘর। শোবার ঘরটা বড়, বাকি ছোটমত ঘরটাকে জাহিদ স্টাডিতে রূপান্তরিত করেছে। নিচে রান্না আর বসার ঘর ছাড়া আরেকটা ঘর আছে, মেহমান এলে সেখানেই থাকতে দেয়া হয়। পিচ্চি রাতে রান্নাঘরের সামনের করিডরে শুয়ে থাকে। রূপক-রুমকি শোবার ঘরের একপাশে রাখা কটে ঘুমায়।

লেখার টেবিলটা কিন্তু একটুও অগোছাল নয়। বই, কাগজ, নোটবুক, পেন্সিল হোল্ডার সব জায়গামত সাজানো, সামনে টাইপরাইটার। পুরানো কিন্তু দেখতে নতুনের মত। লেখা কাগজগুলো টাইপরাইটারের ডানদিকে রাখা। ওদিকে ইঙ্গিত করল জাহিদ, 'শাহেদ সাহেব যখন এলেন, আমি তখন লিখছিলাম।' ওপরের কাগজটা তুলে মোনার হাতে দিল, 'হঠাৎ পাখিদের শব্দ শুনতে পেলাম সেই ছেলেবেলার মত, আজ এই নিয়ে দ্বিতীয় বার। কাগজটায় কি লেখা আছে দেখেছ?'

শূন্য দৃষ্টিতে লেখাটার দিকে চেয়ে আছে মোনা বিবশ হয়ে। ধীরে ধীরে রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে মুখটা, 'সেই কথাগুলো না? ওহ্...জাহিদ! এটা কি?' মাথায় হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল ও। পড়ে যেতে পারে ভেবে চট করে ধরে ফেলল ওকে জাহিদ।

'খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ,' ফুঁপিয়ে উঠল মোনা, 'তোমার লাগছে না?'

'এখন আর ততটা নয়।' ধীরে ধীরে ওকে চেয়ারে বসিয়ে দিল জাহিদ। নিজেও মেঝেতে বসল দেয়ালে হেলান দিয়ে।

'তুমি ওটা লিখেছ শাহেদ সাহেব আসার আগে!' মোনার চোখে এখনও অবিশ্বাস।

ওপর-নিচ মাথা নাড়ল জাহিদ, 'এখন বুঝেছ কেন এতক্ষণ বলিনি?'

দু'হাতে মুখ ঢাকল মোনা. 'হ্যাঁ।'

'শাহেদ সাহেবকে বললে কি উনি বিশ্বাস করতেন? এমনিতেই উনি ভাবছেন আমি আমার যমজ ভাইয়ের সঙ্গে আঁতাত করে খুনের পর খুন করে চলেছি।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল দু'জনে। মোনাই নীরবতা ভাঙল, 'বইপত্রে পড়েছি টেলিপ্যাথি, ই. এস. পি...'

'তুমি এসব বিশ্বাস কর?'

'এতদিন চিন্তা করিনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে করি।' টেবিলের ওপর থেকে কাগজটা তুলে চোখের সামনে ধরল মোনা, 'ওটা তুমি রুস্তম শেরের পেকিনে লিখেছ।'

'তুমি এমনভাবে বলছ যেন রুস্তম শের অন্য কেউ!'

'জাহিদ, মনে করে দেখ আর কিছু ঘটেছিল কিনা।'

একটু চিন্তা করল জাহিদ। 'হ্যাঁ, বিড়বিড় করে কি যেন বলে উঠেছিলাম, মনে পড়ছে না ঠিক কি।'

পাথরের মূর্তির মত বসে রইল দু'জন। জানালার বাইরে অন্ধকার রাত। ধীরে ধীরে লাইট নেভানর জন্যে সুইচবোর্ডের দিকে এগুলো মোনা, জাহিদকে ডাকল, 'চল, ঘুমাবে না?'

'আজ রাতে আমরা কি সত্যিই ঘুমোতে পারব?'

শোবার ঘরে ফিরে বাচ্চাদের কটের দিকে গেল মোনা। দেবশিশুর মত দেখাচ্ছে নিষ্পাপ ঘুমন্ত বাচ্চা দুটোকে। শিশির বিন্দুর মত ঘামের কুচি রুপকের গলার ভাঁজে। ফ্যানটা এক দাগ বাড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল জাহিদের পাশে।

আশ্চর্য! দশ মিনিটের মধ্যেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল মোনা। তার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল জাহিদও।

আবার সেই স্বপ্ন।

একই রাস্তা ধরে গাড়ি চালাচ্ছে জাহিদ, রুস্তম শের বসে আছে পেছনে, অদৃশ্য। নিজের বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল জাহিদ, রুস্তম শের কাঁধের পেছনে থেকে বলল এটা ওর বাড়ি নয়, বাড়ির মালিক পরিবারের সবাইকে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেছে। সবকিছু ঘটছে ঠিক আগের বারের মতই। শুধু রান্নাঘরে মোনার মৃতদেহের পাশে পড়ে আছে আমিন ইকবালের ছিন্নভিন্ন দেহের অংশবিশেষ। পেছন থেকে একঘেয়ে কণ্ঠে বলে চলেছে রুস্তম শের, 'বোকামি করলে এই অবস্থাই হয়! এক এক করে সব শালার বাচ্চার তেরোটা বাজাব আমি। সাবধান! তোকে যাতে শিক্ষা না দিতে হয়! মনে রাখবি...পাখিরা আবার উড়ছে...আবার উড়ছে পাখিরা!' আকাশ অন্ধকার করে নেমে আসছে চড়ুই পাখির ঝাঁক। জাহিদ জানালা দিয়ে পাখি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, গাছের ডাল, পথ-ঘাট, ঘাস বিছানো মাটি সবকিছু ঢেকে গেছে কোটি কোটি পাখিতে। 'আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না!' চিৎকার করে উঠল জাহিদ। পেছন থেকে ফিসফিসে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, 'ওরা আবার উড়ছে, দোস্ত! কোন বোকামি নয়!'

কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল জাহিদ। স্বপ্ন এত বাস্তব হয়! ঘামে ভিজে গেছে সমস্ত শরীর। ধীরে ধীরে আবার শুয়ে পড়ল ও। অন্ধকারে চোখ মেলে ভাবতে লাগল হঠাৎ এমন অদ্ভুত একটা কথা কেন মনে এল? রুস্তম শের আর গালকাটা জয়নালকে ও একই লোক হিসেবে চিন্তা করে এসেছে এতদিন, অথচ স্বপ্নটা দেখার আগে তা বুঝতে পারেনি। দু'জনেরই পাথরে কোঁদা উঁচু শরীর, বিশাল কাঁধ, টকটকে ফর্সা, লালচে চুল...আশ্চর্য! অসম্ভব! কাল্পনিক চরিত্র কোনদিন রক্তমাংসে পরিণত হয়? রূপকথাতেও তা অসম্ভব। মোনা শুনলেও হেসে উঠবে। বাইরের মানুষ হয়ত লুকিয়ে হাসবে, তবে নিঃসন্দেহে পাগল

ঠাউরাবে। বিহ্বল হয়ে শুয়ে রইল জাহিদ সকালের সোনালী সূর্যের প্রতীক্ষায়।

পরদিন সকালে জাহিদ ডিপার্টমেন্টে গেলে মোনা ঢাকায় ফোন করে নিওরোলজিস্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেলল। এমার্জেন্সি বলাতে একটু গাঁইগুঁই করে ভদ্রলোক দেখতে রাজি হলেন, যদি ওরা তিনটের মধ্যে পৌঁছতে পারে। জাহিদ ক্লাস নিয়ে ফিরতে তাড়াহুড়ো করে ভাত খেয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল হাসপাতালের উদ্দেশে।

হিস্ট্রি শুনে ডাক্তার গম্ভীর হয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্রেনিয়াল এক্স-রে-র জন্যে দোতলায় পাঠালেন। আরও দুটো টেস্ট করা হল। দিন তিনেক পরে রেজাল্ট জানা যাবে।

বিকেলে জাহিদ স্টাডিতে বসে খাতা দেখছে। ছাত্র-ছাত্রীদের কথা দিয়েছে ঈদের আগেই মার্কস্ দিয়ে দেবে।

হঠাৎ করেই শুরু হল।

প্রথমে দুটো একটা পাখির ডাক, ধীরে ধীরে পাখির সংখ্যা বাড়তে থাকল। একসময় কোটি কোটি পাখির কিচিরমিচির ধ্বনিতে জাহিদের কানে তালা লেগে গেল। দু'হাতে দু'কান চেপে ধরে চেয়ার থেকে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল জাহিদ, মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাচ্ছে ও। ঘরবাড়ির ছাদ, গাছের ডাল আর ইলেকট্রিকের তারে বসে আছে অগুনতি পাখি।

চড়ুই পাখি।

ওপরে সাদাটে আকাশ। মনে হচ্ছে ওরা কারও আদেশের অপেক্ষা করছে। আদেশ পেলেই একসঙ্গে ডানা মেলবে। সাদাটে আকাশ ঢেকে যাবে পাখিতে।

জাহিদ জানে না কখন ও অন্ধের মত টেবিল হাতড়ে একটুকরো কাগজ আর এইচ-বি পেন্সিলটা মুঠো করে ধরেছে। আঙুলের চাপে

পেন্সিলটা কাগজের ওপর আঁকিবুকি কাটছে।

একসঙ্গে পাখিগুলো ডানা মেলল। নিমেষে কালো হয়ে গেল সাদাটে আকাশ।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল জাহিদ। ঘামে ভিজে গেছে শরীর, জোরে নিঃশ্বাস বইছে, কিন্তু মাথাব্যথা হয়নি। বোকার মত চেয়ে আছে হাতে ধরা কাগজটার দিকে। ঢাকা থেকে ফেরার পথে গাউছিয়ার লীফায় থেমে কয়েকটা শাড়ি ড্রাই ক্লিন করতে দিয়েছে মোনা, তারই রসিদ। একটু আগেই পকেট থেকে বের করে টেবিলে রেখেছে জাহিদ। রসিদের উল্টোদিকটা দেখছে জাহিদ অবিশ্বাসের চোখে। এসব কি লিখেছে ও? কখন লিখেছে? আঁকাবাঁকা অসমান অক্ষরে লেখা, কিন্তু কয়েকটা শব্দ ঠিকই পড়া যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, জাহিদের হাতের লেখা। শব্দগুলোর কোন মাথা মুণ্ডু বুঝতে পারল না ও। আপা…হাস…উড়ছে…পাখিরা…আপা…বোকা…চড়ুই…ক্ষুর …মৃত্যু…হাস…এখনই…কাটা…হাস…চিরদিনের জন্যে…। আশ্চর্য! এ সবের অর্থ কি? দু'হাতে কপাল চেপে ধরল। ভয় হচ্ছে যে কোন সময় মাথাব্যথা শুরু হবে। না, মোনাকে কিছুতেই বলা যাবে না। চিন্তায় এমনিতেই অর্ধেক হয়ে গেছে ও একদিনেই। ভয়ঙ্কর স্বপ্নটার কথা যে কারণে গোপন করে গেছে, সেই একই কারণে এই ঘটনাটাও ওর কাছে গোপন করে যেতে হবে। কি হবে বেচারাকে ভয় পাইয়ে। তাছাড়া ক'টা অর্থহীন শব্দ বই তো নয়। প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে রসিদটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল জাহিদ। টেবিলের নিচে রাখা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে টুকরোগুলো ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল।

লীফায় চেনাশোনা আছে, মোনার অসুবিধা হবে না।

আট

শেষ বিকেলের সোনা ঝরা রোদ ঝকঝক করছে চারদিকে। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রকৃতির এই সৌন্দর্য উপভোগ করার মত সময় হাসনা তালুকদারের হাতে নেই। লম্বা একটা দিন তিনি কাটিয়েছেন অফিসে চরম ব্যস্ততায়। রিকশায় বেইলি রোডে নিজের ফ্ল্যাটে ফেরার এই সময়টুকুতে বিশ্রাম ছাড়া আর কিছুই মনে আসে না।

তবে ব্যস্ত জীবনের জন্যে কোন অনুশোচনা নেই তাঁর। ব্যস্ততা না থাকলে যে জীবনটা কাটানই কঠিন হয়ে পড়ত। বিশেষ করে বছর দু'য়েক আগে ডিভোর্স হয়ে যাবার পর থেকেই বড় একা হয়ে পড়েছেন হাসনা তালুকদার। একমাত্র মেয়ে বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে রিয়াদ চলে গেছে তার কিছুদিন আগেই। ডিভোর্সের পরে হাতির পুলে একটা বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, বছরখানেক আগে বেইলি রোডের এই ফ্ল্যাটটা কিনে নিয়ে উঠে আসেন। এলাকাটা ভদ্র, ফ্ল্যাটটাও মোটামুটি বিলাসবহুল। দামটা বেশি হলেও তাই কিনে নিতে দ্বিধা করেননি। তবে পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে আজও ঘনিষ্ঠতা হয়নি। একে ডিভোর্সি, তায় আবার নিজের ব্যবসা আছে। মহিলা হিসেবে এই দুটো ব্যাপারই সমাজে তাঁকে চিহ্নিত করে রেখেছে। তবে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে আজ আর ওসব তিনি গ্রাহ্য করেন না। ডিভোর্স হলেও স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে তিক্ততা নেই। ব্যবসায়িক কাজে বলতে গেলে সারাদিনই

একসঙ্গে কাটাতে হয়, তিক্ততার অবকাশ কই! বরঞ্চ ইদানীং বন্ধুত্বের সম্পর্কই গড়ে উঠেছে, যা বিশ বছরের বিবাহিত জীবনে হয়নি। আর্থিক দিক থেকেও কোন অসুবিধা নেই। 'হীরক পাবলিশার্স' খুবই ভাল ব্যবসা করছে বছর দশেক ধরে। এই সাফল্যের কারণেই স্বামী স্ত্রীর ডিভোর্স হয়ে গেলেও ব্যবসাটা টিকে গেছে, ভাগ হয়নি।

খুব ভোরে ঠিকে ঝি এসে ঘরদোর ঝেড়ে-মুছে, রান্নার আয়োজন করে দিয়ে যায়। হাসনা তালুকদার রান্না পোসল সেরে তাড়াহুড়ো করে নাস্তা করে নেন। দশটা সাড়ে দশটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হয় অফিসের উদ্দেশ্যে। বাসায় ফিরতে কোন কোনদিন সন্ধে লেগে যায়। ছুটির দিনেও ঘরে বসে কাজ করেন তিনি। বন্ধু-বান্ধব আসে মাঝে মাঝে, গল্পগুজব হয়।

রিকশা থামলে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে এলেন হাসনা তালুকদার। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন দোতলায়। প্রতি ফ্লোরে চারটে করে ফ্ল্যাট। ওনার ফ্ল্যাটটা পেছন দিকে। তাতে সুবিধাই হয়েছে। রাস্তার হট্টগোল কানে যায় না বড় একটা।

হাত ব্যাগ থেকে চাবি বের করে তালায় ঢুকাতে গিয়েই চমকে উঠলেন তিনি। বড় ডায়মণ্ড তালাটা কড়া থেকে ঝুলছে, খোলা। চুরি হয়েছে! হায় আল্লাহ! রাস্তায় চলাফেরা করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে ঝাপ্‌টা পার্টির অত্যাচারে, বাড়িতে ফিরেও শান্তি নেই। দেশটার হল কি!

টিভি-ভিসিআর নিশ্চয়ই গেছে! ভারী গয়নাগাটি বহুদিন পরেন না, সবই রাখা আছে ব্যাঙ্কের ভল্টে। সবসময় পরার টুকটাক কানের দুল-চেন-আঙটি ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারেই আছে। জরুরি দরকারের জন্যে হাজার পাঁচেক ক্যাশ টাকা লুকিয়ে রেখেছিলেন লিভিং-রুমের বুক শেলফে। সঞ্চয়িতার ভাঁজে। সবই কি গেল!

হ্যাণ্ডেলে চাপ দিয়ে দরজাটা খুলতে যেতেই কেমন ভয় ভয় করে উঠল। ভেতরে কি অবস্থা কে জানে! শেষ মুহূর্তে হঠাৎ করে মনে হল

চোর যদি ভেতরেই থেকে থাকে! কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না।

চকিতে ঘরের ভেতর থেকে একটা হাত সাপের মত ছোবল দিল। শক্তসমর্থ হাতটা সজোরে হাসনা তালুকদারের হ্যাণ্ডেলে চেপে বসা ডান হাতের কব্জি চেপে ধরেছে। কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই হ্যাঁচকা টান দিল সামনের দিকে। ভোঁতা আওয়াজ তুলে হাসনা তালুকদারের বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যাওয়া মুখটা প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়ল সেগুন কাঠের দরজায়। জ্ঞান হারাবার আগে এক পলকের জন্যে চোখে পড়ল দরজার আড়ালে দাঁড়ানো বিশাল আকৃতির ফর্সা সুদর্শন একটা মুখ, লালচে লম্বা ঢেউখেলানো চুল।

লোকটা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে, বন্ধ দরজার ঠিক ভেতরে। বাঁ হাতে দরজাটা শক্ত করে ধরেছিল, যাতে আঘাতটা একটুও না ফস্কায়। ডান হাতে এখনও ধরে আছে হাসনা তালুকদারের ডান কব্জি, মহিলা জ্ঞান হারিয়েছেন। ঠিক এসময় উল্টোদিকে ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজাটা খুলে যেতে শুরু করল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে। কেউ ভেতর থেকে চিৎকার করল, 'কে? কে ওখানে?' শব্দ শুনেছে কেউ!

হ্যাঁচকা টান মেরে হাসনা তালুকদারের হালকা পাতলা দেহটা ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতে যেতেই বুড়ো মত এক লোকের মুখোমুখি হল লোকটা, সামনের ফ্ল্যাটের আংশিক খোলা দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়েছে, চোখে সন্দেহ।

সুদর্শন চেহারায় চমৎকার হাসিটা মানিয়ে গেল, 'কিচ্ছু না, দরজাটা আটকে গিয়েছিল, ধাক্কা মেরে খুলতে হয়েছে।' খুব ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করল সে, যাতে লোকটার সন্দেহ না বাড়ে। হাসনা তালুকদারের ফ্ল্যাটে সবসময়ই লোকজন আসে, তাতে সন্দেহের কিছু নেই।

করিডরে নিঃসাড়ে শুয়ে আছেন হাসনা তালুকদার। মুখের ডান

পাশটা ছিলে গেছে. মাড়ি থেকে ভেঙে গেছে দুটো দাঁত, কেটে দুফাঁক হয়ে গেছে নিচের ঠোঁট। নাক আর কশ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে। মুখের ছিলে যাওয়া অংশগুলোতে রক্ত ভেসে উঠতে শুরু করেছে।

গুঙিয়ে উঠলেন তিনি ব্যথায়। চেতনা ফিরে আসতে শুরু করেছে। লোকটা পকেট থেকে একটা ক্ষুর বের করল। ঝাঁকি দিতেই লম্বা ব্লেডটা বের হয়ে এল। চোখ খুলতেই হাসনা তালুকদার ভয়ে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেলেন। নিমেষে মনে পড়ে গেল কি ঘটেছে। নিজের অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্যথায় কুঁকড়ে উঠল শরীরের প্রতিটা নার্ভ।

'একটা শব্দ করবি তো কেটে দুভাগ করে দেব, সোহাগের আপামণি,' মুখের ওপর ক্ষুরটা নাচিয়ে ভয় দেখাল লোকটা, কণ্ঠে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ছে।

চুলের মুঠি ধরে হেঁচড়ে নিয়ে চলল লিভিং রুমের দিকে। যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি। চুল ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল লোকটা নিষ্ঠুরভাবে, 'চোপ্! খুন করে ফেলব একটা শব্দ বের হলে।'

সুন্দর রুচিসম্মত ভাবে সাজানো লিভিং রুম। বেতের সোফা, লাল কভারে মোড়া গদি, জয়পুরী কাজ করা কুশন, ছোট দামি কার্পেট সেন্টার টেবিলের নিচে, বুক শেলফে সারি সারি বই, টবে পাতাবাহার, দেয়ালে বিখ্যাত শিল্পী আসিফ খোন্দকারের পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি 'চিরদিনের জন্যে'-র রিপ্রিন্ট।

লিভিং রুমের দোরগোড়ায় পৌঁছে চুলের মুঠি ছেড়ে দিল লোকটা। মাথাটা ঠুকে গেল মোজাইকের মেঝেতে, গুঙিয়ে উঠলেন হাসনা তালুকদার নিজের অজান্তেই। চোখ গরম করে চাইল লোকটা, 'আবার শব্দ! চুপচাপ সোফায় উঠে বসুন, আপামণি।' 'আপনি' এবং 'আপামণি' দুটো সম্বোধনই যে ব্যঙ্গাত্মক তা বুঝতে সময় লাগে না।

'ওই সোফাটায়, তর্জনী তুলে ফোনের পাশের জায়গাটা দেখাল সে।

'প্লীজ,' একইভাবে মেঝেয় শুয়ে থেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন হাসনা তালুকদার, নড়ার শক্তি নেই। চিন্তাভাবনার শক্তিও লোপ পেয়েছে। 'প্লীজ' শব্দটা শোনাল অনেকটা 'পি-রি-স'-এর মত। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মুখটা ফুলে উঠতে শুরু করেছে। 'বইয়ের ফাঁকে টাকা··· গয়না আছে···' অর্ধেক কথাই বোঝা গেল না।

ডান হাতে ঝট করে ক্ষুরটা নিয়ে এল লোকটা হাসনা তালুকদারের নাকের সামনে, 'ওই সোফাটায়,' বাঁ হাতের তর্জনী সোফার দিকে তুলে ধরা।

টলতে টলতে কোনমতে সোফার কাছে পৌঁছে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তিনি। চোখ দুটো আতঙ্কে বড় বড়, ডান হাতে মুখের রক্ত মুছে নেবার চেষ্টা করলেন। 'কি চান আপনি?' অস্পষ্ট হলেও বোঝা গেল শব্দ কটা, মনে হচ্ছে একগাদা খাবার মুখে নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছে কেউ। প্রতিবার কথা বলার সময় গাদা গাদা রক্ত বের হচ্ছে মুখ থেকে, কালো কারুকাজ করা হালকা বেগুনি শাড়িটার বুকের কাছটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে উঠেছে।

'আমি চাই জাহিদকে আপনি একটা ফোন করবেন, আপামণি,' ভিলেনের মত হাসছে লোকটা, 'আর কিছু না।' টেলিফোনের রিসিভারটা হাসনা তালুকদারের হাতে তুলে দিল, ভারী রিসিভারটার দিকে চেয়ে হেসে উঠল ঘর কাঁপিয়ে, 'ওটা দিয়ে আমার মাথায় বাড়ি মারার ইচ্ছে হচ্ছে, না?' মুহূর্তে শক্ত হয়ে গেল মুখের প্রতিটা মাংসপেশী, সরু হয়ে গেল কটা চোখ দুটো, হিসহিস করে উঠল ভয় দেখানো গলায়, 'আর একবার এরকম চিন্তা মাথায় এসেছে কি গলাটা দু'ফাঁক করে দেব!'

ঠাণ্ডা রূপালী ক্ষুরটা গলা স্পর্শ করতে থর থর করে কেঁপে উঠলেন হাসনা তালুকদার, 'জাহিদ!' চোখে ভয়ের সঙ্গে মিশে আছে বিস্ময়।

'হ্যাঁ, জাহিদ। বিখ্যাত লেখক ডক্টর জাহিদ হাসান, চিনতে পারছেন না মনে হয়?' খিকখিক করে হেসে উঠল লোকটা।

'আমার ডায়ারি...' কেটে যাওয়া ঠোঁটটা ফুলে ওঠাতে মুখটা বন্ধ করতে পারছেন না হাসনা তালুকদার, থেঁতলে যাওয়া মুখটায় নীলচে দাগ ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে।

বুঝতে না পেরে কান খাড়া করল সে, 'কি বললেন?'

ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করলেন এবার, 'আমার ডায়ারিটায় লেখা আছে নাম্বারটা, মনে করতে পারছি না!'

দ্রুতগতিতে ক্ষুরটা নামিয়ে আনল লোকটা হাসনা তালুকদারের গলার এক পাশে, সাঁই সাঁই বাতাস কাটার শব্দ কানে গেল দু'জনারই, সিটিয়ে উঠে সোফার গদির ভেতর ঢুকে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন তিনি।

'আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করবেন না। জান খারাপ করে দেব! চুপচাপ ভালমানুষের মত যা করতে বলছি করুন!' ধমকে উঠল যমদূতের মত দেখতে লোকটা।

'বিশ্বাস করুন...মনে নেই আমার,' কেঁদে উঠলেন হাসনা তালুকদার।

ক্ষুরটা বসিয়ে দিতে গিয়েও থামল শেষ পর্যন্ত। আতঙ্কের ঠ্যালায় ফোন নাম্বার ভুলে যাওয়া এমন কিছু অবিশ্বাস্য ব্যাপার নয়। হয়ত মহিলা এ মুহূর্তে নিজের বাসার ফোন নাম্বারও মনে করতে পারবে না।

'ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি ভয়ে সব গুলে খেয়েছেন। আপনার ভাগ্য ভাল। নাম্বারটা আমার মুখস্থ আছে। আমিই ডায়াল করে দিচ্ছি। কেন, জানেন?' সজোরে দু'পাশে মাথা নাড়লেন তিনি। থেঁতলে যাওয়া ফোলা নীলচে মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছে।

'কারণ আপনাকে আমি বিশ্বাস করছি, আপামণি। যতক্ষণ আমি ডায়াল করব, মনোযোগ দিয়ে ক্ষুরটা দেখতে থাকুন।' ডায়াল করতে

করতে যোগ করল, 'যদি জাহিদের বউ ফোন ধরে, তবে জাহিদকে চাইবেন। কথা বলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে জানি, চেষ্টা করবেন যাতে জাহিদ বুঝতে পারে।'

'কি...কি বলব ওকে?'

সুদর্শন চেহারায় হাসি ফুটে উঠল। বয়স একটু বেশি হলে কি হবে, মহিলা দেখতে বেশ সুন্দরী। লম্বা ঘন চুল, চোখ দুটো বড় বড়, পাতলা ঠোঁট—ঠোঁটটা অবশ্য এখন আর পাতলা নেই। হালকা বেগুনি শাড়িটাতে মানিয়েছে ভাল। ওপাশে ফোনের রিঙ শোনা যাচ্ছে।

'কি বলতে হবে তা তো জানেনই, আপামণি!' ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ ঝরে পড়ছে প্রতিটা কথায়।

ক্লিক শব্দ তুলে কেউ রিসিভার তুলল, 'হ্যালো।' দু'জনেই পরিষ্কার শুনতে পেল জাহিদের কণ্ঠস্বর।

সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক দ্রুততায় ক্ষুরটা আলতভাবে নামিয়ে আনল সে হাসনা তালুকদারের ডান গালে, ডান হাতে রিসিভারটা চেপে ধরেছে মহিলার বাঁ কানে। নারীকণ্ঠের বুকফাটা আর্তনাদ টেলিফোনের তার বেয়ে পৌঁছে গেল সাভারে। হাসনা তালুকদারের ডান গালে লম্বা একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। দু'ফাঁক হয়ে আছে ত্বক, গোলাপী মাংস বেরিয়ে পড়েছে। গভীর ক্ষতটা ধীরে ধীরে রক্তে লাল হয়ে গেল, গড়িয়ে পড়ছে চিবুক বেয়ে কোলে। মৃগী রোগীর মত কাঁপছে গোটা শরীরটা।

'হ্যালো!' চিৎকার করে উঠল জাহিদ, 'হ্যালো, কে? কে বলছেন?'

নিজের শরীর দিয়ে চেপে রেখেছে মহিলার শরীরটা যাতে সোফা থেকে গড়িয়ে না পড়ে যায়। কানটা রিসিভারের কাছে থাকায় জাহিদের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর সে ঠিকই শুনতে পেল।

আমি রে, শুয়োরের বাচ্চা, আমি! তুই ঠিকই জানিস আমি, জানিস না? আত্মপ্রসাদের সঙ্গে চিন্তা করল লোকটা। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে

হাসনা তালুকদারের উদ্দেশ্যে বলল, 'জিজ্ঞেস করছে, উত্তর দিচ্ছেন না কেন? কথা বলুন,' জোরে ঝাঁকুনি দিল চুল ধরে।

'কে? কি হচ্ছে এসব! হ্যালো!' উত্তেজনায় কাঁপছে জাহিদের কণ্ঠ।

হাসনা তালুকদার আবার চিৎকার করে উঠলেন। দরদর করে রক্ত পড়ছে গালের ক্ষত থেকে, শাড়ি ব্লাউজ ভিজিয়ে জমা হচ্ছে সোফার গদিতে।

'কথা বল্, কুত্তী! নইলে এক্ষুনি মাথাটা নামিয়ে দেব,' হিসহিসিয়ে উঠল লোকটা। কানের কাছে।

'জাহিদ...একটা লোক...মেরে ফেলল...জাহিদ...' বিকারগ্রস্তের মত বিলাপ করতে লাগলেন হাসনা তালুকদার।

'তোর নাম বল্, শালী!' পাশ থেকে গর্জে উঠল লোকটা।

'কে? কে বলছেন?' হাসনা তালুকদারের কথা বুঝতে না পারলেও পুরুষকণ্ঠের ধমকটা ঠিকই কানে গেল জাহিদের। তাতে আতঙ্কটা আরও বেড়ে গেল।

'হাসনা!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'উহ্! জাহিদ, বাঁচাও আমাকে, ভাই! কেটে ফেলছে লোকটা আমাকে...'

রুস্তম শের হেসে উঠল। ক্ষুর ঘুরিয়ে এক কোপে কেটে ফেলল টেলিফোনের তার। রিসিভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সোফার পেছনে। ঠিক যেমনটি চেয়েছিল, সবকিছুই ঘটছে ঠিক তেমনভাবেই।

হাসনা তালুকদার এখনও থরথর করে কাঁপছেন। রুস্তম শের আবার তাঁর চুলগুলো মুঠো করে ধরল। তারপর নিচের দিকে টানতে লাগল। হাসনা তালুকদার ছাদের দিকে চেয়ে আছেন, চেয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছেন বলাই ভাল, তবে কিছু দেখছেন বলে মনে হয় না। পশুর মত দুর্বোধ্য ধ্বনি বের হচ্ছে গলা দিয়ে। এক পৌঁচে এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত গলাটা ফাঁক করে দিল রুস্তম শের।

গলগল করে বেরিয়ে আসা রক্ত এক সময় গতি হারাল, কাটা।

শ্বাসনালী থেকে যে ঘড়ঘড় শব্দটা বেরোচ্ছিল, সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল রুস্তম শের। তারপর হাসনা তালুকদারের প্রাণহীন খোলা চোখের পাতায় হাত বুলিয়ে বন্ধ করে দিল।

রক্তে ভেজা ক্ষুরটা সোফার গদির শুকনো অংশে মুছে ভাঁজ করে পরম যত্নে পকেটে ভরে রাখল রুস্তম শের। হাসনা তালুকদার নাটকের ছোট্ট একটা চরিত্র মাত্র।

রশীদ তালুকদার বেঁচে আছে এখনও।

'শনিবারে' আর্টিকেলটা লিখেছেন—কি যেন নামটা—ওহ্, খান জয়নুল, ও ব্যাটাকেও একটু শিক্ষা দিতে হবে।

আর ফটোগ্রাফার ছেমরিটা, ঢং করে কবরের ছবি তুলেছে যে, কপালে খারাবি আছে তারও।

সব ঝামেলা শেষ হলে জাহিদ হাসানের সঙ্গে বোঝাপড়ায় বসতে হবে। তার আগেই জাহিদ হাসান টের পেয়ে যাবে আসল ব্যাপারটা কি, নতুন করে বোঝাবার দরকার পড়বে না। একান্তই যদি না বুঝতে চায়, সে ওষুধও রুস্তম শেরের জানা আছে।

শত হলেও জাহিদ হাসান দুটো নিষ্পাপ শিশুর পিতা, সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী—বুঝতে ওকে হবেই।

সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। হাসনা তালুকদারের তাজা রক্তে আঙুল ডুবিয়ে দ্রুত লিখতে শুরু করল দেয়ালে। কাজ শেষ হলে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এল ফ্ল্যাটের বাইরে।

উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক উঁকি দিলেন। আঁৎকে উঠলেন করিডরে দাঁড়ানো লম্বা সুদর্শন লোকটার উস্কখুস্ক লালচে চুল আর রক্তমাখা পোশাক দেখে। চোখের পলকে আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। খুট করে তালা বন্ধ হবার শব্দ পাওয়া গেল।

হেসে উঠল রুস্তম শের, দারুণ চালু লোক তো! আস্তে করে পেছনের দরজা টান দিয়ে বন্ধ করে নিচে নেমে এল রুস্তম শের।

হাতে একদম সময় নেই, রাতের মধ্যেই শেষ করতে হবে একটা জরুরি কাজ।

নয়

কিছুক্ষণের জন্যে—কতক্ষণ তা বলতে পারবে না—আতঙ্কে পাথর হয়ে রইল জাহিদ। চোদ্দ বছর বয়সে বন্ধুর সঙ্গে সমুদ্রে গোসল করতে নেমে ডুবে যেতে বসেছিল ও। পরে মনে হয়েছে সেদিনও সে এতটা ভয় পায়নি। মৃত্যুভয়ও এই অভিজ্ঞতার কাছে হেরে গেল।

চেয়ারে বসে—ঠিক বসে নয়, সামনের দিকে ঝুঁকে উপুড় হয়ে আছে জাহিদ, রিসিভারটা দু'হাতে চেপে ধরে রেখেছে। মোনা দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছে কার ফোন, কি হয়েছে—সবই শুনতে পাচ্ছে ও, কিন্তু একচুল নড়তে পারছে না, কথা বলারও শক্তি নেই।

হঠাৎ করেই আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করে উঠল ফুসফুসটা। বুক ভরে অক্সিজেন টেনে নিল জাহিদ। হৃৎপিণ্ডটা বুকের খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসবে বলে মনে হচ্ছে।

মোনা দৌড়ে এসে ওর হাত থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে 'হ্যালো' 'হ্যালো' করছে। ওদিক থেকে কোন সাড়া পাচ্ছে না। জাহিদ জানে লাইনটা কেটে দেয়া হয়েছে। ঠকাশ করে রিসিভারটা ক্রেডলে

নামিয়ে রাখল মোনা।

উঃ! কি ভয়ঙ্কর আর্তনাদ!

'হাসনা আপা,' মোনার প্রশ্নবোধক চোখে চেয়ে কোনমতে বলতে পারল জাহিদ, 'কি বলছিলেন ঠিকমত বুঝতে পারিনি, চিৎকার করছিলেন।'

'হাসনা আপা! কি বলছ তুমি? উনি কেন চিৎকার করবেন?'

'ও ছিল সেখানে। আমি জানি ও ছাড়া আর কেউ নয়। প্রথম থেকেই জানি। আজ বিকেলে...এই একটু আগে...আবার পাখিদের শব্দ শুনেছি আমি, আগের বারের মত।'

'কি বলছ তুমি?' হাঁটু গেড়ে জাহিদের সামনে মেঝেতে বসে পড়ল মোনা।

'কিছুক্ষণের জন্যে চেতনা হারিয়েছিলাম, তখন আবোল-তাবোল কয়েকটা শব্দ লিখেছিলাম একটা কাগজে। ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি টুকরোগুলো ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে। মোনা, ওই শব্দগুলোর মধ্যে হাসনা আপার নামও ছিল...আর...আর...'

'আর...আর কি?' জাহিদের দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে মোনা।

'হাসনা আপার বসার ঘরে একটা পেইন্টিং আছে, তোমার মনে পড়ছে? আসিফ খোন্দকারের "চিরদিনের জন্যে"। শেষবার যখন আমরা গিয়েছিলাম, তখনই লক্ষ করেছিলাম ছবিটা। কাগজে "চিরদিনের জন্যে" লেখাটাও ছিল। আমি ওটা লিখেছিলাম, কারণ তখন আমি...মানে আমার কিছু অংশ ওখানে ছিল...ওর চোখে আমিই দেখছিলাম ছবিটা...' জাহিদের বিস্ফারিত চোখ দুটো অস্থির, কালো মণির চারধারে সাদা অংশ বেরিয়ে পড়েছে। 'এটা টিউমার না, মোনা। অন্তত শরীরের ভেতরের কোন টিউমার না।'

'কি বলছ তুমি আমি যে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না,' মোনা রীতিমত চিৎকার করে উঠল।

'রশিদ ভাইকে ফোন করতে হবে,' কোনমতে এ শব্দ কটা নিজেই বুঝতে পারছে না জাহিদ, তবে হাসনা ওর হাত [illegible] সবকিছু ঘুরে গেছে। 'রশিদ ভাইকে খবরটা জানাতে হবে, বিপদ [illegible]!'

'[illegible] কেন [illegible] যে শেষ না!'

হাসনা আপা কি বেঁচে আছেন? কেন, উনি কেন কথা বললেন না? 'বাঁচাও বাঁচাও, ভাই! কেউ একজন [illegible]...' শব্দ কানে বাজছে জাহিদের এখনও। আর কি কি শুনেছিল ও টেলিফোনে? 'কাটো'...হ্যাঁ, 'কাটো'-ই বোধ হয়। আর 'ছুরি' 'খুন': হায় আল্লাহ!

কিন্তু রশিদ ভাইকে ফোন করলে উনি তো সঙ্গে সঙ্গে ছুটবেন হাসনা আপার ফ্ল্যাটে। খুনী যদি ওখানেই ওঁৎ পেতে বসে থাকে! জাহিদ রশিদ ভাইকে ফোন করবে প্রথমে, এটাই হতে চলেছে সে। না, কিছুতেই এ ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।

'জাহিদ, প্লীজ...কি হয়েছে বল!' রুদ্ধ স্বরে বেরিয়ে এলো মোনার মুখ থেকে।

'এ সেই লোকটা যে শরীফ চাচা আর আমিন ইকবালকে খুন করেছে। হাসনা আপাকে...ভয় দেখাচ্ছিল। হাসনা আপা চিৎকার করছিলেন। লাইনটা কেটে দেয়া হয়েছে তখনই।'

'হায় খোদা! কি করি...কি করব...' থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে মোনা, মনে হচ্ছে এখুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে।

'শান্ত হও, মোনা,' ওর ঠাণ্ডা শরীরটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল জাহিদ, 'এখন ধৈর্য হারাবার সময় না। হাসনা আপার ফোন নাম্বারটা তোমার মুখস্থ আছে?'

উপর নিচে মাথা ঝাঁকাল মোনা।

'ফোন কর তো ওখানে, রিসিভ করেন কিনা দেখি!' রিসিভারটা

তুলে হাতে দিল জাহিদ।

দু'হাতে রিসিভারটা বুকে চেপে ধরে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে মোনা, চোখ বন্ধ। তারপর কাঁপা হাতে ডায়াল ঘোরাবার চেষ্টা করল।

রশিদ ভাইকে ফোন করা এ মুহূর্তে বোকামি হবে। পুলিসে জানালে কেমন হয়? একশোটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, তাছাড়া যদি গুরুত্ব না দেয়? পুলিসী তৎপরতা সম্বন্ধে খুব অল্প ধারণাই আছে ওর।

ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান।

হ্যাঁ, ওনাকেই আগে ফোন করা উচিত। উনি যদি ঢাকার পুলিসকে ফোন করেন, তাহলেই ওরা ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নেবে। সবকিছু খুলে বলা ছাড়া এ মুহূর্তে আর কোন পথ খোলা নেই। বিশ্বাস করুক বা না করুক সেটা আলাদা কথা। কিন্তু বলতেই হবে।

কিন্তু আগে হাসনা আপা।

'জাহিদ, বিজি টোন্ পাচ্ছি।' লাইনটা কেটে আবার ডায়াল ঘোরাল মোনা। এবারও এক ঘেয়ে বিপ্ বিপ্ আওয়াজ ভেসে এল।

জাহিদ ওর হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে ক্রেডলে রেখে দিল। হাসনা আপা কি কারও সঙ্গে কথা বলছেন? অথবা রিসিভারটা তুলে রেখেছেন? আর---আর না হলে রুস্তম শের টেলিফোনের তার কেটে দিয়েছে। হাসনা আপাকে যেভাবে কেটেছে, ঠিক সেই ভাবে।

ক্ষুর। শিউরে উঠল জাহিদ। কাগজে ও 'ক্ষুর' কথাটাও লিখেছিল।

অনেক কষ্টে প্রায় দশ মিনিট পর পতেঙ্গা থানার লাইন পাওয়া গেল। এর মধ্যে তিনবার হাসনা আপার ফ্ল্যাটে ফোন করার চেষ্টা করেছে, প্রতিবারেই লাইন বিজি পেয়েছে। ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান আধা ঘন্টা আগেই ডিউটি শেষ করে বাসায় চলে গেছেন। কনস্টেবল্ হাশেম মৃধা, যিনি ফোন ধরেছেন, শাহেদ রহমানের বাসার নাম্বার দিতে চাইছিলেন না।

'দেখুন, এটা একটা এমার্জেন্সি। আমি ঢাকা থেকে ফোন করছি, আমার নাম জাহিদ হাসান। গতকাল ইন্সপেক্টর শাহেদ আমাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছিলেন,' বলার সঙ্গে সঙ্গে কর্মতৎপর হয়ে উঠলেন কনস্টেবল্। এরপর নাম্বার দিতে দ্বিধা করলেন না।

দুটো রিঙ হতেই ওদিক থেকে ফোন তুলল বাচ্চা একটা ছেলে, জাহিদ ইন্সপেক্টর শাহেদকে চাইতে চেঁচিয়ে ডাকল ছেলেটা, 'আব্বু, ফোন!'

সময় কেটে যাচ্ছে দ্রুত। হাসনা আপা কেমন আছেন, কে জানে!

'হ্যালো,' মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল পরে ফোন ধরল শাহেদ।

'আমি জাহিদ বলছি। ঢাকায় আমার এক পরিচিতা মহিলা ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে আছেন। গতকাল আমরা যে বিষয়ে কথা বলছিলাম, ঘটনাটা তার সঙ্গে জড়িত।'

'বলতে থাকুন,' নির্বিকার শোনাল শাহেদের কণ্ঠ।

'মহিলার নাম হাসনা...হাসনা তালুকদার। রশিদ তালুকদারের প্রাক্তন স্ত্রী, গতকাল ওনাদের কথা বলেছিলাম আপনাকে। একটু আগে হাসনা আপা ফোন করেছিলেন আমার বাসায়। চিৎকার করছিলেন, কাঁদছিলেন, সব কথা ভালমত বুঝতে পারিনি। পাশে একটা লোক ছিল, নিচু গলায় ধমকাচ্ছিল ওঁকে যাতে পরিষ্কার করে কথা বলে, কারণ তখনও আমি চিনতে পারিনি কে ফোন করেছে। তখন উনি যা বললেন...একটা লোক নাকি তাঁকে আক্রমণ করেছে...কেটে ফেলতে চাচ্ছে...ওই রকম কিছুই বলছিলেন,' ঢোক গিলল জাহিদ। 'হাসনা আপার গলা চিনতে পেরেছি আমি তখন। পরিষ্কার শুনতে পেলাম পাশ থেকে লোকটা ধমকে উঠল...মনে হয় বাজে গালি দিয়ে উঠেছিল। হাসনা আপা চিৎকার করে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ লাইনটা কেটে গেল। বার বার ফোন করেও লাইন পাচ্ছি না আর, বিজি টোন্ আসছে।'

শুনতে শুনতে সাদা হয়ে যাচ্ছে মোনা। হায় আল্লাহ্! ও না আবার

জ্ঞান হারিয়ে ফেলে!

'ঠিকানাটা বলুন,' শাহেদ দরকারের বেশি কথা বলছে না।

ইন্সপেক্টরের প্রতি আস্থা বাড়ল জাহিদের। উত্তর দেবার আগে ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করল, '২৩/৪, বেইলী রোড, দোতলায়। সাদা রঙের আটতলা ফ্ল্যাট বাড়ি।' মোনার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল জাহিদ, টলছে ও। ঝট করে হাত বাড়িয়ে ওকে ধরে সোফায় বসিয়ে দিল। 'মোনা, অ্যাই মোনা, শুয়ে পড়ো ওখানেই...'

'জাহিদ সাহেব?'

'সরি। আমার স্ত্রী একটু আপসেট হয়ে পড়েছে, মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

'অস্বাভাবিক কিছু নয়। আপনি ঠিক আছেন তো?'

'হ্যাঁ,' অসহায় ভাবে বলল জাহিদ, টেলিফোন ছেড়ে মোনার কাছে যেতে পারছে না।

'গুড। ফোন নাম্বারটা কত?'

'ফোন তো রিঙি পাচ্ছি!'

'তাও নাম্বারটা দরকার।'

'ও, হ্যাঁ,' নিজেকে বোকার মত মনে হল, 'সরি।' নাম্বারটা বলল ও, কার বার করতে গিয়ে মুখস্থ হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

'কতক্ষণ আগে ফোনটা এসেছিল?'

মনে হচ্ছে যেন কয়েক ঘন্টা কেটে গেছে!

'জাহিদ সাহেব?'

চমক ভাঙল জাহিদের। 'আধ ঘন্টার মত। পজেসার লাইন পেতেই দেরি হয়ে গেল।'

'ঠিক আছে। আমি এক্ষুনি ঢাকায় ফোন করছি। আপনি বাসাতেই থাকুন, কোথাও যাবেন না।'

'রশিদ ভাই...রশিদ ভাইকেও সাবধান করতে হবে। হাসনা

আপার যদি কিছু হয়ে যায়, তবে উনিও বিপদের মধ্যে আছেন।'

'আপনার কি মনে হয় এই লোকই আমিন ইকবালকে খুন করেছে?'

'কোন সন্দেহ নেই আমার।' একটু ইতস্তত করে আবার বলল, 'আমি জানি ও কে।'

'ঠিক আছে। আমি আপনাকে ফোন করব একটু পরেই। রশিদ তালুকদারের ফোন নাম্বার আর ঠিকানাটা দিন।'

ফোন রেখে মোনার পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসল জাহিদ। ওর ঠাণ্ডা গালে আঙুল ছোঁয়াল। তিরতির করে কেঁপে উঠল ওর চোখের পাপড়ি।

'ওটা কে, জাহিদ? রুস্তম শের, নাকি গালকাটা জয়নাল?'

অনেক্ষণ চুপ করে থাকল জাহিদ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ওদের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? তুমি এখানেই শুয়ে থাক, আমি চা করে আনছি।'

সময় আর কাটছে না।

নির্বাক হয়ে বসে রইল ওরা দু'জন পাশাপাশি। ফোনটাও নীরব। শুধু দোতলার শোবার ঘর থেকে রূপক-কুমকির হাসির শব্দ ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। পিচ্চি ওদের সঙ্গে খেলা করছে।

জাহিদের প্রচণ্ড ইচ্ছে করতে লাগল হাসনা আপার বাসায় আর একবার চেষ্টা করে দেখতে, কিন্তু শাহেদ যদি ঠিক সেই সময় ফোন করে? অস্থির হয়ে উঠল জাহিদ, হাসনা আপা কি বেঁচে আছেন?

রুস্তম শের নিশ্চয়ই এতক্ষণে কেটে পড়েছে। জাহিদ জানে ও কতটা বুদ্ধিমান, ওরই তো সৃষ্টি! কিন্তু কোন বুদ্ধিমান লোক কি রুস্তম শেরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করবে? রুস্তম শের আর গালকাটা জয়নাল কাল্পনিক চরিত্র ছাড়া আর কিছু নয়। বাস্তবে এদের কোন অস্তিত্বই

নেই। জর্জ ইলিয়ট, মার্ক টোয়াইন, নীললোহিত, যাযাবর বা বনফুল নামে যেমন কেউ ছিল না, ছিল না বিদ্যুৎ মিত্র নামে কেউ। রুস্তম শের এদের চাইতে ভিন্ন কেউ নয়। ইন্সপেক্টর শাহেদ কি বিশ্বাস করবে? বিশ্বাস তো জাহিদও করেনি, কিন্তু এখন যে অবিশ্বাসের অবকাশ নেই।

'এখনও কেন ফোন করছে না?' মোনাও সমান অস্থির।

ঘড়ির দিকে তাকাল জাহিদ, 'মাত্র তো পাঁচ মিনিট হল।'

কেমন করে ঘটল ব্যাপারটা? কেমন করে কবর থেকে উঠে এল রুস্তম শের? ড্রাকুলা বা ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের গল্প তো আর বাস্তবে ঘটে না! ইন্সপেক্টর শাহেদ ওর জুতোর মাপ জানতে চেয়েছিল। কেন? কোথায় পেয়েছে ওরা পায়ের ছাপ? নিশ্চয়ই পতেঙ্গার পাশেপাশে কোথাও। কবরস্থানে নয়ত? যেখানে সোহানা মল্লিক নকল কবর সাজিয়ে ওদের ছবি তুলেছিল?

'মন্দ এক লোক ছিল সে,' বিড়বিড় করে উঠল জাহিদ।

'কি বললে?'

ঠিক সে সময় ফোনটা বেজে উঠল প্রচণ্ড শব্দ তুলে। চমকে ওঠায় দু'জনের কাপ থেকেই ছলকে পড়ল চা।

সে নয় তো!

'জাহিদ সাহেব?'

'ওহ্! ইন্সপেক্টর শাহেদ, হাসনা আপা কেমন আছে?'

'ঠিক জানি না। পুলিস রওনা হয়ে গেছে। রশিদ সাহেবের ওখানেও গেছে একদল। আমি ওদেরকে বলেছি উন্মাদ এক লোক "শনিবারে" ছাপা আর্টিকেলের সঙ্গে জড়িত লোকজনদের খুন করছে এক এক করে।'

পাশ থেকে মোনা অনবরত জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে কি হল। ওকে বুঝিয়ে বলে আবার ফোনে ফিরে এল জাহিদ, 'সবকিছুর জন্যে

ধন্যবাদ, শাহেদ সাহেব।'

'এটা তো আমার পেশা। তবে এই মুহূর্তে না চাইলেও খুব তাড়াতাড়ি কর্তৃপক্ষ কৈফিয়ত চাইবে, তখন আমি কি বলব?'

'আপনি কি আজই একবার ঢাকা আসতে পারেন? সব কিছুই খুলে বলব।'

'জাহিদ সাহেব, আপনার কেসটা যদিও আমার আওতায় পড়ে, তবুও প্রতিদিন ঢাকা আসা যাওয়া করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে প্রচুর কাজ পড়ে আছে। আপনি ফোনে বললেই ভাল হয়।'

'তাহলে আমি অপেক্ষা করব।'

'আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?'

'সামলে নিয়েছে। আচ্ছা, আগামীকালও কি আসতে পারবেন না?'

'চেষ্টা করব, যদি ঘটনা খারাপের দিকে মোড় নেয়।'

'শাহেদ সাহেব, আপনি পায়ের ছাপের কথা বলেছিলেন না?'

'হ্যাঁ,' অবাক হল শাহেদ।

'ছাপগুলো পতেঙ্গা এলাকাতেই পাওয়া গেছে, তাই না?' পাশে বসা মোনার চেহারা আবার পাংশুটে হয়ে যাচ্ছে—বড় বড় দেখাচ্ছে চোখ দুটো।

'আপনি কেমন করে জানলেন?'

'শনিবারের লেখাটা পড়েছেন?'

'হ্যাঁ। বাড়ি ফিরেই ওটা পড়েছি।'

'রুস্তম শেরের কবরের ছবিটা দেখেছেন? ওটা তোলা হয়েছে পতেঙ্গা কবরস্থানে। পায়ের ছাপটা সম্ভবত ওখানেই পেয়েছেন আপনারা।'

'যাব্বাবা!'

'বুঝতে পারলেন কিছু?'

'কিছুটা। নিজেকে রুস্তম শের ভাবছে লোকটা। কবর থেকে উঠে

আসার ভান করেছে ব্যাপারটাকে নাটকীয় করে তোলার জন্যে। আচ্ছা, ছবিটা কে তুলেছিল?'

'সোহানা মল্লিক নামে এক ফটোগ্রাফার।'

'ফ্রিল্যান্সার? ঢাকাতেই থাকেন?'

'আমি ঠিক জানি না। তবে ঢাকায় থাকেন বলেই মনে হয়।'

'তাহলে তো বিপদে আছেন ভদ্রমহিলা। আর লেখাটা যিনি লিখেছেন?'

'খান জয়নুল। শনিবারে যোগাযোগ করলেই ঠিকানা—ফোন নাম্বার পাওয়া যাবে।'

'পত্রিকার কোথাও উল্লেখ করা হয়নি ছবিটা কোথায় তোলা হয়েছে। এমনকি এত কাছে থেকে আমিও চিনতে পারিনি। কিন্তু লোকটা সেটা জানল কিভাবে?'

ইন্সপেক্টরের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। এই লোকের উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। একটু চিন্তা করে উত্তর দিল জাহিদ, 'ভেতরের সব খবরই ও রাখে, কিভাবে তা জানি না।'

'জাহিদ সাহেব, কিছু গোপন না করে খুলে বলুন।'

চমকে উঠল জাহিদ। পুলিস সম্বন্ধে কত কম ধারণাই না ছিল! এ যে রীতিমত বিচক্ষণ! বিস্ময় গোপন করার চেষ্টা করল জাহিদ, 'কি বলছেন?'

'দেখুন, আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। সেটুকুই শুধু জানতে চাচ্ছি। না জানলে আমি আমার কর্তব্য ঠিক ভাবে করতে পারব না। কি গোপন করে যাচ্ছেন আপনি?'

'শাহেদ সাহেব, শুনলে আপনি হেসে ফেলবেন। না, ভুল বললাম, এখন আর হাসবেন না। তবে আমাকে হয় মিথ্যেবাদী ভাববেন নয়ত ভাববেন পাগল।'

'চেষ্টা করে দেখুন তো!'

মোনার দিকে চাইল জাহিদ, একটু ইতস্তত করল, তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'না, মুখোমুখি না হলে বলা ঠিক হবে না। অবে লোকটার চেহারার বর্ণনা দিতে পারি, পুলিসের যদি তাতে উপকার হয়।'

'বলুন।'

ঈশ্বরের দেয়া বাইরের চোখ দুটো বন্ধ করে ভেতরের তৃতীয় নয়নটা খুলল জাহিদ। ওর ভক্তরা ওকে দেখে সব সময়ই হতাশ হয়। সত্যি বলতে কি সাড়ে পাঁচফুট উচ্চতা, পাতলা হয়ে আসা চুল, ভারী দেহ আর অতি সাধারণ চেহারার পেছনে দুর্ধর্ষ লেখককে খুঁজে বের করা দুষ্কর। কিন্তু বাইরের জগতের কেউই ওর এই তৃতীয় নয়নের খবর রাখে না। এই তৃতীয় নয়নই ওকে মানুষ চিনতে সাহায্য করে, ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। অন্ধকারে লুকানো এই তৃতীয় নয়নই ওর সাফল্যের চাবিকাঠি।

'ও বেশ লম্বা। ছ'ফিট তিন কি চার। লালচে লম্বা ঢেউ খেলানো চুল। কটা চোখ। লঙ ভিশন খুব ভাল। বছর পাঁচেক আগে চশমা নিয়েছে, শুধু পড়া আর লেখার সময় দরকার হয়। উচ্চতার জন্যে নয়, ওকে চোখে পড়ে প্রস্থের কারণে। একটুও মোটা নয়, কিন্তু চওড়া শরীর, বক্সারের মত। গলার মাপ সাড়ে আঠারো কি উনিশ। আমার বয়সীই হবে, কিন্তু এখনও তারুণ্যে দীপ্যমান। স্টিভেন সিগাল বা আর্নল্ড শোয়ার্জেনেগারের ব্যক্তিত্বে যেমন একটা শক্তি বিচ্ছুরিত হয়, ওরও তাই।

'খুলনায় জন্ম ওর। বাবা-মা মারা গেছেন ছেলেবেলায়। সারা দেশে ঘুরে বেড়ালেও স্থায়ী ঠিকানা এখনও খুলনাতেই। অত্যন্ত বিপদজনক চরিত্র, সত্যি বলতে কি উন্মাদ, ম্যানিয়াক। বাঁ গালে একটা লম্বা কাটা দাগ আছে। গায়ের রঙ অস্বাভাবিক ফর্সা বলে সেটা হালকা দেখায়।

'কালো রঙের ফোর্ড এসকর্ট চালায়। কোন্ বছরের তা ঠিক বলতে পারব না। সম্ভবত খুলনার নাম্বার প্লেট। ওহ্! আর একটা ব্যাপার।

পেছনের বাম্পারে কার্টুনের একটা রঙিন স্টিকার লাগানো আছে, তাতে লেখা—'ওস্তাদের মাইর শেষ রাতে।'

চোখ খুলল জাহিদ।

আহত বিস্ময়ে চেয়ে আছে মোনা।

লাইনের ওদিকটা পুরোপুরি নিঃশব্দ।

'শাহেদ সাহেব, হ্যালো...'

'এক মিনিট, আমি লিখছি,' আরও দশ সেকেণ্ড পর কথা বলল শাহেদ, 'ও. কে, কিন্তু কিভাবে তাকে চেনেন আর নাম কি সেটা বলবেন না?'

'সেটা আগামীকালের জন্যে থাকুক। তাতে এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। হয়ত এখন ছদ্মনাম ব্যবহার করছে।'

'রুস্তম শের।'

'গালকাটা জয়নালের চেয়ে রুস্তম শের নামটাই বেশি বাস্তবে গ্রাহ্য।'

'আজ আর কিছুই বলবেন না?'

'না।'

'ঠিক আছে। পরে যোগাযোগ করব।' কোনরকম বিদায় সম্ভাষণ না করেই লাইন ছেড়ে দিল শাহেদ।

মোনা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ওনাকে সবকিছুই বলে দেবে?'

'হ্যাঁ। কর্তৃপক্ষকে কতটা জানাবেন ওটা তাঁর ব্যাপার।'

'এত কিছু! জাহিদ, ওর সম্পর্কে এত কিছু কেমন করে জানলে তুমি?'

সেটা নিজেও জানে না জাহিদ।

ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ফোন বেজে উঠল। রশিদ তালুকদার পুলিস

প্রহরায় আছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী—এখন সত্যিকার অর্থেই যিনি চিরদিনের জন্যে প্রাক্তন স্ত্রী হয়ে গেলেন—তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছেন। হাসনা তালুকদারের মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সোহানা মল্লিককেও পুলিস প্রোটেকশনে রাখা হয়েছে। কিন্তু খান জয়নুলকে এখনও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

'হাসনা আপাকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে?' জানতে চাইল জাহিদ।

'ধারাল অস্ত্র দিয়ে গলা কেটেছে,' নিষ্ঠুর শোনাল শাহেদের কণ্ঠ. 'এখনও জেদ করে আছেন কিছু বলবেন না?'

'না। আগামীকাল হবে সব। যখন মুখোমুখি কথা হবে।'

'পুলিসকে কুতুম শেরের চেহারার বর্ণনা জানিয়ে দিয়েছি।'

জাহিদ জানে ও নিজে ধরা না দিতে চাইলে পুলিসের বাপেরও সাধ্য নেই ওকে ধরে।

'জাহিদ সাহেব, কাল রাত ন'টার দিকে বাসায় থাকবেন।'

রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাল মোনা। পৌনে তিনটা পর্যন্ত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করল জাহিদ। অবশেষে উঠে বাথরুমে এল। জলবিয়োগ করতে করতে হঠাৎ করে মনে হল চড়ুই পাখি ডাকছে, পরমুহূর্তেই বুঝল ওটা ঝিঁঝি পোকা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই অন্ধকারে বাসার সামনে পার্ক করা পুলিসের গাড়িটাকে দেখতে পেল। ভেতরে দুটো লালচে আলোর বিন্দু, সিগারেট খাচ্ছে কেউ। পুলিস পাহারা? নাকি ও গৃহবন্দী? যাই হোক না কেন, অনেকটা নিশ্চিন্ত হল জাহিদ।

বিছানায় ফিরেই ঘুমিয়ে পড়ল দ্রুত। সকাল আটটায় যখন ঘুম ভাঙল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আজ রাতে কোন দুঃস্বপ্ন দেখেনি। তবে সত্যিকারের দুঃস্বপ্ন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে। বাইরে কোথাও।

রুস্তম শের ভাবতেই পারেনি হিটলারী গোঁফওয়ালা জোকার মত চেহারার খান জয়নুল ওকে এতটা ভোগাবে।

খান জয়নুলের জন্যে অপেক্ষা করছিল সে সন্ধ্যার পর থেকেই। মালিবাগ এলাকার একটা গলির ভেতর তিনতলা এক বাড়ির ওপর তলায় থাকে লোকটা। তাই ভেবেচিন্তে গলির বাইরে অপেক্ষা করাই ভাল মনে হয়েছে। শুধু শুধু ঝামেলা পাকিয়ে লাভ কি!

রাত বারোটার কিছু পরে অবশেষে গলির মুখে এসে দাঁড়াল বেবী ট্যাক্সিটা। খান জয়নুলকে নামতে দেখে নিঃশব্দে রাস্তার উল্টোদিকের দোকানের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রুস্তম শের। অপেক্ষা করতে বিরক্ত লাগলেও এ মুহূর্তে তার জন্যে কোন অনুশোচনা নেই। রাত দশটার পর থেকেই রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেছে, এগারোটার পর কোন জানালায় আর আলো দেখা যাচ্ছে না। একেই বলে ভাগ্য।

খান জয়নুল বেবী ট্যাক্সির ভাড়া মিটাচ্ছে। দ্রুত রাস্তা পার হয়ে এপারে চলে এল রুস্তম শের। খান জয়নুল ওকে দেখেনি, গলির মধ্যে ঢুকে হাঁটতে শুরু করল। রুস্তম শের ওর পিছু নিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে এল ঠিক ঘাড়ের পেছনে। ইচ্ছে করেই খুক খুক করে কাশল, যাতে খান জয়নুল পেছনে ফিরে তাকায়, এতে ওর কাজটা সহজ হয়ে পড়বে।

হিসাব মত ঠিকই ঘুরে তাকাতে গেল খান জয়নুল। তিলার্ধ দেরি না করে ক্ষুরটা অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়ে নিয়ে কোপ মারল রুস্তম শের। আর ওকে অবাক করে দিয়ে চিতাবাঘের মত ক্ষিপ্রতায় মাথাটা সরিয়ে নিল মধ্যবয়সী লোকটা। অবশ্য আঘাতটা পুরোপুরি কাটাতে পারল না। কপালের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত লম্বা একটা ক্ষত সৃষ্টি হল, সাদা হাড় বেরিয়ে পড়েছে। ভাঁজ করা কাগজের মত কপালের চামড়া ঝুলে পড়েছে ভুরুর ওপর।

'বাঁচাও!' গগনবিদারী চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল খান জয়নুল।

ধ্যাত্তেরিকা! ঝামেলা বাধবে না তো! কি আর করা যাবে, সবকিছু তো আর প্ল্যান মত হয় না। তবে কপাল থেকে নেমে আসা রক্তস্রোতে অন্ধ হয়ে গেছে লোকটা, সেটাই যা বাঁচোয়া।

ক্ষুরটা স্যালুটের ভঙ্গিতে কপালের পাশে তুলল রুস্তম শের, তারপর ঝটিতে নামিয়ে আনল লোকটার গলা লক্ষ করে। আশ্চর্য! এবারেও ঠিক সময় মত গড়িয়ে সরে গেল সে। সেই সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। ক্ষুরটা ওর গলার চামড়া স্পর্শ করেছে মাত্র। সময় নষ্ট না করে আবার ছোবল মারল রুস্তম শের। কিন্তু খান জয়নুল ডান হাতে তা ঠেকাতে চেষ্টা করল। ক্ষুরটা আড়াআড়ি ভাবে আঘাত হানল ওর হাতের তালুতে। তিনটে আঙুল গোড়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলতে থাকল, মধ্যমায় আঙটি পরা ছিল বলে সেটা অক্ষত রইল। আঙটিতে ঘষা লেগে ক্ষুরটা ধাতব শব্দ তুলল। সমানে চিৎকার করে চলেছে লোকটা। নাহ্! এখুনি লোকজন বেরিয়ে আসবে।

বিরক্ত হল রুস্তম শের।

দু'একটা বাড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে। চারনম্বরের একতলা বাড়িটার দরজা খুলে বেরিয়ে এল এক যুবক, ঘুম জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কে? কি হচ্ছে ওখানে?'

ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাল রুস্তম শের, 'খুন-জখম হবে। আপনাকে কিছুটা দেব!'

নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল যুবক, সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

এদিকে সুযোগ পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করেছে খান জয়নুল। জ্বালিয়ে মারল দেখছি! ধৈর্য হারিয়ে দৌড়াতে শুরু করল রুস্তম শের। পেছন থেকে আলতো করে ওর ঘাড়ে ক্ষুরটা ছোঁয়াল। আবারও ওকে অবাক করে দিয়ে কচ্ছপের মত ঘাড়টা ভেতরে ঢুকিয়ে কুঁজো হয়ে ছুটছে লোকটা, চামড়ায় শুধু একটু আঁচড় লাগল মাত্র। কি ব্যাপার! লোকটা টেলিপ্যাথিক না কি? কেমন করে আঘাতগুলো কাটাচ্ছে? মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ওর।

আশেপাশের বাড়িগুলোতে আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। জানালায় উঁকি দিচ্ছে কৌতূহলী মুখগুলো। সাথে সাথে খটাখট বন্ধ হতে শুরু করল খোলা জানালাগুলো।

নিজের বাড়ির গেটে পৌঁছে গেছে লোকটা।

রাগে জ্বলে যাচ্ছে রুস্তম শের। পেছন থেকে ধমকে উঠল, 'হনুমানের বাচ্চা! থাম, থাম বলছি।'

এর মধ্যেও অবাক হয়ে পিছনে ঘুরে তাকাল খান জয়নুল। কে এই লোক! পরক্ষণেই সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়ল। বিনা দ্বিধায় ওর তলপেটে লাথি কষাল রুস্তম শের।

'শেষ পর্যন্ত ব্যাটারি শেষ হয়েছে, তাই না?' ঝুঁকে পড়ে ওর চুল মুঠো করে ধরল সে।

সিঁড়ির গোড়ায় একতলার দরজাটা খুলে গেল। ম্যাক্সি পরা কম বয়সী একটা মেয়ে মুখ বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দৃশ্য দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

দেরি না করে দ্রুত কাজ সেরে নিল রুস্তম শের। ধড় থেকে মাথাটা প্রায় আলাদা হয়ে গেছে। বহুত ভুগিয়েছে ব্যাটা। পারলি শেষ পর্যন্ত?

দ্রুত গলিতে চলে এল রুস্তম শের। নষ্ট করার মত সময় একটুও নেই। রাস্তায় ওঠার মুহূর্তে ওকে পাশ কাটিয়ে একটা পুলিসের জিপ ঢুকল গলিতে। এত তাড়াতাড়ি পুলিস চলে এল? অসম্ভব। পুরো ব্যাপারটা ঘটতে মিনিট পাঁচেকের বেশি লাগেনি। কেউ যদি ফোন করেও থাকে, পুলিস এত তাড়াতাড়ি কিছুতেই পৌঁছাতে পারবে না। তাহলে হয়ত খান জয়নুলকে পাহারা দিতে এসেছে। যা ব্যাটারা, ভাল করে পাহারা দে।

সোহানা মল্লিক থাকে মগবাজারের নতুন তৈরি বিলাসবহুল একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের আটতলায়। বলতে গেলে একরকম একাই থাকে। ষাট বছরের বৃদ্ধা হালিমা বিবি ওকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে এককালে, এখনও সে-ই দেখাশোনা করে। সোহানার বাবা-মা গত দশ বছর ধরে আবুধাবীতে আছেন, সোহানাও কিছুদিন সেখানেই ছিল। কিন্তু পড়াশুনার সুবিধার জন্যে এখন পাকাপাকি ভাবে দেশে চলে এসেছে। প্রথম প্রথম চাচার বাসায় থেকেই কলেজে পড়ত। কিন্তু ওর খামখেয়ালী, কেয়ার ফ্রী অতি-আধুনিক চালচলন ওঁরা ঠিক মেনে নিতে পারেননি, পদে পদে মন কষাকষি হত। তাই মেয়ের মন বুঝে ওর বাবা-মা মগবাজারের সেই অ্যাপার্টমেন্টটা কিনে নিয়েছেন। সোহানা একাই থাকে, গ্রাম থেকে হালিমা বিবিকে আনিয়ে নিয়েছেন ওর বাবা-মা, সে-ই রান্নাবান্না ঝাড়ামোছা করে। পঁচিশ বছর বয়সেও সোহানা মল্লিকের আচরণ কিশোরীর মত। আকর্ষণীয় চেহারা, বয় কাট চুল। লম্বা ঢোলা কুর্তা আর জিন্স পরে থাকে অধিকাংশ সময়। আর্ট কলেজে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে ফ্রি ল্যান্সার ফটোগ্রাফার হিসেবে বেশ নাম করে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। ওর তোলা একটা ছবি গত বছর পুরস্কার পেয়েছে।

কনস্টেবল জলিল আহমেদ আর কমান্স মিয়া সোহানা মল্লিকের

বাসায় পৌঁছেছে রাত সাড়ে দশটায়। প্রথমে একটু অবাক হলেও ঘটনাটা জানার পর ভয় পাওয়ার বদলে সোহানা বাচ্চা মেয়ের মত খুশি হয়ে উঠল। কেউ ওকে খুন করতে চাইছে, আর ওকে পাহারা দেবার জন্যে পাঠানো হয়েছে দু'জন রক্তমাংসের পুলিসকে! এরকম দারুণ উত্তেজনাকর ঘটনা মানুষের জীবনে ক'বার ঘটে! জাহিদ হাসানের ছবিগুলো তোলার ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করছিল কনস্টেবল দু'জন, ক্যামেরায় ফিল্ম ভরতে ভরতে জবাব দিচ্ছিল সোহানা। একটু অবাক হয়ে কনস্টেবল জলিল জানতে চায় ও কি করছে। এক গাল হেসে সোহানা বলল, 'কখন ছবি তোলার দরকার পড়বে কেউ কি জানে? রেডি থাকাই ভাল।' তারপর রান্নাঘরের দিকে ছুটতে ছুটতে চেঁচাতে লাগল, 'বুয়া, ভাল করে চা-নাস্তা বানান তো মেহমানদের জন্যে।'

জলিল বিস্মিত চোখে কামালের দিকে ফিরল, 'মেয়েটার মাথায় কি ছিট আছে নাকি?'

'কোন সন্দেহ নেই। ছিট না থাকলে কি আর কেউ ওরকম করে? একটুও ভয় নেই, যেন পিকনিকে যাচ্ছে! ওর কাছে ফটো তোলা ছাড়া আর কিছুই জরুরি না। মানুষ কোনদিন এত সরল হয়?'

চা-নাস্তা খেয়ে কনস্টেবল দু'জন দরজার বাইরে দুটো চেয়ার নিয়ে বসেছে। ভেতরে সোহানা মল্লিক ঘুমাচ্ছে, টেবিলের ওপর ক্যামেরা রেডি করে রাখা, শুধু শাটার টেপার অপেক্ষা। ওর খাটের পাশে মেঝেতে বিছানা করে শুয়েছেন হানিফা বিবি।

ভোরের দিকে চোখ লেগে এসেছিল কনস্টেবল দু'জনের। করিডরের শেষপ্রান্তে কাঁচের জানালার ওপাশে এখনও ভোরের আলো ফোটেনি। এলিভেটরের শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল, সজাগ হয়ে উঠল ওরা। রাইফেল হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

ওদের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা।

ভেতর থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বেরিয়ে এল আহত অন্ধ এক লোক। বিশাল লম্বা, বিদেশীদের মত ফর্সা, বয়স ত্রিশের ওপরে। চোখে কালো চশমা, অন্ধরা যেরকম পরে, ডান হাতে ছড়ি। জামাকাপড় ছেঁড়া, কালচে রক্তের দাগ এখানে সেখানে।

চিৎকার করছে লোকটা, 'পু-লি-স! পু-লি-স! বাঁচাও!' ছড়ি ঠুকঠুক করতে করতে ওদের সামনে চলে এল হোঁচট খেতে খেতে, যে-কোন মুহূর্তে উল্টে পড়বে। 'নিচের দারোয়ান বলল আট তলায় নাকি পুলিস আছে! কোথায়? পুলিস কোথায়?'

ওরা দৃষ্টিবিনিময় করল, কোত্থেকে এল এই ঝামেলা! মনে হচ্ছে কেউ মারধর করেছে। সাবধানী চোখ রাখল লোকটার ওপর কনস্টেবল জলিল, মুখে বলল, 'দাঁড়ান! দাঁড়ান বলছি! এক্ষুণি তো উল্টে পড়বেন! কি হয়েছে?'

শব্দ লক্ষ্য করে ঘাড়টা ঘোরাল লোকটা, কাঁদছে, 'আমার কুকুরটাকে···ওরা মেরে ফেলল···আমার ডেইজী···ই···ই··· ই···!' বলতে বলতে বাঁ হাতটা পকেটে ভরল, নিমেষে বের করে আনল পয়েন্ট ফর্টিফাইভ রিভলভার। পরপর দু'বার ট্রিগার টানল। বদ্ধ করিডরে বোমা ফাটার মত আওয়াজ হল। নীল ধোঁয়ায় ভরে গেল করিডর। লুটিয়ে পড়ল কনস্টেবল জলিল।

বিস্ময়ে পাথর কামাল রাইফেল তোলার সুযোগ পেল না। চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'আল্লার কসম লাগে···না···না···' পরমুহূর্তেই বাতাসের ধাক্কা খেল হৃৎপিণ্ডে। আরও দু'বার গর্জে উঠল রিভলভারটা পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে। অন্ধ লোকের তুলনায় হাতের টিপ তুলনাহীন। আরও নীল ধোঁয়া ঘিরে এল চারদিক থেকে, বলতে গেলে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একটা দরজা খুলতে গিয়েও সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরে কেউ চেঁচাচ্ছে।

দূরে, বহুদূরে ঘুমের মধ্যে জাহিদ এপাশ ওপাশ করছে। 'নীল ধোঁয়া,'

ঘুমের মধ্যেই বিড়বিড় করছে, 'নীল ধোঁয়া।'

জানালার বাইরে ইলেকট্রিক তারে নয়টা চড়ুই পাখি বসে আছে। আরও ছয়টা উড়ে এসে বসল আগেরগুলোর পাশে। বসে রইল চুপচাপ, যেন কিছুর অপেক্ষা করছে। নিচের পুলিস দু'জন লক্ষ্য করল না।

'না...না...' চেঁচিয়ে উঠল জাহিদ।

চমকে উঠে বসল মোনা। 'জাহিদ! অ্যাই জাহিদ,' দুই হাতে ওর শরীর ঝাঁকিয়ে জাগাবার চেষ্টা করল, 'কি হয়েছে? এমন করছ কেন?'

জাহিদ ফুঁপিয়ে উঠল, কিন্তু জাগল না। জানালার বাইরে চড়ুইগুলি একসঙ্গে ডানা মেলল। উড়ে গেল রাতের অন্ধকারে, যদিও এখন ওড়ার সময় নয়।

মোনা বা পুলিস দু'জনের কেউই তা লক্ষ্য করল না।

রুস্তম শের কালো চশমা আর ছড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। করডাইটের গন্ধ আর ধোঁয়ায় শ্বাস নেয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। সোহানা মল্লিকের দরজায় এসে দাঁড়াল ও। সোহানা গুলির শব্দে জেগে গেছে, দরজার ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হানিফা বিবির চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সোহানা কথা বলতে শুরু করলে রুস্তম শের বুঝল মেয়েটাকে বোকা বানানো পানির মত সহজ।

'কি হয়েছে?' চিৎকার করে জানতে চাচ্ছে সোহানা, 'কিসের শব্দ হল?'

'ব্যাটাকে কব্জা করেছি আমরা, ম্যাডাম,' খুশি খুশি গলায় উত্তর দিল রুস্তম শের। 'যদি ছবি তুলতে চান তো এখুনি আসুন। পরে আবার আমাদেরকে দোষ দিতে পারবেন না।'

সেফটি চেইনটা লাগানো অবস্থায় ছিটকিনি খুলল সোহানা, তাতে অবশ্য তেমন কোন অসুবিধা হল না। কৌতূহলী চোখটা দু'ইঞ্চি

ফাঁকের ওধারে দেখা যেতেই ট্রিগার টানল রুস্তম শের চোখটা লক্ষ্য করে।

উল্টোদিকের দরজাটা আবার খুলতে শুরু করেছে। রিভলভার হাতে ঘুরে দাঁড়াতেই প্রচণ্ড শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল সেটা।

মৃদু হেসে লম্বা পা ফেলে এলিভেটরের দিকে এগুল রুস্তম শের।

টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল রশিদ তালুকদারের। চোখ খুলে দেখলেন জানালায় সূর্য জ্বলছে। দুপুর হতে চলল প্রায়। বলতে গেলে সারা রাত ঘুমাননি তিনি। গভীর রাতে মর্গ থেকে ফিরেছেন। হাসনার বীভৎস মৃতদেহ দেখার পর চিন্তাও করেননি চোখে ঘুম নামবে। অথচ সকালের দিকে ঠিকই তন্দ্রা লেগে এসেছিল। আত্মীয়-স্বজন যারা সমবেদনা জানাতে এসেছিল, রাতেই চলে গেছে সবাই। নিজেও বিপদের মধ্যে আছেন, তাই কাউকে থাকতে দিতে চাননি। দু'জন পুলিস পাহারায় মোতায়েন আছে, কাজের লোক তণু মিয়াও শক্ত-সমর্থ জোয়ান ছেলে, কিন্তু ভয় তাতে কমছে না।

হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন, 'হ্যালো?'

'আমিই আপনার স্ত্রীকে হত্যা করেছি, চিনতে পারছেন তো?'

চমকে উঠে বসলেন রশিদ তালুকদার, কণ্ঠস্বরটা মনে হচ্ছে এক্ষুনি বেরিয়ে আসবে বুকের খাঁচা ভেঙে। 'কে বলছেন?'

'জাহিদ হাসানকে জিজ্ঞেস করবেন আমি কে,' আকর্ষণীয় পুরুষালী কণ্ঠ, স্পষ্ট শুদ্ধ উচ্চারণ। 'উনি সবই জানেন। ওনাকে বলবেন উনি মৃতদেহের ওপর হাঁটছেন। আরও বলবেন আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি।'

খুট করে লাইনটা কেটে গেল।

ঘামতে শুরু করলেন রশিদ তালুকদার। একটু সামলে উঠেই থানায় ফোন করলেন।

টেলিফোনের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ডিউটি অফিসার। 'গার্ড দু'জনকে নিয়ে এক্ষুনি থানায় চলে আসুন। রিপোর্ট লিখতে হবে। আমি দু'জন টেকনিশিয়ান পাঠাচ্ছি, ওরা আপনার ফোনে টেপরেকর্ডার আর ট্রেসব্যাক ইকুইপমেন্ট ফিট করে দেবে। লোকটা আবার ফোন করতে পারে। আপনার বাড়িতে দরজা খোলার লোক আছে তো?'

'হ্যাঁ, কাজের লোক আছে। ওকে বলে যাব। কিন্তু জাহিদকে একটা ফোন করা দরকার। ও বিপদের মধ্যে আছে।'

'চিন্তা করবেন না, জাহিদ সাহেবের ওখানেও চব্বিশ ঘন্টার জন্যে আমরা পাহারা রেখেছি। এখন আবার ফোনের কথা শুনলে বরং আরও বেশি চিন্তা করবেন। ওনাকে এখনই ফোন করার দরকার নেই।'

থানায় কাজ সেরে পুলিসের জীপেই বাড়ি ফিরলেন রশিদ তালুকদার, গার্ড দু'জন সঙ্গেই আছে। এক তলা বাড়িটা কবরের মত নিস্তব্ধ। দরজায় তালা ঝুলছে। অবাক হলেন তিনি। তনু মিয়া আবার কোথায় গেল? বিরক্তও হলেন কিছুটা, বার বার নিষেধ করে গেছেন যাতে বাইরে না যায়।

গার্ড দু'জনকেও চিন্তিত দেখাচ্ছে। একজন বলল, 'টেলিফোনের লোক কি আসেনি? এতক্ষণে কাজ সেরে ফেলার কথা। কিন্তু ওদের তো এখানেই অপেক্ষা করার কথা, কাজ হয়ে গেলেও তো চলে যাবার কথা না।' ইতস্তত করছে দু'জনেই।

কিন্তু ভেতরে না গেলে তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ভাগ্যিস বেরোবার সময় চাবিটা নিয়ে গিয়েছিলেন। না হলে এখন বিপদে পড়তে হত। খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকাও তো বিপদজনক।

তালা খুলে দরজাটা ঠেলতেই প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হল বাড়িটা। ধোঁয়া আর আগুন ঘিরে ধরল চারদিক থেকে। মাংস পোড়া গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস।

রশিদ তালুকদারের দেহটা সনাক্ত করার উপায় রইল না। তাঁর

পিছনে দাঁড়ানো গার্ডও একই সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে। বাকি জন প্রাণে বেঁচে গেছে, তবে ঝলসে গেছে মুখ আর হাতের চামড়া।

বাড়ির ভেতরে আরও তিনটে মৃতদেহ ছিল—টেকনিশিয়ান দু'জন আর তনু মিয়া। রিভলভারের গুলিতে মৃত্যু ঘটেছে তিনজনেরই।

এগারো

মৃত্যুর মত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে সারা ঘরে। বাচ্চারাও যেন বুঝতে পারছে সবকিছু, টুঁ শব্দটি করছে না। জাহিদ আর মোনা পাথরের মত বসে আছে। শাহেদের কাছ থেকে এইমাত্র শুনেছে গতরাতের তাণ্ডবলীলার পুরো বর্ণনা। খান জয়নুলকে ওর বাড়ির সামনে কুপিয়ে মারা হয়েছে, সোহানা মল্লিক আর তার দেহরক্ষী গার্ড দু'জন মারা গেছে গুলিতে, সোহানা মল্লিকের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের দারোয়ানকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। শাহেদ গতরাতেই ঢাকা পৌঁছেছে, কিন্তু এখানে এসেছে সকাল বেলা। জাহিদ তখন ক্লাসে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, শাহেদের পরামর্শে যাওয়া স্থগিত করতে হয়েছে। ডিপার্টমেন্টে ফোন করে ক্লাস ক্যানসেল করতে হয়েছে যা সে সাধারণত করে না।

অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল জাহিদ। 'রশিদ ভাই ঠিক আছেন তো?'

'উনি ভাল আছেন। চব্বিশ ঘন্টা পাহারা দেয়া হচ্ছে ওনাকে, চিন্তার কিছু নেই।' শাহেদ জানে না দু'ঘন্টা পর খুন হতে যাচ্ছেন রশিদ

তালুকদার। 'সোহানা মল্লিকের ওখানেও পুলিস-পাহারা ছিল, তাতে কি কোন কাজ হয়েছে?' কঠিন শোনাল মোনার কণ্ঠ।

'ঠিকই বলেছেন, ভাবী। কিন্তু এর চেয়ে বেশি আর কিছু করার ছিল না এত অল্প সময়ের মধ্যে। তার জন্যে আমি নিজেও কম লজ্জিত নই। তবে খুনীকে অনেকেই দেখেছে। সেজন্যে তাকে একটুও বিচলিত মনে হয়নি।'

জাহিদ কৌতূহলী হল। 'আমার বর্ণনার সঙ্গে মিলেছে?'

'খাপে খাপে। এখন আমাকে শুধু নামটা দিন। এতগুলো মানুষ খুন হয়ে যাচ্ছে, আপনার তো একটা দায়িত্ব আছে।'

'নাম তো আগেই জানিয়েছি,' জাহিদের চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই।

'কি বললেন?'

'ওর নাম রুস্তম শের।' কেমন করে এত শান্তভাবে কথা বলতে পারছে তা দেখে জাহিদ নিজেই চমৎকৃত।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কি বলতে চাচ্ছেন,' শাহেদকে কিছুটা বিরক্ত দেখাচ্ছে।

এবার মোনা কথা বলে উঠল। 'আপনি ঠিকই বুঝতে পারছেন, শাহেদ সাহেব। জাহিদ বলতে চাচ্ছে রুস্তম শের ব্যাখ্যার অতীত কোন উপায়ে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেবার সময় জাহিদ বলেছিল, রুস্তম শের মন্দ লোক ছিল।'

'কিন্তু...এটা তো অসম্ভব...' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে শাহেদ।

'আগে সবটা শুনুন, তারপর মতামত দেবেন।' মোনা শক্ত গলায় বলল, 'লেখাটা যারা পড়েছে, তারা ভেবেছে জাহিদ রসিকতা করে বলেছে কথাটা। তা নয়। সত্যি কথাই বলেছিল ও। রুস্তম শের নামে জঘন্য এক চরিত্রের সৃষ্টি করেছিল ও। ওই নামে প্রতিটা বই লেখার সময় জাহিদ অন্য এক মানুষে পরিণত হয়। বদরাগী, অমনোযোগী,

অসামাজিক। অথচ এমনিতে ও মোটেই ওরকম নয়। যেদিন ও সিদ্ধান্ত নিল ছদ্মনামে আর লিখবে না, সেদিন বোধহয় আমিই সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলাম। আমিন ইকবাল সেদিক থেকে বিরাট একটা উপকার করেছিল।'

'ভাবী, আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন না যে...'

'শাহেদ সাহেব, জাহিদ যা বলবে তা মন দিয়ে শুনুন, আর অন্তত বিশ্বাস করতে চেষ্টা করুন। তা না হলে আরও অনেক নির্দোষ লোকের প্রাণ যাবে। আর কিছু না হলেও এই মানুষগুলোর জীবনের কথা ভেবে দয়া করে বিশ্বাস করুন আমাদেরকে। না হলে আমি, আমার স্বামী, এই বাচ্চা দুটো সবাইকেই ও খুন করে ফেলবে।'

রুমকি মোনার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে, রূপক ওর বাবার কোলে বসে বড় বড় হাই তুলছে। ওদেরকে দেখতে দেখতে নিজের উপরই রেগে উঠল শাহেদ। অতি সাধারণ দেখতে এই দম্পতি কি সব আবোল-তাবোল বকছে? দেখেশুনে তো মাথা খারাপের কোন লক্ষণ বোঝা যাচ্ছে না, তাহলে এই ভুতুড়ে কাহিনী শোনাবার অর্থটা কী? সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় যদি এরা এই গল্প বলে থাকে, তার সন্দেহ নেই। এরা মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু কেন? কি স্বার্থ এদের? তাছাড়া এত বড় নামকরা একজন লেখক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় শিক্ষক, কেন শুধু শুধু মিথ্যে গল্প বানাতে যাবেন? কিন্তু মিথ্যে যে বলছেন তাতে তো কোন সন্দেহ নেই!

'ঠিক আছে, জাহিদ সাহেব, কি বলবেন বলুন,' অবশেষে বলল শাহেদ।

নিঃশ্বাস ফেলে পেছনে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করল জাহিদ। মোনা বাচ্চাদেরকে ওপরে নিয়ে গেল শুইয়ে দেবার জন্যে।

কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল জাহিদ। 'এ ক'দিন ধরে যা ঘটছে, তা দুঃস্বপ্নের চেয়েও ভয়ঙ্কর। যত অসম্ভবই শোনাক না কেন,

আমি যা বলব তার প্রতিটা শব্দ আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। আমার যখন এগারো বছর বয়স, তখন এর শুরু।'

একে একে সবকিছুই বলল জাহিদ। পাখিদের শব্দ আর তার পরপরই মাথা ব্যথার ব্যাপারটা, অপারেশনের পর সুস্থ হয়ে যাওয়া, তারপর এত বছর পর আবার পাখিদের ফিরে আসা। অচেতন অবস্থায় লেখা কাগজটা এনে শাহেদকে দেখাল, এইচ-বি পেন্সিলে লেখা শব্দ ক'টা এখনও জ্বলজ্বল করছে—'পাখিরা আবার উড়ছে'। দ্বিতীয় কাগজটা ছিঁড়ে ফেলায় দেখাতে পারল না, তবে সেটায় লেখা শব্দগুলোর কথা বলল।

শাহেদ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। মোনা রান্নাঘরের তদারকি সেরে এসে বসেছে, অবশেষে মুখ তুলে ওর দিকে চাইল। 'আচ্ছা, ভাবী, সেদিন আমি চলে যাবার পর উনি আপনাকে এই কাগজটা দেখিয়ে ছিলেন, তাই না?' এইচ-বি পেন্সিলে লেখা কাগজটা মোনার দিকে ঠেলে দিল।

'হ্যাঁ।'

'আমি যাবার ঠিক পরপরই?'

'না—ওপরে গিয়ে শোবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম, তখন ওকে জিজ্ঞেস করি কি লুকোচ্ছে ও আমার কাছ থেকে। তখন ও দেখায় ওটা।'

'আমি যাবার পর সর্বক্ষণ কি আপনারা একসঙ্গে ছিলেন?'

ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করল মোনা। 'তাই তো মনে হয়, তবে নিশ্চিত করে বলতে পারব না। অবশ্য তাতে কি-ই বা এসে যায়?'

'মানে?'

'আপনি যদি ধরেই নেন আমরা মিথ্যে কথা বলছি, তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করার কোন মানেই হয় না। একটা কথা মনে রাখবেন, জাহিদ মিথ্যে কথা বলছে না। ও কখনই মিথ্যে বলে না।'

সন্দেহ নেই মহিলা বুদ্ধিমতী। নিঃশ্বাস ফেলল শাহেদ। 'বাস্তব নিয়ে আমার কারবার। আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন পুরো ব্যাপারটাই অবাস্তব, কোন যুক্তি নেই। তাছাড়া উনি যখন আচ্ছন্ন অবস্থায় কাগজে লিখেছেন, তখন তো সেটা কেউ দেখেনি। অর্থাৎ ঘটনার কোন সাক্ষী নেই। আমার কাছ থেকে শুনেও তো উনি লিখতে পারেন, আপনি তো মনে করতে পারছেন না আমি যাবার পর উনি সর্বক্ষণ আপনার সঙ্গে ছিলেন কিনা। তাছাড়া দ্বিতীয় যে কাগজটার কথা বললেন, সেটাও তিনি আপনাকে দেখাতে পারেননি। হাসনা তালুকদারের ফোন আসার পর আপনাকে উনি সেটার কথা বলেন। আগে কেন বলেননি?'

'তাহলে আমাকে বোঝান, জাহিদ কেন মিথ্যে বলবে? এতে ওর কি লাভ? তাছাড়া রুস্তম শের ছাড়া আর কে এই লোকগুলোকে এভাবে হত্যা করতে পারে? কেনই বা হত্যা করবে?'

'আমি জানি না। লোকটা হয়ত উন্মাদ, জানে না কি করছে।' চকিতে জাহিদের দিকে চাইল, 'জাহিদ সাহেব হয়ত জানেন না উনি মিথ্যে কথা বলছেন, পুরো ব্যাপারটাই তাঁর কল্পনা হতে পারে। আমি শুধু বোঝাতে চাচ্ছি, প্রমাণ ছাড়া কোন পুলিস অফিসার এই ব্যাখ্যা মেনে নেবে না।'

'কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে। আমি তো রুস্তম শেরের সঙ্গে থেকেছি, আমি জানি কিরকম ভয়ঙ্কর লোক সে। জাহিদ এই ঘটনার আগেও বহুবার চেয়েছে ওই নামে আর না লিখতে। কিন্তু কখনই ওকে ছাড়তে পারেনি। এ যেন মদ বা ড্রাগের নেশা। ক্ষতি করছে জেনেও নিরুপায়। আমি জানি ওই পুরো সময়টা কি অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছে ও।'

জাহিদ ওকে থামিয়ে দিল। 'শাহেদ সাহেব, আমি যা যা আপনাকে বলেছি, তা ভুলে যান। আপনি যদি দরকার মনে করেন, লণ্ডনে যে

ডাক্তার আমার অপারেশন করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। তখন আমি এত ছোট ছিলাম যে অপারেশন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না। ডাক্তার যদি আজ বেঁচে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই উনি কিছু বলতে পারবেন। আমার কোন সন্দেহ নেই, ওই টিউমারের সঙ্গেই পুরো ব্যাপারটা জড়িত।'

মাথা নাড়ল শাহেদ। 'দরকার হলে অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করব। আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি সরকারের চাকর, কর্তৃপক্ষের কাছে সব কাজের কৈফিয়ৎ দিতে হয়। আমি যদি আমার ওপরওয়ালাকে বলি একটা ভূত মানুষ খুন করে চলেছে, তাহলে উনি কি ভাবতে পারেন?'

জাহিদ নড়েচড়ে বসল। 'সবই বুঝলাম। আপনি প্রমাণের কথা বলছেন, ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলোই তো সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আমি আপনার সামনে বসে আছি, আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট কেমন করে ঢাকায় গেল?'

শাহেদ নিজের ওপর রেগে গেল। মনে হচ্ছে এই দম্পতি ওকে ক্রমেই কোণঠাসা করে ফেলেছে। 'আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না! আমাকে শুধু বলুন রুস্তম শের উদয় হল কোত্থেকে? আপনি কোন অদ্ভুত উপায়ে জন্ম দিয়েছেন নাকি পাখির ডিম ফুটে বেরিয়েছে!'

জাহিদও ধৈর্য হারাল। 'আমি জানি না। জানলে তো আগেই বলতাম। আমি নিজে কখনই রুস্তম শেরকে আলাদা কোন ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিন্তা করিনি। ও নিজেও আলাদা হতে চায়নি। কিন্তু যখন ওকে মেরে ফেলার চিন্তা করলাম, তখনই ও বেঁচে উঠল।' দু'হাতে মুখ ঢাকল জাহিদ।

পনেরো মিনিট পর একটা মাইক্রোবাস এসে থামল শাহেদের জিপের পেছনে। যন্ত্রপাতি নিয়ে দু'জন লোক ভেতরে এল জাহিদের টেলিফোনে আড়ি পাতার যন্ত্র ফিট করতে। একটা ফর্ম সই করতে হল

জাহিদকে সম্মতি জানিয়ে। ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোক দু'জন ওপর আর নিচের টেলিফোনের সেট দুটো নিয়ে।

আরও এক ঘন্টা পর শাহেদের কাছ থেকেই ওরা রশিদ তালুকদারের মৃত্যু সংবাদ শুনল।

মোনা ভেঙে পড়েছে। 'রুস্তম শের কি চায়? কেন এমন করছে ও? প্রতিশোধ নিচ্ছে?'

'না, মোনা। প্রতিশোধ নয়। তুমি আমি আমরা সবাই যা চাই, সেও শুধু সেটুকুই চায়। বেঁচে থাকতে চায় রুস্তম শের, মরতে চায় না। একমাত্র আমিই পারি ওকে বাঁচিয়ে তুলতে। যদি আমি ওকে বাঁচিয়ে না তুলি, তবে ও মরার আগে নিশ্চিত হবে, যেন ও একা না মরে।'

অকারণেই শিউরে উঠল শাহেদ।

বারো

শাহেদ চলে যাবার পর ওরা খেয়ে নিল, খাবার চেষ্টা করল বলাই ভাল। মোনা একটু পর পরই ফুঁপিয়ে উঠছে। এর মধ্যেই বাচ্চারা জেগে উঠেছে, ওদেরকেও খাইয়ে দিল। এর মধ্যে ইন্টেলিজেন্সের দুই ডিটেকটিভ এলেন জিজ্ঞাসাবাদ করতে। জাহিদ আর মোনা বসার ঘরে বসে একের পর এক প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলেছে। বাচ্চারা মেঝেতে বসে খেলছে।

টেকনিশিয়ানরা ফোনে যন্ত্রপাতি ফিট করে মাত্র নেমে এসেছে, সবাইকে চমকে দিয়ে ফোনটা আর্তনাদ করে উঠল। কিছুক্ষণ সবাই পাথরের মূর্তির মত যে যার জায়গায় নিশ্চল হয়ে রইল। টেকনিশিয়ান দু'জনই প্রথমে লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে মাইক্রোবাসের দিকে ছুটল, একজন ছুটতে ছুটতেই বলে উঠল, 'যাক, টেস্ট কল করতে হল না!'

ফোন বেজে যাচ্ছে। ডিটেকটিভদের একজন ইশারা করল জাহিদকে ফোন রিসিভ করতে।

কে ফোন করেছে জাহিদ ভাল করেই জানে। রিসিভারটা তুলে গর্জে উঠল রাগে, 'কি চাস তুই শুয়োরের বাচ্চা?'

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে মোনা জাহিদের দিকে, বারো বছরে এই প্রথম শুনল ও কাউকে গালাগালি করছে। ডিটেকটিভ দু'জন উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে।

'শান্ত হও, জাহিদ,' রুস্তম শেরের কণ্ঠে নির্ভেজাল আমোদ।

সত্যিই শান্ত হল জাহিদ। 'কি চাও তুমি?'

'কেন, তুমি জানো না?' বিস্ময় ফুটে উঠল রুস্তম শেরের কণ্ঠে। 'একটু আগে রশিদ তালুকদারের প্রেসের অ্যাকাউন্টেন্টকে শেষ করে এলাম। ব্যস্, আমার কাজ শেষ এটা জানাতেই তোমাকে ফোন করলাম। ওই লোকটাই আমিন ইকবালকে সব বলে দিয়েছিল,' হাসল সে। 'ওর বাসাতেই আছে দেহটা, কিছুটা বসার ঘরে, কিছুটা রান্নাঘরে,' আবার হাসল রুস্তম শের। 'যা একটা ব্যস্ত সপ্তাহ কাটালাম! তুমি একটু নিশ্চিত হবে বলেই তোমাকে জানালাম।'

'কেমন করে ভাবলে আমি নিশ্চিত হব?'

'রিল্যাক্স কর, দোস্ত! সব ঠিক হয়ে যাবে। শহরের এই গ্যাঞ্জাম আমার ভাল লাগছে না। এবার একটু বাইরে যাব।'

মিথ্যুক! মনে মনে বলে উঠল জাহিদ। মিথ্যে কথা বলছে। ওর

হাসির শব্দে জাহিদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেছে। রুস্তম শের জানে ফোনে আড়ি-পাতার যন্ত্র ফিট করা হয়েছে, শুধু সেজন্যেই ও ফোন করেছে। কাউকেই ও ভয় পায় না।

'মিথ্যে বলছিস, হারামজাদা!'

রাগ সামলাতে পারছে না জাহিদ।

'ছি ছি, বাজে কথা বলছ কেন?' আহত কণ্ঠে অভিযোগ জানাল রুস্তম শের। 'তুমি কি ভাবছ তোমাকে আমি আক্রমণ করব? না না, তা করব না। আমি তো শুধু তোমার কাজগুলোই করে দিলাম। তুমি কিরকম ভীতু লোক তা তো আমি জানি। তুমি নিজে কখনই করতে পারতে না।'

ডান হাতের তর্জনী দিয়ে কপালের সাদাটে কাটা দাগটা ঘষছে জাহিদ। প্রাণপণে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। বদমাশটা জানে যে জাহিদ বুঝতে পারছে ও মিথ্যে কথা বলছে। সে ভাল করেই জানে সব কথা রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে, টেকনিশিয়ান দু'জন শুনছে। সেজন্যেই ব্যাপারটা এত উপভোগ করছে সে। পুলিস যদি বোঝে যে সে উন্মাদ কোন লোক নয়; আর কিছু করবে না, তাহলে পাহারা ঢিলে হয়ে যাবে ধীরে ধীরে। ঠিক এটাই চাচ্ছে রুস্তম শের।

'তুমি কি জানো যে তোমাকে কবর দেবার আইডিয়াটা আমার মাথাতেই আসে?'

'কি বললে?' বিস্ময় ফুটে উঠল রুস্তম শেরের কণ্ঠে। 'কক্ষণও না! তোমাকে ভুল বোঝানো হয়েছিল, দোস্ত। আমি জানি।'

'এখনও মিথ্যে কথা বলছিস তুই!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল জাহিদ। 'আচ্ছা, আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না।' দুঃখিত শোনাল ওর কণ্ঠ। 'তবে তুমি কেন ভাবছ আমি রুস্তম শের? জানোই তো আমি রুস্তম শের নই। হয়ত পাগলা গারদের ডাক্তাররা ঠিকই বলত, আমার মাথা খারাপ।'

জাহিদেরই মাথা খারাপ হবার জোগাড়। পুলিসকেও বোঝাতে চাচ্ছে ও পলাতক মানসিক রোগী। জাহিদকে এখন আর কেউ বিশ্বাস করবে না।

'তোমার বউ আর বাচ্চাদেরকে আমার ভালবাসা দিয়ো। আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না।'

'রুস্তম শের, তুমি কি পাখিদের শব্দ পাও?' হঠাৎ করেই প্রশ্নটা করল জাহিদ।

অনেকক্ষণ কোন উত্তর এল না। জাহিদ খুশি হয়ে উঠল, এই একটা ব্যাপার রুস্তম শেরের প্ল্যানের বাইরে ঘটছে, তাই সে উত্তর দিতে দেরি করছে। 'কি হল, জবাব দিচ্ছ না কেন? তুমি কি পাখিদের শব্দ শোন?'

'তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি না, দোস্ত!' মিথ্যে বলছে না রুস্তম শের, জাহিদ বুঝতে পারল।

'না, তুমি জানো না আমি কি বলতে চাচ্ছি, তাই না?' হঠাৎ হেসে উঠল জাহিদ। 'মন দিয়ে শোন, রুস্তম শের, আমি পাখিদের শব্দ শুনি। এখনও জানি না এর অর্থ কি, কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই জানব। তখন...তখন...' কি বলবে বুঝতে পারল না জাহিদ।

'তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি না। তবে তাতে কিছু এসে যায় না। সবকিছু তো শেষই হয়ে গেল।'

খুট করে লাইনটা কেটে গেল। রিসিভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল জাহিদ। টেকনিশিয়ান দু'জন লাফাতে লাফাতে ঘরে এল, 'কাজ করছে! যন্ত্রটা কাজ করছে!' ডিটেকটিভ দু'জনকে নিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল বাইরে, চারজনের মুখেই হাসি।

'আমি জানি ওটা রুস্তম শের। অস্বীকার করছিল, কিন্তু আমার কোন সন্দেহ নেই ওটাই রুস্তম শের,' মোনার দিকে চেয়ে বলল জাহিদ।

মোনা ওর ডান হাতটা চেপে ধরল, 'আমি জানি।'

এক ঘন্টা পর শাহেদ ফোন করল। ফোনটা শেষ পর্যন্ত ট্রেস করা গেছে, কিন্তু লাভ হয়নি। শাহবাগ পোস্ট অফিসের কয়েন বক্স থেকে ফোনটা করা হয়েছিল। তবে সিঙ্গাপুরে যোগাযোগ করা হয়েছে পুরো কথোপকথনের ভয়েস-প্রিন্টের ব্যাপারে। ফিঙ্গারপ্রিন্টের মত ভয়েস প্রিন্টও আজকাল অপরাধী সনাক্তকরণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এশিয়ায় একমাত্র সিঙ্গাপুরেই আছে এই ডিভাইস। আজই সিঙ্গাপুরে পাঠানো হবে রেকর্ড করা কথোপকথন, আগামীকাল ফ্যাক্স করে জানানো হবে রেজাল্ট। এধরনের হত্যাকাণ্ড এর আগে বাংলাদেশে আর হয়নি, ফলে সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। রেডিও-টেলিভিশনে প্রতিদিনই এই ঘটনার ওপর রিপোর্ট দিচ্ছে, খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাতে এ ক'দিন একটাই শিরোনাম। সাধারণ মানুষ ভয় পেয়েছে, পুলিসের ওপর চাপ আসছে ওপর থেকে। পাগল হয়ে উঠেছে অপরাধ দমনকারী সব ক'টা সংস্থা।

পরদিন বিকেলে শাহেদ এল। হাতে একটা বাদামি খাম। ভেতর থেকে দুটো সাদা কাগজ বের হল, মাঝখানে একটা সরু রেখা এঁকেবেঁকে গেছে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। দুটো কাগজে একই রকম রেখা।

'এগুলো কি?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করে মোনা।

'ভয়েস প্রিন্টের ফটোকপি, একটু আগে সিঙ্গাপুর থেকে ফ্যাক্সে এসেছে।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল শাহেদ। 'রেকর্ড করা কণ্ঠ দুটো একই লোকের, অন্তত ভয়েস প্রিন্ট তাই বলে। দুটো প্রিন্টের মধ্যে বলতে গেলে কোন পার্থক্যই নেই।'

মাথায় বাজ পড়লেও ওরা এতটা অবাক হত না।

'কিন্তু তা কি করে হয়? রুস্তম শেরের গলার স্বর, উচ্চারণের ভঙ্গি তো একদম ভিন্ন!' মোনা মাথায় হাত দিয়ে সোফায় বসে পড়ল।

দুরু নাগাল শাহেদ। 'এর সঙ্গে গলার স্বরের কোন সম্পর্ক নেই। ভয়েস প্রিন্ট হল একধরনের কম্পিউটার জেনারেটেড গ্রাফিক যা মানুষের গলার স্বরের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে। এর সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গি বা ভাষার কোন সম্পর্ক নেই। কম্পিউটার গলার স্বর থেকে "পিচ" আর "টোন" গুলো আলাদা করে নিয়ে সিন্থেসাইজ করে যকে সাধারণ ভাষায় বলে "হেড ভয়েস"। তারপর একইভাবে "টিম্বার" আর "রেজোন্যান্স" গুলো আলাদা করে নেয়, যাকে বলা হয় "চেস্ট" বা "গাট ভয়েস"। ফিঙ্গারপ্রিন্টের মত ভয়েস প্রিন্টও কখনও একজনের সঙ্গে অন্যজনেরটা মেলে না।' একটু হাসল ও। 'আমাকে আবার জ্ঞানী-গুণী কিছু ভেবে বসবেন না, এসব আজই বই পড়ে জেনেছি।'

মৃদু হাসল জাহিদ। 'আমি জানি আপনি কি ভাবছেন। আমিই স্বপন শেখ সেজে গলা বিকৃত করে একটা ক্যাসেটে কথা টেপ করেছি মাঝখানে প্রয়োজনমত জায়গা খালি রেখে। তারপর কাউকে দিয়ে কয়েন বক্স থেকে ফোন করিয়ে ক্যাসেটটা চালিয়ে দিতে বলেছি। খালি জায়গাগুলোতে আমি কথা বলেছি, আগে থেকে প্র্যাকটিস করায় উল্টাপাল্টা হয়নি, তাই না?'

উত্তর দেবার বদলে স্থির চোখে চেয়ে রইল শাহেদ।

সেরাতেই পতেঙ্গায় ফিরে গেল শাহেদ। অফিসে গিয়ে প্রথমেই লন্ডনের হসপিটালে ফোন করে জাহিদের ডাক্তারের খোঁজ লাগাল, হসপিটালের ফোন নাম্বার বের করতেই ঘণ্টা খানেক লেগে গেল। অবশেষে রিসেপশনিস্টের গলা ভেসে এল ওপার থেকে। ভাগ্য ভাল ডাক্তারের নাম বলেই সে চিনতে পেরেছে, কিন্তু তিনি রিটায়ার করেছেন বহু বছর আগে এবং বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। ডাক্তারের বাসার ফোন নাম্বার সে জানে না, জানলেও সেটা কাউকে বলা নিয়ম বিরুদ্ধ। শাহেদ তখন ওকে বলল ও নিজে একজন পুলিস অফিসার, তদন্তের কাজে

ডাক্তারের সাথে কথা বলা খুবই দরকার। রিসেপশনিস্ট একটু ভেবে নিয়ে আধ ঘন্টা পরে আবার ফোন করতে বলল।

আধ ঘন্টা পর রিসেপশনিস্টের মাধ্যমে জানা গেল ডাক্তার ম্যাকলিন লণ্ডনের বাইরে কোথাও বেড়াতে গেছেন, কবে ফিরবেন তা কেউ জানে না।

দু'দিন পর আবার ফোন করল রুস্তম শেয়। জাহিদ হাসান তখন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ঠিক বাইরে একটা ফার্মেসিতে গেছে মাথা ব্যথার ওষুধ কিনতে। হাঁটতে গেলে বেশ দূর হয়ে যায়, তাই ড্রাইভ করে গেল ও। পাহারারত গার্ড দু'জনের একজন ওর সঙ্গে গাড়িতে উঠল, বাকি জন বাড়ির সামনে পার্ক করা জিপে বসে রইল। জুন মাসের আট তারিখ। সন্ধে সাড়ে ছ'টা।

দোকানের কাউন্টারে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠতেই চমকে উঠল জাহিদ, ও জানে কে ফোন করেছে। দোকানের মালিক চশমা পরা বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে জাহিদের পরিচয় আছে। তিনিই ফোন রিসিভ করলেন, তারপর একটু অবাক হয়ে জাহিদের দিকে তাকালেন, 'জাহিদ সাহেব, আপনার ফোন।'

কেন যেন আগেরবারের মত ভয় করল না জাহিদের। রিসিভারটা তুলে নিয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই বলল, 'রুস্তম শেয়?'

'হ্যালো, জাহিদ।'

'আবার কি চাও?'

'তুমি তো জানো কি চাই। জানো না? লুকোচুরি খেলার সময় নেই, স্বীকার কর তুমি জানো।'

'তা-ও তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই আমি।'

দোকানের মালিক এবং দু'একজন খদ্দের উঁকি ঝুঁকি মারছে, কান খাড়া করে রেখেছে এদিকে। কাউকে ফোনে কথা বলতে দেখলে

সাধারণ মানুষ যা করে। জাহিদকে সবাই চেনে, ছোট্ট এই শহরটাতে ক'দিন ধরে নানারকম গুজব শোনা যাচ্ছে জাহিদকে ঘিরে—ওর প্রতি আলাদা কৌতূহল সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু জাহিদ কারও দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না, পুরো মনোযোগ ওর টেলিফোনে। সমস্ত ইচ্ছেশক্তি ব্যবহার করছে কোনভাবে তারের ওপাশে রুস্তম শেরের কাছে পৌঁছাবার।

শব্দ করে হাসল রুস্তম শের। 'নতুন একটা বই লেখার সময় হয়েছে। রুস্তম শেরের নামে।'

'তা আর হয় না,' দাঁতে দাঁত চাপল জাহিদ।

'খবরদার!' ধমকে উঠল রুস্তম শের।

'ভয় দেখিয়ো না, রুস্তম শের। তুমি এখন মৃত।' সমান তালে গলা উঁচু করছে জাহিদ, খেয়াল নেই আশেপাশের লোকজন পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করছে।

'শাট আপ! বাজে কথা বলবে না!' রুস্তম শেরের গলায় আগের মত জোর নেই, কিছুটা ক্লান্ত শোনাচ্ছে যেন!

'কি ব্যাপার, রুস্তম শের, আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরেছে মনে হচ্ছে?'

কিছুক্ষণ কোন উত্তর ভেসে এল না। জাহিদ খুশি হয়ে উঠল। কোন কারণে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে রুস্তম শের, জবাব দিতে ইতস্তত করছে। কি এমন বলেছে ও?

অনেকক্ষণ পর রুস্তম শের আস্তে আস্তে বলল, 'মন দিয়ে শোন, দোস্ত, তোমাকে এক সপ্তাহ সময় দিচ্ছি। চালাকি করার চেষ্টা কোরো না, তুমি জানো তাতে তোমার কোন লাভ হবে না।' ছাড়া ছাড়া অনিশ্চিত কণ্ঠস্বর।

হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই রুস্তম শের কোন কারণে চিন্তিত।

'আমি তোমার সঙ্গে কোন চালাকি করিনি,' খুশি চেপে রাখতে পারছে না জাহিদ। কখনও কখনও রুস্তম শেরও তাহলে অসহায় হতে

পারে!

'ঠিক এক সপ্তাহ,' অস্থির ভাবে বলল রুস্তম শের। 'এর মধ্যে অন্তত ত্রিশ পৃষ্ঠা লিখে রাখবে। নাহলে কি হবে তা তো জানোই।' চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, 'প্রথমে যাবে তোমার বাচ্চা দুটো। এরপর তোমার বউ। তারপর তোমার পালা, দোস্ত।'

'তুমি পাখিদের কথা কিছু জানো না, তাই না?' ধীরে ধীরে নরম স্বরে প্রশ্ন করল জাহিদ।

'কি আবোল-তাবোল বকছ! এক সপ্তাহ, মনে থাকে যেন!'

'ইকবাল আমিন আর হাসনা তালুকদারের ঘরের দেয়ালে কি লিখেছিলে, মনে আছে?'

'কি বলছ কিছু বুঝতে পারছি না,' ধৈর্য হারাল রুস্তম শের।

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি,' পাশবিক এক ধরনের আনন্দ বোধ করছে জাহিদ কথাগুলো ওকে বলতে পেরে। 'কারণ দেয়ালের ওই লেখাগুলো তুমি লেখনি, লিখেছি আমি। আমার কোন অংশ তখন সেখানেই ছিল, তোমাকে পাহারা দিচ্ছিল। আমার মনে হয় চড়ুই পাখিরা শুধুই আমার, তুমি ওদের কথা কিছুই জানো না। কিছু করার আগে চিন্তা কোরো, রুস্তম শের, ভাল করে চিন্তা কোরো।'

'বাচ্চা আর বউয়ের কথা চিন্তা করো তুমি। একটা সপ্তাহ আছে তোমার হাতে।' কিছুক্ষণ চিন্তা করে আবার বলল, 'আমি মরতে চাই না, দোস্ত।'

লাইনটা কেটে গেল।

রিসিভারটা ক্রেডলের ওপর রেখে দিতে দিতে জাহিদ বিড়বিড় করে উঠল, 'শা-লা।'

তেরো

বাড়ির সামনে দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা পুলিসী পাহারা। প্রতিবেশীরা কানাকানি করছে। ইদানীংকার হত্যাকাণ্ডগুলির সঙ্গে জাহিদকে জড়িয়ে খবরের কাগজে প্রতিদিন নতুন নতুন গুজবের জন্ম হচ্ছে। প্রথম দু'একদিন পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরা ফোনে কৌতূহল প্রকাশ করেছে, আজকাল জাহিদের বাসায় কোন ফোন আসে না, ভুলেও ওর বাসার দিকে কেউ পা বাড়ায় না। ঈদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ, তাই জাহিদের সুবিধাই হয়েছে। ডিপার্টমেন্টে গিয়ে সহকর্মীদের অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলার দরকার পড়ছে না। প্রতিবেশীরা অনেকে ঈদ উপলক্ষে ঢাকা বা দেশের বাড়ি চলে গেছে, রাস্তাঘাটেও তাই কারও সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা কম।

ঘরের কাজ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে মোনা। দু'দিন আগে পিচ্চির বাবা এসে পিচ্চিকে ফরিদপুরে দেশের বাড়ি নিয়ে গেছে ঈদ করতে। যমজ দুই বাচ্চা সামলে রান্না-বান্না আর ঘরের কাজ করা চাট্টিখানি কথা নয়। ঈদে ওদেরও যশোর যাবার কথা ছিল। যাওয়া হল না বলে তো পিচ্চির ঈদ মাটি করা যায় না, ওকে যেতে দিতেই হয়েছে। জাহিদ বাইরে বের হয় না বলে রক্ষা, ও যথেষ্ট সাহায্য করছে মোনাকে এ ক'দিন।

জাহিদ বড় অস্থির হয়ে আছে। রূপক আর রুমকির দিকে

তাকালেই বুকটা মুচড়ে ওঠে। কোন ভাবেই ওদের কোন ক্ষতি হতে দিতে পারে না ও। এতগুলো বছরের সঙ্গিনী মোনা, বড় বড় বাদাম চোখ, হালকা বাদামি মসৃণ ত্বক, লম্বা চুলের রাশি, ছিপছিপে আকর্ষণীয় দেহ—জাহিদের প্রিয়তমা স্ত্রী! স্বপ্নে দেখা ওর পচন ধরা মৃতদেহের কথা মনে হলে শরীরের রক্তস্রোত যেন থেমে আসে। নিজের অজ্ঞাতে পেন্সিল নিয়ে লিখতে বসে গিয়েছিল একদিন, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলেছে। কিছুতেই তা হয় না, আত্মহত্যা করা হবে তাহলে। কিন্তু না লিখলেও মরতে হবে। আর মাত্র ক'টা দিন!

ক'দিন হল রূপক আর রুমকি দেয়াল ধরে ধরে হাঁটতে শিখেছে। তাই সবসময় কড়া নজর রাখতে হয়। ওদের দু'জনকে বসার ঘরে মেঝেতে খেলতে বসিয়ে দিয়ে মোনা রান্নাঘরে কাজ করছে। জাহিদ সোফায় বসে পেপার পড়তে পড়তে ওদেরকে পাহারা দিচ্ছে। বাচ্চা দুটো সবসময়ই হাসিখুশি, তবে একটুও চঞ্চল নয়। নিজেদের নিয়েই মেতে আছে, আশেপাশের কারও প্রতি কোন কৌতূহল দেখায় না। অবোধ্য এক ভাষায় প্রায়ই নিজেদের মধ্যে ওরা কথা বলে, জাহিদের মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যিই ওরা পরস্পরের কথা বুঝতে পারে। শুধু যমজ বলেই কি ওদের মধ্যে এই নৈকট্য গড়ে উঠেছে?

মোনা এক কাপ চা হাতে নিয়ে আর নিজের কাপে চুমুক দিতে দিতে এসে বসল, চুলায় রান্না চাপিয়ে এসেছে। রূপক মায়ের হাঁটু ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে খেলনা ভালুকটাকে বাঁ হাতে নিয়ে। রুমকি কৌতূহলী চোখে চেয়ে আছে ভাইয়ের দিকে, ডান হাতের বুড়ো আঙুল মুখে পুরে চুষছে।

মোনা কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই হঠাৎ করে রূপক ডান হাতে ওর চায়ের কাপ আঁকড়ে ধরল। চা ছলকে পড়ে ভিজিয়ে দিল রূপকের পোশাক। ভাগ্য ভাল চা'টা খুব একটা গরম ছিল না। কিন্তু মোনা আর্তনাদ করে আঁৎকে ওঠায় রূপক ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু

করেছে। সঙ্গে সঙ্গে রুমকিও তান ধরল।

রূপককে কোলে তুলে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখল মোনা। না, কোথাও লাগেনি। চোখ ঘুরিয়ে হতাশার ভঙ্গি করে জাহিদের উদ্দেশ্যে বলল, 'রুমকির দিকে নজর রাখ, ওর কাপড় বদলে দিচ্ছি এক মিনিটে।' বলে রূপককে নিয়ে ওপরে চলে গেল মোনা।

রুমকি জলভরা চোখে ওদের গমনপথের দিকে চেয়ে আছে। যাক বাবা, কান্না বন্ধ করেছে। জাহিদ নিশ্চিন্তে পেপারটা আবার টেনে নিল।

রুমকি লাল গাড়িটা নিয়ে খেলছে, মুখে দ্রাম-দ্রাম শব্দ করছে। জাহিদ উঠে বুক শেলফ থেকে একটা বই নিল, পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখল রুমকি দোতলায় যাবার সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। ইতিমধ্যেই দুটো সিঁড়ি পার হয়ে গেছে, বাঁ হাতে রেলিং ধরে আছে, ডান হাত ওপরের সিঁড়িতে।

জাহিদ চেঁচিয়ে উঠল, 'রুমকি!'

পাশ ফিরে জাহিদকে দেখে দুহাত বাড়িয়ে দিল রুমকি, হাসছে। ডান পা'টা চতুর্থ ধাপে, বাঁ পা তৃতীয় ধাপে, রেলিং ছেড়ে দেয়াতে একটু একটু কাঁপছে পা দুটো।

প্রাণপণে ছুটল জাহিদ, কিন্তু ইতিমধ্যেই গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে রুমকি। শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে ওকে ধরার চেষ্টা করল জাহিদ, কিন্তু পারল না।

'খোদা!' ছোঁ মেরে ওকে তুলে নিল জাহিদ। 'লাগেনি তো, বাবু সোনা!'

গগনবিদারী চিৎকার করে উঠল রুমকি, তারপর কেমন যেন লাল হয়ে গেল ওর ফুলের মত নিষ্পাপ মুখটা। প্রাণপণে কাঁদতে চেষ্টা করছে, কিন্তু কোন আওয়াজ বের হচ্ছে না। প্রথমবার ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, এখন কাঁদতে চেষ্টা করছে ব্যথায়।

'জাহিদ!' রূপককে কোলে করে ছুটতে ছুটতে নেমে আসছে মোনা। 'কি হয়েছে?'

লালচে মুখটা বেগুনি হয়ে গেছে, চোখ দুটো বন্ধ, এখনও শব্দ করতে পারছে না রুমকি। হাত পাগুলো টান টান হয়ে আছে, দু'হাত মুঠো করা।

ওকি অজ্ঞান হয়ে গেছে? ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল জাহিদের। দু'হাতে রুমকির দেহটা ঝাঁকাচ্ছে আর চিৎকার করছে, 'এই তো, বাবু সোনা! কথা বল, মা মণি আমার!'

হঠাৎ করে রুমকির দেহটা কাঁপতে শুরু করল, তারপর আগের বারের চেয়েও জোরাল কণ্ঠে কেঁদে উঠল রুমকি। নিঃশ্বাস ফেলে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল জাহিদ। পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে সন্দেহ নেই। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র, অথচ মনে হচ্ছে যেন লম্বা সময় কেটে গেছে।

মোনা পাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। 'ব্যথা পায়নি তো?'

'ঠিক হয়ে যাবে। উহ্! যা ভয় পেয়েছিলাম!' জাহিদ চোখ বন্ধ করল, বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা এখনও লাফাচ্ছে।

রুমকিকে জাহিদের কোল থেকে নিয়ে রূপককে ~~ দিয়েছে ওর কোলে মোনা। 'তোমাকে না বললাম ওর দিকে নজর রাখতে!' মোনার কণ্ঠে বিরক্তি ঝরে পড়ছে, রুমকির কান্না থামাবার জন্যে শরীরটা এপাশ-ওপাশ দোলাচ্ছে। রূপকও কান্না শুরু করেছে।

'বই নেবার জন্যে যেই শেলফের কাছে গেছি...কখন যেন ও সিঁড়ির দিকে রওনা হয়েছে।' একটু রাগ হল জাহিদের, ও কি জানত রুমকি এমন করবে? 'রূপক যেমন তোমার চায়ের কাপে ঝাপটা দিয়েছে, রুমকিও দু'সেকেণ্ডের মধ্যেই কেমন করে যেন সিঁড়িতে চলে গেছে। ওর মাথাটা ভাল করে দেখ তো!'

দু'জনে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল, মাথায় লাগেনি। শুধু ডান

উরুতে লালচে অর্ধবৃত্তাকার একটা দাগ, পড়ার সময় সিঁড়ির ধারাল প্রান্তে লেগেছে। গুরুতর কিছু হয়নি, খোদার কাছে হাজার শোকর।

রুমকির কান্না আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল, রূপকও ওর দেখাদেখি কান্না বন্ধ করেছে। রূপক গোল গোল হাত বাড়িয়ে বোনের ফ্রক চেপে ধরল। রুমকি ওর দিকে চাইল। রূপক কি যেন বলল, রুমকি আবার তার উত্তর দিল। চোখে জল নিয়ে দু'ভাইবোন হাসতে লাগল দেবশিশুর মত।

ঝুঁকে পড়ে রুমকির নাকে চুমু খেল জাহিদ।

সে রাতে ওরা ঘুমিয়ে পরার পর কটে শুইয়ে দিল মোনা। রুমকির ডান পায়ের লালচে দাগটা গাঢ় বেগুনীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

'জাহিদ?' মোনা ডাকল, 'একটু এদিকে এস তো!'

শুয়ে শুয়ে পড়ছিল জাহিদ। বই বন্ধ করে উঠে এল। মোনা ইশারায় বাচ্চাদের ঘুমন্ত দেহ দুটি দেখাল। একবার চাইতেই জাহিদ বুঝতে পারল মোনা কি দেখাতে চাইছে। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বাচ্চারা। রূপকের ডান পায়ের একই জায়গায় ঠিক রুমকির মত একটা দাগ, বেগুনী, অর্ধবৃত্তাকার। অথচ রূপক আজ কোথাও ব্যথা পায়নি।

'কি অদ্ভুত, তাই না?' ফিসফিস করে বলল মোনা।

'হ্যাঁ, অদ্ভুত। তবে অসাধারণ কিছু না।' কেমন যেন আচ্ছন্নের মত উত্তর দিল জাহিদ।

চকিতে ওর দিকে তাকাল মোনা, 'তোমার আবার কি হল?'

'কই? কিচ্ছু না তো!' কিভাবে শান্ত হয়ে কথা বলছে ও ভাবতে গিয়ে নিজেই অবাক হয়ে গেল জাহিদ। হঠাৎ করে ওর মগজের ভেতর তৃতীয় নয়নটা জেগে উঠেছে, দিনের আলোর মত পরিষ্কার দেখাচ্ছে চারদিক। হ্যাঁ, পাখিদের আবির্ভাবের কারণ কিছুটা হলেও বুঝতে পারছে ও। রূপকের ডান পায়ের সান্ত্বনাচিহ্নটা ওর চোখ খুলে

দিয়েছে। ব্যথা পেয়েছে রুমকি, অথচ রূপকের পায়েও সেই আঘাতের চিহ্ন। 'ব্যথা পর্যন্ত ওরা ভাগাভাগি করে ভোগ করে। কি আশ্চর্য, তাই না?' অস্ফুটে বলল জাহিদ।

মোনা ঘুমিয়ে পড়লে বিছানা ছেড়ে স্টাডিতে চলে এল জাহিদ। কিছুতেই ঘুম আসছে না। যমজ ভাইবোনদের মধ্যে আলাদা একধরনের বন্ধন থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। একজন আরেকজনের আনন্দ বা ব্যথা অনুভব করে—এমন ঘটনা মোটেই অসাধারণ নয়। লাইফ ম্যাগাজিনে এর ওপরে লেখা একটা প্রবন্ধ পড়েছিল জাহিদ, তাতে অদ্ভুত সব রিসার্চের কথা আছে। আমেরিকার শিকাগোর দুই যমজ বোনের একজন পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলে, অন্যজন তখন হাইওয়েতে গাড়ি চালাচ্ছে। হঠাৎ ওই একই সময়ে পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা করতে শুরু করায় গাড়ি থামাতে বাধ্য হয় সে, অথচ বোনের পা ভেঙেছে তা কোনভাবেই ওর জানার কথা নয়। যমজ দুই ভাই জন্মের পরপরই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রাপ্তবয়েসে দু'জন মিলিত হলে দেখা গেল তারা দু'জন একই বছর একই দিনে বিয়ে করেছে; একই নামের দুই মহিলাকে দুই ভাই-ই তাদের প্রথম সন্তানের নাম রেখেছে রবার্ট যারা একই বছরের একই মাসে জন্মেছে। অদ্ভুত নয়? অথচ এর পেছনে যুক্তিগ্রাহ্য কোন কারণ নেই।

রূপক নিশ্চয়ই ওর পায়ের দাগটার কথা জানে না। কিন্তু ওখানে ব্যথা করছে ঠিকই। অনেকটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ভয়েস প্রিন্টের মত নয়? রুস্তম শের পাখিদের কথা জানে না, কিন্তু জাহিদ জানে। রুস্তম শের পাখিদের কথা জানে না, কিন্তু জানে ওর একটা দুর্বল জায়গা আছে। ঠিক রূপক যেমন দাগটার কথা জানে না, শুধু ব্যথাটা টের পাচ্ছে। জাহিদ ওর দাগটায় আলত করে আঙুল বুলিয়েছিল, ঘুমের মধ্যেই রূপক কেঁপে উঠেছিল। রুমকির চেয়ে ওর ব্যথা কম নয়। পাখিগুলো

যদি শুধু জাহিদেরই হয়, তাহলে আমিন ইকবাল আর হাসনা আপার বাসার দেয়ালে লেখা কথাগুলি রুস্তম শের নয়, জাহিদই লিখেছে—রুস্তম শেরের হাতে। ঠিক যেভাবে জাহিদের হাতে রুস্তম শের লীফার রশিদের উল্টোদিকে লিখেছিল। কিন্তু রুস্তম শের কি ওর উপস্থিতি টের পায়? নিশ্চয়ই পায়। টেকনিশিয়ানরা টেলিফোনে আড়িপাতা যন্ত্র বসানর কাজ শেষ করা মাত্র ফোন করেছিল ও, সে তো জেনেশুনেই। আবার যখন নিভৃতে কথা বলতে চেয়েছে, তখন ফার্মেসীতে ফোন করেছে। ও জানত জাহিদ ফার্মেসীতে গেছে, আর ওখানে ফোন আছে। প্রথমবার ও ফোন করেছিল পুলিসকে বোঝাতে যে ও জাহিদকে খুন করতে চায় না। তাহলে ওরা পাহারায় ঢিল দেবে।

টাইপরাইটারে খটাখট শব্দ তুলে জাহিদ লিখল, 'পাখিরা আবার উড়ছে'। কিন্তু কেমন করে ও পাখিদের ওড়াবে? কোন সন্দেহ নেই, পাখিরা উড়তে চায় বলেই ওর কাছে বার বার ফিরে আসছে। কিন্তু কিভাবে ওদের ওড়াতে হয়?

মুখ তুলে অন্ধকার জানালার দিকে তাকাল জাহিদ। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। জানালার ডিজাইন করা গ্রিলে একটা চড়ুই পাখি বসে আছে। কালো পুঁতির মত জ্বলজ্বলে চোখ দুটো একদৃষ্টে চেয়ে আছে জাহিদের দিকে। আর একটা চড়ুই এসে বসল তার ঠিক পাশে, জাহিদের দিকে চেয়ে আছে এটাও। উড়ে এল আরও একটা। ভাল করে তাকাতে জাহিদ দেখতে পেল ছোট্ট বাগানের প্রান্তে দেয়ালের ওপর বসে আছে এক সারি চড়ুই পাখি। কাপড় শুকাবার দড়িতেও সার বেঁধে বসে আছে গোটা দশেক। ধীরে ধীরে বাড়ছে ওদের সংখ্যা।

'হায় আল্লাহ্! এ যে সত্যিকারের পাখি!' বিড়বিড় করে উঠল জাহিদ নিজের অজান্তেই, 'আমার কল্পনা নয় ওরা সত্যিকারের পাখি!'

স্বপ্নেও ও যা কল্পনা করেনি, তাই ঘটছে। পাখিরা ওর মনের গহনে নয়, বাস্তবে বিচরণ করছে। সত্যিকারের চড়ুই পাখি! একে একে জড়ো

হচ্ছে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে জাহিদের দিকে। আদেশের প্রতীক্ষায়?

কোথায় তুমি, রুস্তম শের? কেন তোমাকে আমি অনুভব করতে পারছি না!

হঠাৎ অদৃশ্য কোন সঙ্কেত পেয়ে একসঙ্গে পাখা মেলল সবগুলো পাখি, পাখা ঝাপটানর খসখসে শব্দ তুলে মিলিয়ে গেল রাতের তারাজ্বলা আকাশে।

একাগ্রমনে রুস্তম শেরকে খুঁজতে লাগল জাহিদ। শুনেছে সাদা কাগজে পেন্সিল ধরে প্ল্যানচেট করে বিশ্বাসী লোকেরা, পরলোকের আত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে। একবার চেষ্টা করে দেখলে হয় না? একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে সাদা কাগজ বিছাল সামনের টেবিলে, তারপর দু'চোখ বন্ধ করে খুলল ওর তৃতীয় নয়ন। কোথায় তুমি, রুস্তম শের?

হঠাৎ করে পেন্সিল ধরা হাতটা ওপরে উঠে গেল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছুরির মত নেমে এল সেটা টেবিলে বিছানো ডান হাতের পিঠ লক্ষ্য করে। রুস্তম শের!

বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝে চামড়া ভেদ করে মাংসে ঢুকে গেল পেন্সিলটা। তারপর নিশ্চল হয়ে গেল।

পেছনে মাথা হেলিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বেরিয়ে আসা আর্তনাদটাকে অনেক কষ্টে ভেতরে পাঠিয়ে দিল জাহিদ। একটু সামলে নিয়ে দম বন্ধ করে টান দিয়ে পেন্সিলটাকে বের করে আনল। ব্যথায় ফুঁপিয়ে উঠেছে নিজের অজান্তেই।

শোবার ঘরের বাথরুমে গেলে মোনার ঘুম ভেঙে যেতে পারে, তাই দৌড়ে নিচের বাথরুমে এল জাহিদ। বেসিনের কল খুলে আহত হাতটা পানির নিচে ধরে রাখল। আগুনের মত জ্বলছে ক্ষতটা। তাজা রক্ত মিশে যাচ্ছে পানির ধারায়। পাঁচ মিনিট পর তাকের ওপর থেকে ডেটল নামিয়ে বহু কষ্টে একহাতে বোতলের মুখ খুলল। তুলো ওপরের

বাথরুমে, এখানে নেই। বোতলটা কাত করে ঢেলে দিল ক্ষতের ওপর, ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল। তারপর বাঁ হাতে ক্ষতটা চেপে ধরে থাকল কিছুক্ষণ যাতে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। কি প্রচণ্ড ব্যথা!

কি হয়ে গেল এটা? কোন সন্দেহ নেই কুগুম শের টের পেয়ে গেছে হার্ডিন ওকে খুঁজছে। নাক গলানো পছন্দ করে না সে, তাই সাবধান করে দিয়েছে যাতে দ্বিতীয়বার চেষ্টা না করে।

ধীরে ধীরে ব্যথাটা সহ্য হয়ে এল। ভয়টাও কেটে গেল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে বসার ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। অন্ধকারে পুলিসের জিপটাকে চিনতে ভুল হয় না, ভেতরে নড়াচড়া করছে গার্ড দু'জন। ওরা কি পাখিগুলোকে দেখেছে? অবশ্য এখান থেকে বাড়ির পিছন দিকটা দেখা যাবার কথা নয়। তবুও ওরা ওড়ার সময় দেখা যাবার কথা।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল হার্ডিন। গার্ড দু'জন জিপ থেকে বেরিয়ে দৌড়ে আসছে।

'ও ব্যাটা কি আবার ফোন করেছে, স্যার?' ছুটতে ছুটতেই প্রশ্ন করল লম্বা জন।

'না না, সেসব কিছু নয়,' একটু অপ্রস্তুত হল হার্ডিন। 'স্টাডিতে বসে কাজ করছিলাম, হঠাৎ করে দেখলাম ওপাশের মাঠের ওপর এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে। আপনারা কি দেখেছেন?'

সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে, জ্বলন্ত সিগারেট সমেত হাতটা পিছনে লুকিয়ে সহাস্যে বলল সে, 'হ্যাঁ, স্যার। দেখেছি, শব্দও শুনেছি।' ডান হাত তুলে পেছন দিকটা দেখাল, 'ওই দিকে উড়ে গেছে, অনেকগুলো হবে—প্রায় হাজার খানেক। তাই না?' বলে সমর্থনের আশায় সঙ্গীর দিকে তাকাল।

ওর সঙ্গী উপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল। 'রাতের বেলা তো কখনও এভাবে ঝাঁক বেঁধে পাখি ওড়ে না। আমরাও এই ব্যাপারটা নিয়ে

ভাবছিলাম

আলোচনা করছিলাম। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমান, স্যার, কোন ভয় নেই। আমরা আছি।'

ঘরে চলে এল জাহিদ।

যাক, স্বপ্ন নয়। সত্যিই পাখিগুলো এসেছিল।

যদি কোনভাবে রুস্তম শেরের চিন্তাপথে ঢুকে পড়া যেত! ও যেভাবে ঢুকে পড়ে জাহিদের মধ্যে। ও যেভাবে জাহিদকে প্রভাবিত করে, ঠিক সেভাবে যদি জাহিদ প্রভাব খাটিয়ে ওকে কব্জা করতে পারত। অবশ্য একবার চেষ্টা করে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, দ্বিতীয়বার পেন্সিলের চেয়েও কার্যকরী কোন অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে রুস্তম শের। কিন্তু জাহিদকে কি সত্যিই ও খুন করবে? ওকে যে রুস্তম শেরের খুব দরকার!

রান্নাঘরের দরজা খুলে পিছনের এক ফালি বাগানে বেরিয়ে এল জাহিদ। কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। তবে একটু খুঁজতেই পেয়ে গেল যা খুঁজছিল তা। কাপড় শুকাবার তারের নিচে, আর দেয়ালের গায়ে পাখির বিষ্ঠা, এখনও শুকোয়নি। ঘাসের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দুটো চড়ুই পাখির প্রাণহীন দেহ, পাগুলো আকাশের দিকে টানটান।

আর কোন সন্দেহ নেই, চোখের ভুল নয়, পাখিগুলো সত্যিকারের পাখি। হঠাৎ ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল জাহিদের। কেন এসেছে ওরা? কোনভাবে অতিপ্রাকৃত একটা শক্তি পেয়েছে সে, কিন্তু সেটা নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতাই জাহিদের নেই। কেন এসব ঘটছে তা-ও বুঝতে পারছে না ও। ছোট ছেলের মত ভয়ে শিউড়ে উঠছে জাহিদ ক্ষণে ক্ষণে।

এক রাশ ক্লান্তি নিয়ে ঘুম ভেঙে উঠে বসল রুস্তম শের। দুঃস্বপ্নের মত কেটেছে রাতটা। মনে হচ্ছে ঘুমায়নি, পরিশ্রম করেছে সারারাত।

মাত্র ঘুমটা এসেছিল, হঠাৎ করে ও স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। জাহিদ যেন ওর সাথে একই বিছানায় শুয়ে আছে, গল্প করছে দু'জন বিভোর হয়ে। আলো বন্ধ করে ঘুমাবার আগে দু'ভাই যেমন রোজকারমত কথাবার্তা বলে, ঠিক তেমন। আস্তে আস্তে ঘুমটা ভাঙতে শুরু করে, জাহিদ কেন বার বার ওকে পাখিদের কথা জিজ্ঞেস করছে? মনে হচ্ছিল কেউ যেন ওকে বন্দী করে ফেলতে চাইছে। আধো জাগরণেই প্রতিরোধের ব্যূহ তুলে দিল ও, জাহিদ! জাহিদ ঢুকে পড়েছে ওর মধ্যে! নিশিতে পাওয়া মানুষের মত বিছানা ছেড়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল রুস্তম শের, ঘুমটা তখনও পুরোপুরি ভাঙেনি। কিন্তু মর্মে মর্মে ঠিকই অনুভব করছে জাহিদকে থামাতে হবে, যে করেই হোক থামাতে হবে। বাদামি রঙের ইকোনো পেনটা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে নামিয়ে আনল ডান হাতের পিঠে। অসম্ভব ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল, ঘুমটা ভেঙে গেছে পুরোপুরি। এতদূর থেকেও স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে ও জাহিদের কষ্ট, আঘাতটা সামলে নেবার জন্যে ওর অমানুষিক প্রচেষ্টা। না, জাহিদকে এখন হত্যা করা যাবে না। জাহিদ ওকে বেঁচে থাকার পথগুলি শিখিয়ে না দেয়া পর্যন্ত কিছুতেই ওর মৃত্যু

হতে পারে না।

আস্তে আস্তে জাহিদের আর্তনাদ মিলিয়ে গেল। হাঁপাচ্ছে রুস্তম শের। এরপর বাকি রাতটা ঘুম ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে। ভয়ে, আশঙ্কায়।

সেগুন বাগিচার এই ছোট্ট একতলা বাড়িটা ভাড়া করেছে রুস্তম শের। একটা চৌকি আর টেবিল-চেয়ার কিনে এনেছে, এছাড়া সারা বাড়িতে আর কোন আসবাব নেই। প্রথমদিনেই মোড়ের স্টেশনারি দোকান থেকে এক দিস্তা সাদা কাগজ আর ছ'টা ইকোনো পেন কিনে এনেছিল। ইচ্ছে করেই এইচ-বি পেন্সিল কেনেনি। ওটা জাহিদের উপহার। রুস্তম শের এখন নতুনভাবে শুরু করতে চায়। তাই এই ছোট্ট বৈচিত্র্য।

প্রতিদিনই ও কাগজ-কলম নিয়ে লেখার চেষ্টা করে। ঠিক যেভাবে জাহিদ লেখে। কিন্তু আজ পর্যন্ত নিজের নামটা ছাড়া আর কিছু লিখতে পারেনি, নিজে থেকে লেখার ক্ষমতা ওর নেই। এই হতাশাই প্রতিদিন ওকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে। জাহিদের কাছ থেকে যে করেই হোক শিখে নিতে হবে লেখার নিয়মগুলি, অন্তত নিজের অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে।

বিছানা ছেড়ে বাথরুমের দিকে এগুলো রুস্তম শের, ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়েছে। বেসিনের ওপর টাঙানো চৌকো আয়নার মুখোমুখি দাঁড়াল। কদিন আগে পর্যন্তও আয়নায় তারুণ্যে ভরপুর সুদর্শন একটা মুখ দেখত ও। হাজার মানুষের ভিড়ে চোখে পড়ার মত পৌরুষদীপ্ত আকর্ষণীয় চেহারা ছিল ওর। এই চেহারার সঙ্গে বলতে গেলে কোন মিলই নেই। মাত্র ক'দিনেই কি অদ্ভুত পরিবর্তন!

আয়নায় যে মুখটা দেখা যাচ্ছে, তার চোখের চার পাশে বুড়ো শরীরের মত অসংখ্য বলিরেখা, মুখের চামড়া ঢিলে আর খসখসে। অর্ধেক চুল পড়ে গেছে, তালুতে ঈষৎ টাকের আভাস। হাওয়া ছাড়া বেলুনের মত কুঁচকে গেছে সমস্ত শরীরের ত্বক। আজ মনে হচ্ছে

দাঁতগুলোও নড়ছে, জ্বালা করছে মাড়ি। হাঁ করে দেখল মাড়ীতে ঘা হয়েছে, লাল হয়ে আছে, মাঝে মাঝে হলুদ পুঁজের আভাস।

গত পরশুদিন ডান হাতের কনুইতে লালচে দগদগে একটা ঘা আবিষ্কার করেছে, নতুন টাকার মত আকৃতি, চারপাশে সাদা মরা চামড়া। আজ সকালে অনেকটা বড় হয়ে গেছে ঘা-টা। ঘাড়ের পাশে আরও একটা ঘা দেখা যাচ্ছে ঠিক একই রকম। ডান গালের চিক বোনের ওপর লালচে আভা ফুটে উঠেছে, চুলকাচ্ছে সমানে। অর্থাৎ আরও একটা ঘা, যেটা ঢাকার কোন উপায় নেই। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় একইরকম চুলকানি, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ঘা। কনুইতে চুলকাতে যেতেই রক্ত মেশানো হলুদ পুঁজ বেরিয়ে পড়ল, সঙ্গে বাজে একটা গন্ধ।

পচে যাচ্ছে ওর শরীরটা। দ্রুতসময় ফুরিয়ে আসছে। খুব তাড়াতাড়ি লিখতে শুরু না করলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ওর শরীরটা, সত্যিকারের মৃত্যু ঘটবে রুস্তম শেরের।

না। কিছুতেই তা হতে পারে না। 'লিখতে তোমাকে হবেই, জাহিদ,' বিড়বিড় করে বলে উঠল সে, 'তবে ভাগ্য ভাল, বেশিদিন তোমাকে এই অত্যাচার সহ্য করতে হবে না।'

তাকের ওপর থেকে লিকুইড মেকআপের শিশিটা তুলে নিয়ে মুখের ঘা-টা ঢেকে দেবার কাজে লেগে পড়ল রুস্তম শের।

সেদিন সন্ধ্যায় স্টেশনারি দোকানের কর্মচারী বিশাল শরীরের অধিকারী এক খদ্দেরের কাছে এক বাক্স এইচ-বি পেন্সিল বিক্রি করল। সস্তা ডিওডোরান্টের গন্ধ ছাপিয়ে কেমন একটা বদগন্ধ বেরিয়ে আসছে লোকটার শরীর থেকে। দোকানদারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল লোকটা মুখে মেয়েদের মত মেকআপ ব্যবহার করেছে। কিছু একটা ভজঘট আছে, নিশ্চিত হল সে। কিন্তু পয়সা দিয়ে জিনিস কিনছে,

তাতে তো আপত্তির কিছু নেই। কি দরকার ঝামেলা বাড়িয়ে!-

দোকান থেকে বাসায় ফিরে তালা খুলে ভেতরে ঢুকল রুস্তম শের। লক্ষ্য করল না সদর দরজার সিঁড়িতে তিনটে চড়ুই পাখি মরে পড়ে আছে।

দ্রুতহাতে দু'একটা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল কাঁধে ঝোলানো কালো সাইড ব্যাগটায়। বেরিয়ে পড়তে হবে ওকে।

পনেরো

সকাল থেকেই মোনার মুখ ভার। জাহিদ ডিপার্টমেন্টে যেতে চাচ্ছে, মোনার তাতে আপত্তি। পাহারা দু'ভাগে ভাগ করে ফেলতে হয় বলে পুলিসও চায় না ও বাসার বাইরে যাক। কিন্তু জাহিদ খুবই অস্থিরতায় ভুগছে। বাসা থেকে বের হতেই হবে। রুস্তম শেরের দেয়া সময়সীমা পেরিয়ে গেছে তিন দিন আগে। এক লাইনও লেখেনি জাহিদ। রুস্তম শের বাসায় ফোন করবে না, আড়িপাতা যন্ত্র আছে এখানে তা সে জানে। কিন্তু ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে। ডিপার্টমেন্টে ওর অফিসে ফোন আছে, ওখানে যাওয়াই ভাল। মোনাকে মিথ্যে করে বলল কয়েকটা টিউটোরিয়াল খাতা দেখা হয়নি, পরীক্ষা শুরু হবার আগে ওগুলো দেখে শেষ করতে হবে। খাতাগুলো আনার জন্যে ওকে ডিপার্টমেন্টে যেতেই হবে। জাহিদ সাধারণত মিথ্যে কথা বলে না,

অথচ কত সহজভাবে আজ কাঁচা মিথ্যে কথাগুলো বেরিয়ে এল, মনে হচ্ছিল কেউ যেন ওকে শিখিয়ে দিচ্ছে। শরীরে আর মনে প্রচণ্ড অস্থিরতা। রুস্তম শের ওকে ডাকছে।

দু'সপ্তাহ পরে পরীক্ষা আরম্ভ হবে, তাই ঈদের ছুটির পর আর ক্লাস হচ্ছে না। তারপরেও পুলিস বিভাগের অনুরোধে জাহিদ এক মাসের ছুটি নিয়ে নিয়েছে, ব্যাপারটার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে না হয়। দরকার হলে ছুটি বাড়িয়ে নিতে হবে। এরপরেও জোর করে ডিপার্টমেন্টে যেতে চাচ্ছে বলেই মোনা রেগে আছে।

বাইরের গার্ড দু'জনকে বলতে ওরা থানা থেকে আরও দু'জন গার্ড আনিয়ে নিল। দু'জন জাহিদের সঙ্গে যাবে, দু'জন থাকবে।

কয়েকদিন চালানো হয়নি, জাহিদের পাবলিকা স্টার্ট নিতে একটু দেরি করল। হেঁটে গেলে ডিপার্টমেন্ট বিশ/পঁচিশ মিনিটের রাস্তা। তবে গাড়ি নিলে বেশ কিছুটা ঘুরে যেতে হয় বলে পনেরো মিনিটের আগে পৌঁছানো যায় না। এক হাতে ড্রাইভ করতে হচ্ছে বলে একটু অসুবিধা হচ্ছে। মোনাকে আসল ঘটনাটা খুলে বলতে হয়েছে, তবে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে আর কখনও সেই চেষ্টা করবে না জাহিদ। মোনা হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। পেইন কিলার খাচ্ছে, তবে এখনও প্রচণ্ড ব্যথা।

পাবলিকার পেছন পেছন নিজেদের জিপে ওকে অনুসরণ করে আসছে কনস্টেবল হাবিব আর জসিম। কর্তব্যপরায়ণ প্রাণবন্ত ছেলে দুটো। ইন্সপেক্টর শাহেদকে বলে জিপের ব্যবস্থা করে দিয়েছে জাহিদই। নিজের গাড়িতে দেহরক্ষী বয়ে নিয়ে বেড়াতে জাহিদের আত্মসম্মানে লাগে।

গাড়ি পার্ক করে নেমে দাঁড়াল জাহিদ। হাবিব আর জসিম ওর পাশেই পার্ক করেছে।

'আমি এক্ষুনি ফিরে আসব, আপনারা ইচ্ছে করলে এখানেই অপেক্ষা করতে পারেন।' ওদেরকে খসাতে চাইল জাহিদ।

'থেকে আর কি করব। আপনার সঙ্গেই যাই,' একগাল হেসে হাবিব ওর পরিকল্পনাটা উড়িয়ে দিল।

'দোতলাতেই আমার অফিস, চিন্তার কিছু নেই,' শেষ চেষ্টা করল ও।

'আপনাকে একা ছাড়ার অর্ডার নেই,' কঠোর দেখাচ্ছে এক মুহূর্ত আগের হাসিখুশি মুখটা। 'আমরা নাহয় বাইরেই দাঁড়াব, আপনি কাজ সেরে আসুন।'

মেজাজ খিঁচড়ে গেল জাহিদের। কথা না বাড়িয়ে সিঁড়ির দিকে এগুলো ও, জসিম আর হাবিব অনুসরণ করল।

ক্লাস হচ্ছে না, তাই দু'একজন ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া ফ্যাকাল্টি বলতে গেলে ফাঁকা। দূর থেকে জাহিদ আর তার ইউনিফর্মধারী দুই সঙ্গীকে দেখে আড়চোখে তাকাচ্ছে সবাই, হাবভাবে স্পষ্ট কৌতূহল। কোনদিকে না তাকাবার ভান করে দোতলায় উঠে এল জাহিদ।

দু'একটা ছাড়া প্রায় সব দরজাই বন্ধ। ডিপার্টমেন্টের অফিস থেকে বেরিয়ে আসছে ডক্টর আবুল হাশেম ভূঁইয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি ছিলেন জাহিদের দু'বছরের সিনিয়র। এখন তিনি সহকর্মী হলেও জাহিদ তাঁকে 'আপনি' করে সম্বোধন করে, উনি অবশ্য জাহিদকে 'তুমি' করেই বলেন। বলতে গেলে প্রায় সর্বক্ষণই ডক্টর ভূঁইয়া বহু পুরানো স্টাইলে বানানো কালো একটা সুট পরে থাকেন—হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কোন উপন্যাসের চরিত্রে অভিনয় করার জন্যে মেকআপ নিয়েছেন। ব্যাকব্রাশ করা লম্বা চুল, কোঁকড়ানো দাড়ি। পণ্ডিত লোক, জাহিদ সবসময়ই তাঁকে শ্রদ্ধা করে যদিও আজকাল সম্পর্কটা প্রায় বন্ধুত্বের পর্যায়ে এসে গেছে।

'স্লামালেকুম, হাশেম ভাই, কেমন আছেন?' অফিসের তালা খুলতে

খুলতে ভদ্রতা করল জাহিদ।

'কি খবর, জাহিদ, হঠাৎ এদিকে?' নাটুকে ভঙ্গিতে জোরাল কণ্ঠে জানতে চাইলেন ডক্টর ভুঁইয়া। 'বহুদিন তো তোমাকে এদিকে দেখা যায়নি!'

'কয়েকটা খাতা নিতে এসেছি, বেশিক্ষণ থাকব না।' হাসি হাসি মুখে কাটাতে চাইল জাহিদ।

'আরে, তোমার হাতে কি হয়েছে?' চোখ সরু করে চেয়ে আছেন ভদ্রলোক ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতটার দিকে।

'এই, মানে...' অপ্রস্তুত হয়ে গেল জাহিদ, গল্প বানাতে হবে। 'দরজায় চাপা খেয়েছি।'

'দরজায়?' বিস্মিত দেখাচ্ছে তাঁকে, 'চমৎকার! বউয়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিলে নাকি হে?' হাসছেন মিটিমিটি।

হেসে ফেলল জাহিদ। 'কি যে বলেন! সে বয়েস কি আর আছে? হঠাৎ করে দরজাটা বাতাসে...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। আর বলতে হবে না,' ওকে থামিয়ে দিয়ে চোখ টিপলেন তিনি। জাহিদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি। জাহিদ কি ভেবেছে ডক্টর ভুঁইয়াকে ও বোকা বানাতে পারবে?

হঠাৎ করে জাহিদের একটা কথা মনে পড়ল। 'আচ্ছা, হাশেম ভাই, আপনি কি এ বছর লোক সাহিত্য পড়াচ্ছেন?'

'দশ বছর ধরে ওই একটা বিষয় পড়িয়ে যাচ্ছি, আর তুমি কিনা এখন জিজ্ঞেস করছ! হঠাৎ কেন জানতে চাইছ?'

এই প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য উত্তর তৈরি করা কঠিন কিছু না। 'একটা পেপার লিখছিলাম, রিসার্চের জন্যে দরকার।'

'ঠিক কোন ব্যাপারে তোমার সাহায্য দরকার?'

'কুসংস্কার বা কোন পৌরাণিক কাহিনীতে কি আপনি কখনও চড়ুই পাখির উল্লেখ পেয়েছেন?'

ভুরু কুঁচকে ছাদের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন ভীর ভুঁইয়া। 'হুঁ...এ মুহূর্তে তেমন কিছু মনে পড়ছে না।' তারপর স্থির চোখে ওর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আসল ব্যাপারটা কি বল তো? কেন তুমি জানতে চাইছ?'

আবুল হাশেম ভুঁইয়াকে বোকা বানানো সহজ কাজ নয়। গম্ভীর হয়ে গেল জাহিদ। 'এই...মানে...এখন বলতে পারছি না। পরে সময় করে একদিন বলব। আমি ঠিক...ইয়ে...একটু চিন্তায় আছি।'

হাসির ভঙ্গিতে ঠোঁট দুটো একটু বেঁকে গেল। 'ঠিক আছে, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড। চড়ুই পাখি, না? খুব সাধারণ পাখি। মনে হয় না কুসংস্কার বা পৌরাণিক কাহিনীতে এর গভীর কোন তাৎপর্য আছে। দাঁড়কাক বা শকুন হলে এক্ষুনি বলে দিতে পারতাম। আচ্ছা, দাঁড়াও,' ডান হাতের তর্জনী দিয়ে কপালে আস্তে আস্তে টোকা মারছেন তিনি, 'কোথায় যেন চড়ুই পাখির কথা পড়েছি! একটু বইপত্র ঘেঁটে দেখতে হবে। তুমি আছ তো কিছুক্ষণ?'

'আধ ঘন্টার বেশি না।'

'দেখি তাহলে। ব্যারিনজারের "ফোকলোর অফ আমেরিকা" হল রাজ্যের সব কুসংস্কারের বাইবেল। আমার অফিসেই আছে। এক্ষুনি দেখে এসে বলছি। ওতে কিছু না পেলে লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখে পরে তোমাকে নাহয় ফোন করব।'

কৃতজ্ঞ বোধ করল জাহিদ। 'ধন্যবাদ, হাশেম ভাই। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'ও কিছু না,' হাত নেড়ে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করলেন। 'নাই দ্য ওয়ে, সেদিন তোমার বউ দারুণ রান্না করেছিল, হে। এত ভাল মোরগ পোলাও আগে কোথাও খাইনি। যেমন দেখতে তেমন গুণ। যাই বল না কেন, অত সুন্দরী একটা মেয়েকে তোমার স্ত্রী হিসেবে কিছুতেই মানায় না।'

হেসে ফেলল জাহিদ। এটা ওনার প্রিয় রসিকতা। মোনার সামনে কিন্তু মুখে তালা এঁটে থাকেন।

'যাই দেখি তোমার চড়ুই পাখির হদিস করতে পারি কিনা।' দূরে দাঁড়ানো কনস্টেবল জসিম আর হাবিবের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে উঁচু গলায় বললেন, 'খোদা হাফেজ, ভাই সাহেবরা।'

হকচকিয়ে ঘুরে তাকাল ওরা, ডক্টর ভুঁইয়া ততক্ষণে নিজের অফিসের দিকে হাঁটতে শুরু করেছেন।

হাবিব এগিয়ে এসে জাহিদকে জিজ্ঞেস করল, 'ইনি কে?'

'ডক্টর আবুল হাশেম ভুঁইয়া। এই ডিপার্টমেন্টের টিচার।'

'ভদ্রলোকের মাথায় কি একটু ছিট আছে?'

হাসল জাহিদ। 'আমাদের অনেকের চাইতে বেশি সুস্থ উনি। বাংলাদেশে ওনার মত পণ্ডিত লোক কমই আছে,' বলতে বলতে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল জাহিদ।

হাবিব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভেতরটা জরিপ করে নিল। জাহিদ সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিতে উজ্জ্বল দেখাল চারদিক। শূন্য ঘর, কেউ লুকিয়ে নেই। হাবিব রেলিঙের কাছে দাঁড়ানো ওর সঙ্গীর কাছে চলে গেল।

অনেকদিন অফিসে আসেনি জাহিদ, কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে। তাও জানালা খুলতে ইচ্ছে করল না। হঠাৎ নিজেকে প্রচণ্ড একা মনে হল। মন কেঁদে উঠল মোনা-রূপক-রুমকির জন্যে। কেন যেন মনে হচ্ছে এখানে কাউকে বিদায় জানাবার জন্যে এসেছে ও।

জোর করেই নিজেকে টেনে বাইরে বের করে নিয়ে এল জাহিদ। হাবিব আর জসিমকে ডাকল, 'চা খাবেন নাকি? লাউঞ্জে গিয়ে তাহলে নিয়ে আসি।'

ওরা খুশি হয়ে মাথা নাড়ল। করিডরের শেষ প্রান্তে লাউঞ্জ। তিন কাপ চা কিনে নিয়ে এল জাহিদ।

হাবিব আর জসিম বারান্দার রেলিঙে বসে চা খাচ্ছে। জাহিদ চেয়ারে বসে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সামনে টেবিলের ওপরে রাখা কালো টেলিফোন সেটটার দিকে।

কিন্তু টেলিফোনটা নীরব, বসে আছে জড়পদার্থের মত। ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে মূল্যবান সময়গুলো, অথচ বেজে উঠছে না।

উঠে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরে উঁকি দিল জাহিদ। হাবিব আর জসিম এদিকে মুখ করে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। বাঁ হাতের আঙুলগুলো উঁচিয়ে ওদের উদ্দেশ্যে বলল, 'আর পাঁচ মিনিট।' ওরা হাত তুলে সমর্থন জানাল।

ফিরে এসে আবার চেয়ারটা টেনে বসল জাহিদ। রুস্তম শের কি অফিসের নাম্বার জানে না? কি আবোল-তাবোল ভাবছে ও, রুস্তম শের নাম্বার জানবে না তা-ও কি হয়? মনে হল দূরে কোথাও ফোন বেজে উঠল। কান পেতে থেকেও আর কিছু শুনতে পেল না। গালে হাত দিয়ে বন্ধ জানালার কাঁচের বাইরে চেয়ে রইল একদৃষ্টে।

'জাহিদ?'

চমকে উঠল জাহিদ। হাতের ধাক্কা লেগে টেবিলে রাখা কাপ থেকে ঠাণ্ডা চা ছলকে পড়ে ভিজিয়ে দিল একটা খাতার কোনা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল আবুল হাশেম ভূঁইয়া দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

'স্যরি,' লজ্জা পেল জাহিদ, 'একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।'

'তোমার ফোন এসেছে। মনে হয় ভুলে আমার অফিসের নাম্বারে করেছে। ভাগ্যিস, আমি ছিলাম।'

বুকের ভেতর দামামা বাজতে শুরু করেছে। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখতে পারল জাহিদ। বেশ স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'আসলেই ভাগ্যটা ভাল, আর একটু পরই আমি চলে যেতাম।'

ডক্টর ভূঁইয়ার চোখে কৌতূহল আর বিস্ময়। 'ব্যাপার কি, জাহিদ? সব ঠিকঠাক আছে তো?'

না, হাশেম ভাই, কিছুই ঠিকঠাক নেই। এক বদ্ধ উন্মাদ আমাকে আর আমার বউ-বাচ্চাকে খুন করতে চাচ্ছে, যে কিনা এমন এক লোকের ভূত যার কোন অস্তিত্বই কোনদিন ছিল না। প্রাণপণে এই কথাগুলোই বলার চেষ্টা করল জাহিদ, অথচ মুখ থেকে বের হল, 'কেন? ঠিকঠাক না থাকার কি কারণ?' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জাহিদ। ড্রয়ার থেকে একটা ছোট্ট টাওয়েল বের করে ছলকে পড়া চা-টুকু মুছে নেবার ভান করে মুখটা নিচু করল।

'তোমাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে! তুমি কি অসুস্থ?'

'না না!' সজোরে দু'দিকে মাথা নাড়ল জাহিদ।

'যাই হোক, যে লোকটা ফোন করেছে তাকে কখনও তোমার বাসায় ঢুকতে দিয়ো না। গলা শুনে সুবিধের লোক মনে হল না।'

পাশ কাটিয়ে বের হতে হতে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জাহিদ। করিডরে পা রাখতেই হাবিব লাফ দিয়ে রেলিঙ থেকে নেমে দাঁড়াল, 'কোথায় যাচ্ছেন, স্যার?'

'ভুঁইয়া সাহেবের অফিসে আমার ফোন এসেছে। মনে হয় আমাকে করতে গিয়ে ভুলে ওনার নাম্বার ঘুরিয়েছে।'

'আর কি ভাগ্য, আপনি ছাড়া একমাত্র ভুঁইয়া সাহেবই অফিসে এসেছেন!' ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে বলল হাবিব।

পাত্তা দিল না জাহিদ, কাঁধ ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল আবুল হাশেম ভুঁইয়ার অফিসের দিকে।

এই ব্লকের সব অফিসই আকারে সমান। তবে ডক্টর ভুঁইয়ার ঘরে এত জিনিসপত্র যে ঘরটাকে অপেক্ষাকৃত ছোট মনে হয়। মাটির তৈরি ছোট বড় বিষ্ণুমূর্তি, বাঁশের তৈরি পুতুল, পুরানো একটা আলমারি দিয়ে সাজিয়েছেন তিনি ঘরটাকে। যামিনী রায়ের ছবির পাশাপাশি দেয়ালে ঝুলছে মাছ ধরা জাল আর একটা ব্যবহার করা হুঁকো। ব্যারিনজারের 'ফোকলোর অফ আমেরিকা' খোলা অবস্থায় টেবিলে

রাখা আছে। তারই খোলা পৃষ্ঠার ওপর টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছেন তিনি। জাহিদের সঙ্গে ঘরে ঢোকেননি উনি, বাইরে দাঁড়িয়ে হাবিব আর জসিমের সঙ্গে কথা বলছেন। কৃতজ্ঞ বোধ করল জাহিদ।

রিসিভারটা তুলে নিল, 'হ্যালো, রুস্তম শের?'

'তোমার সময় শেষ।' সন্দেহ নেই রুস্তম শেরই, কিন্তু একি অদ্ভুত পরিবর্তন ওর কণ্ঠস্বরের! কর্কশ, খসখসে—মনে হচ্ছে সারাদিন মিছিলে শ্লোগান দিয়ে ঘরে ফিরে চোটপাট করছে বিপক্ষদলীয় নেতা। 'এক সপ্তায় এক লাইনও লেখনি তুমি।'

'ঠিকই বলেছ, লিখিনি আমি,' হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, কিন্তু রুস্তম শেরকে নিজের দুর্বলতা দেখাতে চায় না জাহিদ। সমান তেজে বলল, 'আমি কোনদিনই ওই লেখা লিখব না আর, দশ বছর সময় দিলেও না। তুমি মরে গেছ, কোনদিনই বেঁচে উঠতে পারবে না।'

'ভুল করছ, দোস্ত।' বিশ্রী অস্বস্তিকর ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলে যেতে লাগল রুস্তম শের, 'মরতে চাইলে অবশ্য আমার কিছু করার নেই।'

'তুমি কি জানো তোমার কণ্ঠস্বর কেমন শোনাচ্ছে?' আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বলল জাহিদ, 'শুনে মনে হচ্ছে তোমার অবস্থা কেরোসিন। সেজন্যেই তাড়াতাড়ি আমাকে দিয়ে লেখাতে চাও, না? লাভ নেই, রুস্তম শের। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তুমি খুব শীঘ্রি, মাটিতে মিলিয়ে যাবে।'

'তাতে তোমার কিছু যায় আসে না, তাই না?' কর্কশ কণ্ঠটাকে কি একটু দুঃখিত মনে হচ্ছে? উত্তেজিত হয়ে কথা বলে যাচ্ছে রুস্তম শের, ফ্যাসফ্যাসে রক্ত হিম করা আওয়াজ, 'আমার কোন ব্যাপারেই তোমার কোন উৎসাহ নেই, তাই না? খাল কেটে তুমিই কুমির ডেকে এনেছ। সন্ধ্যা নামার আগেই সিদ্ধান্ত নাও, নাহলে তুমি শুধু একাই মরবে না, আরও কয়েকজনকে নিয়ে মরবে।'

'আমি...'

খট করে লাইনটা কেটে গেল। রিসিভার রেখে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে আছে হাবিব আর জসিম।

'কে ফোন করেছিল?' হাবিব জিজ্ঞেস করল গম্ভীর ভাবে।

'আমার এক ছাত্র।'

'আপনি এখানে এসেছেন কেমন করে সে জানল?'

রেগে গেল জাহিদ। শ্লেষ মাখা কণ্ঠে বলে উঠল, 'আসলে আমি ভারতের এজেন্ট, খবর পাচার করছিলাম। কি করবেন করুন।'

কঠোর হয়ে এল হাবিবের দৃষ্টি। 'দেখুন, স্যার, আমরা আপনাকে আর আপনার পরিবারকে সাহায্য করতে এসেছি। জানি দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা নজরবন্দী হয়ে থাকতে আপনার ভাল লাগছে না, কিন্তু আমাদেরকে শত্রু ভাবার কোন কারণ নেই। আমরা আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি, আর কিছু না।'

লজ্জা পেল জাহিদ। হঠাৎ করে রেগে ওঠা উচিত হয়নি। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। মনে হচ্ছে চামড়ার নিচে কেউ সুড়সুড়ি দিচ্ছে, গরম হয়ে উঠছে শরীরের রক্ত। রুস্তম শের! ওর সঙ্গেই আছে, দেখছে সব, শুনছে। সাহায্য চাওয়ার কোন উপায় নেই।

'স্যরি,' ক্ষমা চাইল জাহিদ। ওদের দু'জনের পেছন থেকে আবুল হাশেম ভুঁইয়া উঁকি মারছেন। 'আসলে ছেলেটা আমাকে নিচে গাড়ি পার্ক করতে দেখেছে। ফোন করতে গিয়ে ভুঁইয়া সাহেবের নাম্বার ঘুরিয়েছে। প্রায় একই নাম্বার আমাদের, শুধু শেষের ডিজিটটা ভিন্ন।'

হাবিব একটু তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনার কাজ কি শেষ হয়েছে?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জাহিদ। 'এই তো, কয়েকটা খাতা বেছে নিতে হবে, বাসায় গিয়ে দেখব।'

(কেরানিকে একটা নোট লিখতে হবে)

'আর, হ্যাঁ, ডিপার্টমেন্টের কেরানি আলম সাহেবকে একটা নোট লিখতে হবে।' আশ্চর্য হয়ে গেল জাহিদ, কেন যে এই মিথ্যে কথাটা বলল তা নিজেই জানে না। মনে হচ্ছে ওকে দিয়ে কেউ যেন বলিয়ে নিচ্ছে। আলম সাহেবকে নোট লিখবে! হাশেম ভাই নিশ্চয়ই হাসতে হাসতে শেষ হয়ে যাচ্ছেন ভেতরে ভেতরে।

ওনাকে পাশ কাটিয়ে বের হতে যেতেই বললেন, 'জাহিদ, এক মিনিট দাঁড়াও তো, কথা আছে।'

নিরুপায় ভঙ্গিতে থামল জাহিদ, হাবিব আর জসিম একটু দূরে সরে গিয়ে কথা বলার সুযোগ করে দিল।

'ব্যাপার কি, জাহিদ? পরকীয়া প্রেম-ট্রেম চালাচ্ছ নাকি? যা একখানা গল্প বানালে!' রসিকতা করছেন, কিন্তু হাসছেন না ডক্টর ভুঁইয়া।

বোকার মত হাসতে চেষ্টা করল জাহিদ।

'যাও, তোমাকে আটকে রাখব না। আলম সাহেবকে নাকি কি একটা নোট লিখবে!'

জাহিদের মুখে রক্ত উঠে এল। কি লজ্জা! আলম সাহেব পাঁচ বছর ক্যান্সারে ভুগে বছর দুয়েক আগে ইন্তেকাল করেছেন। সেই আলম সাহেবকে নোট লেখার কথা ভাবছে জাহিদ।

'অবশ্য এসব বলার জন্যে তোমাকে আটকাইনি আমি। তুমি চড়ুই পাখির ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলে, ব্যারিনজারে সেটা খুঁজে পেয়েছি।'

হার্টবিট বেড়ে গেল। 'কি পেয়েছেন?' সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল জাহিদ।

ভেতরে ঢুকে টেবিল থেকে বইটা তুলে নিলেন তিনি, 'চড়ুই আর লুন নামের এক ধরনের হাঁস হল "সাইকোপম্প",' খুশি-খুশি কণ্ঠে বললেন তিনি।

'সাইকোপম্প? সেটা আবার কি?' অবাক হল জাহিদ।

'গ্রীক ভাষায় এর মানে হল কর্মী—যারা কোন বিশেষ কাজ সম্পন্ন করে। এ ক্ষেত্রে সাইকোপম্প হল তারা যারা ইহলোক আর পরলোকের মধ্যে মানুষের আত্মা আনা-নেয়া করে। ব্যারিনজার লিখেছেন, যেখানে মৃত্যু আসন্ন, লুন সেখানে দেখা দেয়। ওদের কাজ হল সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মানবাত্মাকে পথ দেখিয়ে পরলোকে নিয়ে যাওয়া। চড়ুই পাখির কাজ কিন্তু, ব্যারিনজারের মতে, আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এরা হারিয়ে যাওয়া আত্মাকে পথ দেখিয়ে ইহলোকে নিয়ে আসে। অন্য কথায়, চড়ুই পাখিরা হল জীবনমৃতের পথপ্রদর্শক।' জাহিদের বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে আরও যোগ করলেন, 'তোমার অবস্থাটা কি তা আমি জানি না। তবে বড় ভাই হিসেবে শুধু এটুকু বলব, সাবধানে থেক। খুব সাবধান। দেখে মনে হচ্ছে খুবই বিপদের মধ্যে আছ তুমি। যদি কোন সাহায্য দরকার হয়, নির্দ্বিধায় আমাকে বলতে পার।'

'ধন্যবাদ, হাশেম ভাই। এমনিতেই অনেক বড় একটা উপকার করেছেন। দয়া করে আর কারও সঙ্গে যদি ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা না করেন, তাহলেই সবচেয়ে বড় উপকার হবে আমার।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন তিনি। 'অবশ্যই। আমাকে বিশ্বাস করতে পার। নিজের দিকে লক্ষ্য রেখ, জাহিদ। আর এই ছেলে দুটোকে শত্রু ভেব না, ওদেরকে কাছে কাছে রাখলেই বুদ্ধিমানের কাজ করবে।'

অনেক কথাই বলতে চাইল জাহিদ, কিন্তু চামড়ার নিচের এই অস্বস্তিকর অনুভূতি দূর না হলে মুখ খোলা একান্তই বোকামি হবে।

'ধন্যবাদ, হাশেম ভাই, আপনার কথা মনে থাকবে।' ধীর গতিতে নিজের অফিসের দিকে রওনা হল জাহিদ।

আলম সাহেবকে নোট লিখতে হবে। কেন বারবার এই অর্থহীন কথাটা মনে পড়ছে! ব্যাণ্ডেজের নিচে ক্ষতটা অসম্ভব চুলকাচ্ছে, সঙ্গে চিনচিনে ব্যথা। হাতটা জোরে জোরে উরুতে ঘষল, কোন লাভ হল

না। আরও বেশি করে চুলকাচ্ছে যেন। অফিসে ঢুকে পর্দাহীন কাঁচের জানালায় চোখ চলে গেল আপনাআপনি।

জানালার ওপাশে ইলেকট্রিক তারে সার বেঁধে বসে আছে কয়েক শো চড়ুই পাখি। সামনের বিল্ডিঙের ছাদ আর কার্নিস ঢেকে গেছে চড়ুই পাখিতে। এইমাত্র এক ঝাঁক এসে নামল নিচের টেনিস কোর্টে।

কোন শব্দ করছে না, প্রত্যেকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে জাহিদের দিকে।

সাইকোপম্প। জীবন্মৃতের পথপ্রদর্শক।

'না!' অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল জাহিদ। দূরে আকাশ কালো করে আরও এক ঝাঁক পাখি উড়ে আসছে এদিকেই। জাহিদের দু'হাতের রোম দাঁড়িয়ে গেছে, হাতের ক্ষতে অস্বস্তিকর চুলকানি। আলম সাহেবকে নোট লিখতে হবে। সন্ধ্যা নামার আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

জাহিদের চোখের সামনে পাখিরা একসঙ্গে ডানা মেলল। কালো হয়ে গেল আকাশ। ডানা ঝাপটানর শব্দে মুহূর্তের জন্যে বধির হয়ে গেল জাহিদ। রাস্তায় পথচারীরা অবাক হয়ে চেয়ে আছে আকাশের দিকে।

আলম সাহেবকে নোট লিখতে হবে। চেয়ারে বসে কাগজ কলম টেনে নিতেই চামড়ার নিচের অস্বস্তিকর অনুভূতি কমে এল। লিখতে শুরু করল জাহিদ, কি লিখতে যাচ্ছে সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

'আমি এখন কোথায়, বল তো?'

ভয়ে শামুকের মত গুটিয়ে গেল জাহিদ, কেঁপে উঠেছে অন্তরাত্মা। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে লেখাটার দিকে। অর্থটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার।

বেজন্মাটা জাহিদের বাসায়! ওখান থেকেই ফোন করেছে! রূপক-

রুমকি আর মোনা! হায় আল্লাহ্!

চেয়ার ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল জাহিদ, কোথায় যেতে চাইছে নিজেই জানে না। কিন্তু এক চুল নড়তে পারল না। সম্মোহিতের মত চেয়ে আছে কলম ধরা হাতের দিকে, আবার লিখতে শুরু করেছে।

'মুখ খুললে মরবে!'

শেষ অক্ষরটা লেখা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতের ব্যথা আর চুলকানি, চামড়ার নিচের অস্বস্তিকর সুড়সুড়ি—সব নিমেষে ভাল হয়ে গেল। মনে হল কেউ যেন প্লাগটা খুলে দিয়েছে।

পাখিরা চলে গেছে। রুস্তম শেরও নেই।

বাসার বাইরের গার্ড দু'জনের কি অবস্থা কে জানে! রুস্তম শের জাহিদের অনুপস্থিতিতে গৃহকর্তার কাজ করছে। কেমন করে জাহিদ এই বোকামিটা করল? দু'জন কেন, পুরো সেনাবাহিনী এলেও ওদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারত না।

'স্যার, হয়েছে?'

চমকে উঠে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল জাহিদ। কনস্টেবল হাবিব দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। 'এই তো, এক্ষুনি উঠছি,' বলতে বলতে কাগজটা মুঠো পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে দিল।

দরজার দিকে রওনা হতেই হাবিব ডাকল, 'কি যেন খাতা নেবার কথা ছিল না?'

অপ্রস্তুত হল জাহিদ। 'এই যাহ্! যার জন্যে আসা সে কাজটাই ভুলে গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিয়েছেন!' আবার ঘুরে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে তিন-চারটে খাতা তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল জাহিদ। 'মুখ খুললেই মরবে!'

নিচে নেমে গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে জাহিদ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। 'সামনের দোকানে থেমে আমার ওয়াইফকে একটা ফোন করব, যদি কিছু কেনাকাটা করার থাকে।'

অবাক হল হাবিব, 'ওপর থেকেই ফোনটা সেরে এলেন না কেন?'

'মনে ছিল না। এখন আর সিঁড়ি ভাঙতে ইচ্ছে করছে না।'

হাবিব আর কথা বাড়াল না।

গেটের মুখের স্টেশনারি দোকানে থামল জাহিদ। হাত নেড়ে হাবিব আর জসিমকে জিপ থেকে নামতে নিষেধ করল। দোকানে ঢুকে ফোন করতে চাইলে দোকানদার একগাল হেসে কাউন্টারের তলা থেকে টেলিফোন সেটটা বের করে তালা খুলে দিল। জাহিদকে সে অনেক বছর ধরে চেনে।

'ভাইসাব, যদি কিছু মনে না করেন একটু প্রাইভেট কথা বলতে চাই,' ওপাশে রিঙ হচ্ছে, অন্য কোনদিকে জাহিদের মনোযোগ নেই।

'বলেন বলেন, কুনো অসুবিধা নাই,' বলতে বলতে কাউন্টার থেকে বেরিয়ে দোকানদার একটু দূরে শেলফের জিনিসপত্র সাজাতে লেগে গেল। হাবিব আর জসিম কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে থেকে জাহিদের দিকে চেয়ে আছে।

রুস্তম শের ফোন তুলল, 'জাহিদ?'

'ওরা কই? কি করছিস তুই...' চাপা কণ্ঠে গড়গড়িয়ে উঠল জাহিদ, রাগে ফেটে পড়ছে। রূপক-রুমকি একযোগে কাঁদছে, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও। মোনা? মোনা কোথায়?

'কিচ্ছু না,' ওকে থামিয়ে দিল রুস্তম শের। 'শুনতেই তো পাচ্ছ, বাচ্চারা ভালই আছে, ওদের কোন ক্ষতি করিনি।'

'মোনা?' আঁতকে উঠল জাহিদ। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'যদি ওদের কোন ক্ষতি হয় তোর নামে একটা অক্ষরও আমি লিখব না, হারামখোর!' দোকানদার অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল। নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করল জাহিদ।

পরমুহূর্তে ওপাশ থেকে মোনার উৎসুক কণ্ঠ ভেসে এল, 'জাহিদ, তুমি ঠিক আছ তো?' ওর গলা চিন্তিত শোনাচ্ছে, ভীত নয়।

'তোমরা...বাচ্চারা...ঠিক আছ তো?' ফুঁপিয়ে উঠল জাহিদ।

'আমরা ভাল আছি। আমি...' চুপ করে গেল মোনা, রুস্তম শের পাশ থেকে কি যেন বলছে। তারপর কান্নাকান্না গলায় বলল, 'জাহিদ, ও যা চাইছে তা করতে হবে তোমাকে। কিন্তু ও বলছে এখানে তা করা যাবে না। জাহিদ...ও পুলিস দু'জনকে খুন করেছে!' কাঁদছে মোনা।

চোখ বন্ধ করল জাহিদ। প্রাণপণে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে। ওপাশে মাউথপিসে হাত চেপে ধরে রুস্তম শের মোনাকে কিছু বলছে।

একটু পর আবার মোনার গলা শোনা গেল। 'ও আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। ও বলছে তুমি জানো কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। পাতালপুরীর কথা মনে আছে? ও বলছে তোমার সঙ্গের পুলিস দু'জনকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে। সন্ধ্যার মধ্যে ওখানে পৌঁছুতে হবে তোমাকে।' আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মোনা। 'যা বলছে তাই কর, জাহিদ!'

জাহিদের হাত নিশপিশ করতে লাগল রুস্তম শেরের গলা টিপে ধরার জন্যে, নখ বিঁধিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে আসতে ইচ্ছে করছে ওর শরীরের চামড়া।

মোনার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে নিয়েছে রুস্তম শের, হাসছে। 'একটু এদিক-ওদিক হবে তো তোমার বউ-বাচ্চা নেই হয়ে যাবে, বুঝলে?' হাসি বন্ধ করে হঠাৎ ধমকে উঠল, 'পাতালপুরীটা আবার কি জিনিস? কোন কোড নাকি?'

'টেলিফোনের সঙ্গে রেকর্ডিং ইকুইপমেন্টস ফিট করা ছিল, ওগুলো নিশ্চয়ই এখন কাজ করছে না?' জাহিদ প্রশ্ন করল।

'এসেই প্রথমে ওগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। কি ভাব তুমি আমাকে, জাহিদ?'

'মোনা হয়ত তা জানে না। পুলিস যাতে না বুঝতে পারে তাই পরেশের বাড়িটাকে পাতালপুরী বলে উল্লেখ করেছে ও। ও বাড়ির

পেছনে জঙ্গলমত একটা জায়গাকে আমরা পাতালপুরীর নাম দিয়েছিলাম। সন্দেহ করার কোন কারণ নেই, মোনা তোমাকে সাহায্য করতেই চাচ্ছে।'

রুস্তম শের বিশ্বাস করছে তো? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে থাকল জাহিদ। অবশেষে ওদিক থেকে রুস্তম শেরের গলা শোনা গেল, 'ঠিক আছে, হাতে সময় বেশি নেই।' হাঁফ ছেড়ে বাঁচল জাহিদ। মনে মনে ঠিক করল প্রথম সুযোগেই মোনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে এত বড় ঝুঁকি নিয়ে কি বোকামিটা করেছে সে।

'ওদের কোন ক্ষতি কর না। তুমি যা বলবে তাই করব আমি।'

হেসে উঠল রুস্তম শের, 'জানি, করতে তোমাকে হবেই। এখন সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়। তাড়াহুড়ো করতে যেয়ো না। গাড়িটা বদলে নিলেই ভাল হয়। তবে তোমাকে কিছু বলতে যাচ্ছি না, কিভাবে কি করতে হবে তা তুমিই ভাল জান। সন্ধ্যার মধ্যেই চলে এস, যদি এদেরকে জীবিত দেখতে চাও। কোন চালাকি করতে যেয়ো না যেন।'

লাইনটা কেটে গেল।

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল জাহিদ। প্রচণ্ড ইচ্ছে করছে এক ছুটে বাসায় চলে যেতে। মাত্র কয়েক মাইল দূর, অথচ কখনোই পার হওয়া যাবে না এই স্বল্প দূরত্বটুকু। এই মুহূর্তে আবেগের বশে কিছু করা মানে মোনা আর বাচ্চাদের মৃত্যু ত্বরান্বিত করা। আর যাই হোক রুস্তম শের এখন পর্যন্ত ওদের কোন ক্ষতি করেনি।

চিন্তা করার জন্যে সময় দরকার। জাহিদ অকারণেই ঘুরে ঘুরে শেলফ থেকে জিনিসপত্র নামাতে লাগল, যেন জিনিসগুলি এই মুহূর্তে না কিনলেই নয়। হাবিব আর জসিম একটু পরপরই জানালা দিয়ে ওর দিকে তাকাচ্ছে। ওরা যদি ওদের দুই সহকর্মীর অবস্থা বিন্দুমাত্রও আঁচ করতে পারত! এই মুহূর্তে এই দুজনের জীবনও জাহিদের হাতের মুঠোয়। ওদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে যত তাড়াতাড়ি

সম্ভব, ওদের নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরেই। কিন্তু কিভাবে? বিদ্যুৎচমকের মতই প্ল্যানটা মাথায় খেলে গেল। মাইল দুয়েক দূরে হাইওয়ের একটা অংশ সমকোণে বাঁক নিয়েছে, তার ঠিক পরপরই ডানদিকে জঙ্গলের মধ্যে যাবার জন্যে সরু একটা সাইড রোড। আগে থেকে না চিনলে সাইড রোডটা খুঁজে পাওয়া মুশকিল, পার হয়ে যাবার আগে রাস্তাটা হাইওয়ে থেকে দেখা যায় না। যদি পুলিসের জীপ থেকে জাহিদ বেশ কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে, তবে ওদেরকে ফাঁকি দেয়া খুব একটা কঠিন কাজ হবে না।

রুস্তম শের কি ওদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে এতক্ষণে? নিশ্চয়ই ঢাকা থেকে গাড়ি চুরি করে নিয়ে এসেছে সে। সেটাই স্বাভাবিক। পাতালপুরীর উল্লেখ করে মোনা বিরাট ঝুঁকি নিয়েছে। জাহিদ ঠিকই বুঝতে পেরেছে ইঙ্গিতে ও কি বোঝাতে চাইছিল।

পতেঙ্গার বাড়ির পেছনে কয়েক একর জুড়ে পাহাড়ি জঙ্গুলে এলাকা। ওদের সীমানার ভেতরেই। মোনা ওখানে বেড়াতে ভালবাসে। মোনাই নাম দিয়েছে পাতালপুরী। বছর দুয়েক আগে এক বিকেলে ওরা দু'জন বেড়াচ্ছিল, একটা সাপ কোত্থেকে যেন বেরিয়ে এসে মোনাকে তাড়া করতে শুরু করে। জাহিদ এমন কোন সাহসী পুরুষ নয়, তবুও একটা গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে সাপটাকে মারতে মারতে মেরেই ফেলেছিল। এরপরে মোনা আর কোনদিন পাতালপুরীতে বেড়াতে যায়নি। একটু আগে মোনা সেই সাপ মারার ঘটনাটাই ওকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছে। সেদিনের মত জাহিদ যেন আজও ওকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। সাপটাকে যেভাবে মেরেছিল, রুস্তম শেরকেও যেন ওভাবেই জাহিদ মেরে ফেলে। মোনার কাছে এখন দুটো রাস্তাই খোলা আছে—হয় রুস্তম শেরের মৃত্যু, নাহয় ওর সন্তান ও স্বামীর মৃত্যু! ওদের কথা মনে করে জাহিদের হৃদয়ের গভীরে ক্ষরণ হতে লাগল নিঃশব্দে। কি করবে জাহিদ?

ষোলো

বায়তুল মোকাররমের সামনে থেকে নীলরঙের হোন্ডা সিভিকটা চুরি করেছে রুস্তম শের। সেটা ড্রাইভ করেই এতদূর এসেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার কাছাকাছি এসে গাড়িটা রাস্তার পাশে রেখে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। আগে কখনোই এই এলাকায় আসেনি কিন্তু চিনতে একটুও অসুবিধা হচ্ছে না। জাহিদের কোয়ার্টার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার সীমান্তে। আধ ঘন্টা হাঁটলেই পৌঁছে যাবে।

এই গরমেও রুস্তম শের চাদর মুড়ি দিয়ে আছে, হাতে গ্লাভস। বলতে গেলে ওর শরীরের কোন অংশই দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাক তা সে চায়ও না। পচন ধরেছে সারা শরীরে, যে-কেউ এ চেহারা দেখলে মূর্ছা যাবে। চাদর মুড়ি দিয়ে কাউকে হাঁটতে দেখলে পথচারীরা বড় জোর কৌতূহলী চোখে তাকাবে।

সকাল সাড়ে দশটা। রুস্তম শের জানে জাহিদ বাসায় নেই। ভালই হয়েছে। কম ঝামেলায় কাজ সারা যাবে। রাস্তাঘাটে লোকজনও কম। উদ্ভট বেশবাস দেখে কেউ কেউ সকৌতুকে তাকাচ্ছে।

মাথার চুল সব পড়ে গেছে, বিশাল টাকে শুধু জগদ্দগে কাঁচা ঘা। সাদা রঙের একটা ক্রিকেট ক্যাপ পরে নিয়েছে রুস্তম শের। মুখের চারপাশে ব্যান্ডেজ বেঁধেছে। ব্যান্ডেজের কাপড় লাল হয়ে গেছে রক্ত মেশানো হলুদ পুঁজ লেগে, কিছু কিছু জায়গা ভেজা—এখনও পুঁজ বের

হচ্ছে। কালো গ্লাভস্ পরা হাতের পিঠে মাঝে মাঝে গালের ভেজা ক্ষত মুছে নিচ্ছে, চটচটে পদার্থ লেগে থাকায় গ্লাভস্ পরা আঙুলগুলো বারবার পরস্পরের সঙ্গে আটকে যাচ্ছে। ব্যাণ্ডেজের নিচে চামড়া বলতে কিছু নেই, দগদগে ঘা। বিশ্রী উৎকট এক ধরনের গন্ধ বের হচ্ছে রুস্তম শেরের গা থেকে। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় পথচারীরা নাকে কাপড় দিচ্ছে। যদিও চাদরে ঢাকা থাকায় ওর শরীরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

জাহিদের বাসার সামনের রাস্তার মাথায় একটা আম গাছের তলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ওদিক থেকে দিনমজুর মত দেখতে দু'জন লোক আসছে। জাহিদের বাসার সামনে দাঁড়ানো পুলিস দু'জনের কাছে পৌছতে থেমে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করল। এই রাস্তায় আর মাত্র দু'টো পরিবার থাকে। জাহিদের পাশের বাসার ভদ্রলোক ছুটিতে সপরিবারে কোলকাতায় বেড়াতে গেছেন। উল্টোদিকের পরিবার ঢাকায় ঈদ করছে। রুস্তম শের জানে জাহিদরা ছাড়া আর কেউ বাসায় নেই। অবশ্য থাকলেও তার কোন অসুবিধা হত না। শুধু একটু বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হত।

লোক দু'জন আবার হাঁটতে শুরু করেছে। রুস্তম শেরকে পাশ কাটিয়ে গেল, তবে লক্ষ্য করেনি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশ জরিপ করে নিল। না, আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আগামী কয়েক মিনিটের মধ্যে কেউ না এলেই হল।

চাদরটা গা থেকে খুলে ফেলে দিল রুস্তম শের। তারপর টেনে টেনে ব্যাণ্ডেজগুলো খুলল, শুকিয়ে থাকা পুঁজে টান পড়াতে আবার নতুন করে ক্ষরণ শুরু হল। ক্রিকেট ক্যাপটাও ছুঁড়ে ফেলে দিল। মূর্তিমান বিভীষিকার মত গাছের ছায়ায় ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে জাহিদের বাসার সামনের গেটে পৌছে গেল রুস্তম শের।

কনস্টেবল দু'জন গেটের ভেতর গাড়ি-বারান্দার ছায়ায় বসে ছিল। চোখের সামনে দুঃস্বপ্নের মত ভয়ঙ্কর চেহারাটা দেখে দু'জনেরই হার্ট

অ্যাটাক হবার মত অবস্থা হল।

বাকশক্তি ফিরে পেতে একজন বিড়বিড় করে উঠল, 'সোবহান আল্লাহ্!'

সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে অন্ধের মত হোঁচট খেতে খেতে গেটের ভেতর ঢুকে পড়ছে রুস্তম শের, কর্কশ কণ্ঠে অসহায়ের মত বলছে, 'কে আছেন...আমাকে একটু সাহায্য করুন...আহ্!'

দেখে মনে হচ্ছে কেউ অ্যাসিড ছুঁড়ে মেরেছে, অথবা আগুনে পুড়ে গেছে। রাস্তায় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টও হতে পারে। যাই হোক না কেন, লোকটা সাংঘাতিক আহত হয়েছে। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে দেখে কাছের জন ছুটে এল, 'আরে আরে! পড়ে যাবেন তো...' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল বিশাল শরীরটা। ডান হাতে লোকটার গলা জড়িয়ে ধরে বাঁ হাতে পকেট থেকে দ্রুত ক্ষুরটা বের করে আনল রুস্তম শের। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কনস্টেবলের ডান চোখ বিদ্ধ করে ক্ষুরটা ঢুকে গেল আরও অনেক গভীরে।

'কি হল?' অস্ফুট গোঙানি শুনে দু'ফুট পেছনে দাঁড়ানো দ্বিতীয়জন হকচকিয়ে প্রশ্ন করল, সঙ্গীর পেছন পেছন সে-ও ছুটে এসেছে। এক হাতে কাঁধে ঝোলানো রাইফেলটা নামিয়ে নিচ্ছে নিজের অজান্তেই।

'এই যে, ইনাকে একটু ধরুন তো!' বলতে বলতে প্রাণহীন দেহটা কনস্টেবলের দিকে ঠেলে দিল রুস্তম শের। ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে সহকর্মীর মৃতদেহ দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে গেল রুস্তম শের। চুলের মুঠি ধরে মাথাটা সামান্য ওপরে তুলে নিয়ে ক্ষুর চালাল। কলজে কাঁপানো চিৎকারটা মাঝপথেই থেমে গেল, দু'ফাঁক হয়ে যাওয়া গলা থেকে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। সেই অবস্থাতেই রুস্তম শের দু'হাতে দেহ দুটোকে টানতে টানতে সাইডের দেয়াল আর কোয়ার্টারের মাঝের সরু গলিতে নিয়ে গেল। ব্যস, রাস্তা থেকে আর দেখা যাবে না। গাড়ি-বারান্দার সামনের ইটের

রাস্তার অনেকটা রক্তে ভিজে আছে, তবে রাস্তা থেকে দেখা যাবার সম্ভাবনা কম। সব কিছু ঘটে যেতে পনেরো সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগল না।

মোনা রান্নাঘরে ছিল। বাচ্চারা দোতলায় ঘুমাচ্ছে। প্রতিদিন সকালেই এই সময়টায় ওরা ঘন্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নেয়। ভোর পাঁচটার আগেই ওরা জেগে ওঠে, এই সময়টায় দুধ খাইয়ে ওদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় মোনা। এতে কাজেরও সুবিধা হয়। আজ তো জাহিদও বাসায় নেই। বাচ্চারা জেগে ওঠার আগেই রান্নার কাজ শেষ করতে হবে। ডালে ফোড়ন দিতে দিতে একবার মনে হল বাইরে কেউ চিৎকার করছে। পরমুহূর্তেই আর কিছু শুনতে পেল না। ভুল শুনেছে মনে করে ওদিকে মনোযোগ দিল না আর।

কলিং বেল বেজে উঠতে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল মোনা। জাহিদ এত তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে! দরজাটা খুলেই পাথর হয়ে গেল।

মোনা চিৎকার করল না। চিৎকারটা ভেতর থেকে উঠে আসছিল, কিন্তু বের হবার আগেই জমে গেল। ক্ষতবিক্ষত কদাকার মুখটার দিকে চেয়ে মোনা বাস্তবকে অস্বীকার করতে চাইল, নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইল, চিরজীবনের জন্যে ভুলে যেতে চাইল। রুস্তম শেরকে কখনও দেখেনি ও, কিন্তু চিনতে একটুও দেরি হল না।

'এই যে, মেমসাহেব, কেমন আছ?' হাসছে রুস্তম শের। বেশিরভাগ দাঁত পড়ে গেছে, যে ক'টা আছে তা কালচে হয়ে এসেছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না দাঁতগুলো মরে গেছে। চিবুক বেয়ে টপটপ করে পুঁজ মেশানো রক্ত পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে শার্টের কলার। চোখের পাপড়ি আর ভুরুর চুলও ঝরে গেছে। সারা শরীরের মধ্যে শুধু চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে পূর্ণ জীবনীশক্তি নিয়ে।

সচেতন ভাবে নয়, আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে দরজাটা বন্ধ

করে দিতে চাইল মোনা। বাঁ হাতে দরজার কপাট ঠেলে ধরে ঘরে ঢুকে পড়ল রুস্তম শের। পিছু হটতে গিয়ে পেছন থেকে উল্টে পড়ে গেল মোনা। রুস্তম শের আস্তে করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। চেষ্টা করেও এক বিন্দু আওয়াজ করতে পারল না মোনা, কেউ যেন মুখ চেপে ধরেছে।

ক্লান্ত হয়ে ওঠা কাকতাড়ুয়ার মত আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ডান হাতটা মোনার দিকে বাড়িয়ে দিল রুস্তম শের, 'আমি রুস্তম শের, চিনতে পারছ?' ঘড়ঘড়ে কর্কশ কণ্ঠস্বর, দুর্গন্ধ বের হচ্ছে গা থেকে।

মাটিতে আধশোয়া অবস্থাতেই পিছু হটতে চেষ্টা করল মোনা। গ্লাভস্ খুলে ফেলেছে রুস্তম শের, ডান হাতের পচন ধরা নখহীন তর্জনী দিয়ে মোনার বাঁ গাল স্পর্শ করল। ঠিক তক্ষুনি মোনার মনে পড়ে গেল দোতলার শোবার ঘরে ঘুমিয়ে থাকা রূপক আর রুমকির কথা। চোখের পলকে উঠে দাঁড়িয়ে রান্নাঘরের দিকে দৌড়াল মোনা, অবচেতন মনে হয়ত মাছ কাটার বটিটার কথা ভাবছিল সে। কিন্তু মাঝপথে সাইড টেবিলের পায়ায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে থাকল। রুস্তম শের পেছন থেকে খোলা চুলের মুঠি ধরে ওকে টেনে দাঁড় করাল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দু'হাতে ওর মুখটা খামচে দিতে চাইল মোনা, হাসতে হাসতে ডান হাতে ওর হাত দুটো ধরে ফেলল রুস্তম শের, বাঁ হাতে এখনও শক্ত করে ধরে আছে চুলের গোড়া। সমস্ত শক্তি ব্যয় করেও একচুল নড়তে পারল না মোনা। দেখে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই পচেগলে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে যাবে, অথচ কোত্থেকে এত শক্তি পাচ্ছে লোকটা?

'ব্যাস, অনেক হয়েছে। আর নয়,' ফোঁস ফোঁস করে দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস ছাড়ছে রুস্তম শের, 'এরপর বীরত্ব দেখানর আগে বাইরের পুলিস দুটোর মরা মুখের কথা চিন্তা কর। তাছাড়া ওপরে তোমার বাচ্চারা আছে, ওদেরকে ভুলে গেলে চলবে কেন? বুঝতে পারছ?'

পুতুলের মত ওপরানচে মাথা নাড়ল মোনা। পচতে থাকা শরীরটার দিকে চেয়ে মোনা বুঝতে পারল কেন সে জাহিদকে দিয়ে বই লেখাতে এত জোবাজুরি করছে। এটা ওর অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপার।

ভয়ের প্রথম ধাক্কা কেটে গেছে। বাকশক্তি ফিরে পেতেই চেঁচিয়ে উঠল মোনা, 'খবরদার! আমার বাচ্চাদের গায়ে হাত দেবে না!'

মোনাকে ছেড়ে দিল রুস্তম শের। আবার হাসতে শুরু করেছে, গা গোলানো ঘিনঘিনে হাসি। 'কারও গায়েই হাত তুলব না যদি আমার কথামত চলে।'

'তুমি একটা উ...'

'উন্মাদ। তাই না? তোমাকে কেউ মেরে ফেলতে চাইলে তুমি কি করবে?'

'আমাদের সঙ্গে...'

'চুপ কর। একদম চুপ।' হঠাৎ কানখাড়া করে কিছু শোনার চেষ্টা করতে থাকল রুস্তম শের।

কান পেতেও মোনা প্রথমে কিছু শুনতে পেল না। তারপর হঠাৎ করে মনে হল যেন দূর থেকে অসংখ্য পাখির ডানা ঝাপটানর শব্দ ভেসে আসছে।

'তুমি তো জানো যখন তখন আমি জাহিদের চিন্তার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারি। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে আমি তা পারি না। তুমি কি ভাবছ আমি নিশ্চিত করে বলতে পারব না। কিন্তু আশা করব বাচ্চাদের কথা ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করবে না তুমি। কথা কানে যাচ্ছে তো?' তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলতে থাকল, 'এখন আমি জাহিদকে ফোন করব। কিন্তু ওর অফিসে নয়। ওই ফোনটাও হয়ত ট্যাপ করা হয়েছে। জাহিদের অজান্তে যদি পুলিস তা করে থাকে তবে আমার জানার কোন সম্ভাবনা নেই। রিস্ক নিয়ে লাভ কি?' আবার কান খাড়া করে কিছু শোনার চেষ্টা করল রুস্তম শের। তারপর বলল, 'জাহিদ একটা লোকের

সাথে কথা বলছে ওর অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে। ছোটখাট, তেল দেয়া চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো, লম্বা কোঁকড়ানো দাড়ি, এই গরমেও কালো একটা সুট পরে আছে...'

'ভূঁইয়া সাহেব। ডক্টর আবুল হাশেম ভূঁইয়া। জাহিদের পাশেই ওনার অফিস।' অবাক হল মোনা, কেমন করে লোকটা এমন নির্ভুল বর্ণনা দিচ্ছে?

'টেলিফোন গাইড কোথায়?'

'সেন্টার টেবিলের নিচের তাকে।'

রুস্তম শের ওদিকে পা বাড়াতেই চকিতে মোনা হাত বাড়াল টেবিলের ওপর সাজানো পিতলের ফুলদানিটার দিকে। মুহূর্তে ঘুরে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল রুস্তম শের, 'এখনও তেজ কমেনি! এটা কি চিনতে পারছ?' ওর হাতে রক্ত লেগে থাকা রূপালী ক্ষুর। বমি পেল মোনার। মনে পড়ল বাইরে শুয়ে আছে দুটো মৃতদেহ। মোনাকে ধাক্কা দিয়ে সোফায় বসিয়ে দিল রুস্তম শের। 'আমি এখন জাহিদের সঙ্গে কথা বলব। তুমি ওপরে গিয়ে জামাকাপড় গুছিয়ে নাও একটা সুটকেসে। বাচ্চাদের যা যা দরকার হবে সবই প্যাক করে নাও। একটু পরেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। চালাকি করতে গেলে কি হবে জানো তো?'

'তুমি আমাদেরকে চিটাগাং নিয়ে যেতে চাচ্ছ?'

'এই তো বুদ্ধি খুলেছে এতক্ষণে। এখন ওপরে যাও। দশ মিনিটের চেয়ে বেশি দেরি যেন না হয়। ক্ষুরটা ছাড়াও একটা রিভলভার আর একটা ব্লো টর্চ আছে আমার কাছে। জানালা দিয়ে লাফ দেবার চেষ্টা কোরো না যেন। ঠিক আছে?' রুস্তম শের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় গুনতে শুরু করলে মোনা দোতলার সিঁড়ির দিকে ছুটল।

সুটকেসে কাপড়চোপড় গোছাতে গোছাতে নিচে রুস্তম শেরের গলা শুনতে পাচ্ছে মোনা, তবে কথাগুলো স্পষ্ট নয়। দ্রুতহাতে

বাচ্চাদের ক্রিম, পাউডার, হ্যাণ্ড টাওয়াল, জামাকাপড় ভরছে সুটকেসে। একা হলে সত্যিই জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে দ্বিধা করত না মোনা, কিন্তু বাচ্চা দুটো নিয়ে তা সম্ভব নয়। রুস্তম শেরও তা জানে। সেলাই-বাক্সে রাখা কাঁচিটা দেখে প্রাণ জাগল মনে। দ্রুতহাতে দুটো সেফটিপিন দিয়ে শাড়ির নিচে পেটিকোটের সঙ্গে আটকে নিল কাঁচিটা।

ঠিক তক্ষুনি রুস্তম শের ডাকল, 'হয়েছে?'

'এই তো আসছি,' চেঁচিয়ে জবাব দিল মোনা। রুপকে কোল থেকে তুলে নিতেই ঘুমের মধ্যে কাঁদতে শুরু করল। রুমকিও নড়াচড়া করতে শুরু করেছে। দু'জনকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে নিচে নেমে এল মোনা। রুস্তম শের অন্যমনে টেলিফোন গাইডের ওপর পেন্সিল টুকছে। হলুদ রঙের এইচ-বি পেন্সিল। জাহিদের স্টাডিতে ঠিক এই পেন্সিলই আছে। কোথায় পেল রুস্তম শের? স্টাডিতে তো যায়নি। বাচ্চাদেরকে সোফায় বসিয়ে দিতে দিতে টেলিফোন গাইডের ওপর লেখা বাক্য দুটো পড়ল মোনা। 'আমি এখন কোথায়, বল তো?' আর তার নিচে, 'মুখ খুললে মরবে।'

মোনার বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে রুস্তম শের চোখ টিপল, 'এক্ষুনি একটা ফোন আসবে।'

সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল টেলিফোন সেটটা।

জাহিদের সঙ্গে কথা বলার পর মোনা একটু আশ্বস্ত হল। জাহিদ নিশ্চয়ই কিছু একটা উপায় বের করবে। জঘন্য মূর্তিটার দিকে চেয়ে এখন ভয়ের চেয়ে ঘৃণা আর রাগই বেশি হচ্ছে।

'মেয়েটাকে আমার কাছে দাও, বাইরে একটু কাজ আছে। একটা বাচ্চা আমার কাছে থাকলে তোমার মাথায় আজেবাজে চিন্তা ঢুকবে না।' হাত বাড়িয়ে দিল রুস্তম শের।

'খবরদার! আমার বাচ্চাদের গায়ে হাত দেবে না!' দু'হাতে ওদেরকে শান্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরেছে মোনা।

দাঁতহীন মুখের ভেতর ফুলে ওঠা কালচে জিভটা কাঁপিয়ে নিঃশব্দে হাসল রুস্তম শের। 'কি আশ্চর্য! কেমন করে ভাবলে ওদের কোন ক্ষতি করব আমি! শত হলেও আমি ওদের জন্মদাতা।'

'শাট আপ! কক্ষণও একথা উচ্চারণ করবে না বলছি!' রাগে দুঃখে চেঁচিয়ে উঠল মোনা।

'তোমার মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখ,' এখনও হাসছে রুস্তম শের।

রুমকির দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল মোনা। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মেয়েটা রুস্তম শেরের দিকে, বীভৎস চেহারা দেখে একটুও ভয় পাচ্ছে না।

'দেখলে? বাবার কোলে আসতে চাইছে মেয়েটা।' মোনার কোল থেকে রুমকিকে তুলে নিল রুস্তম শের। কাঁদতে শুরু করল মোনা, রূপককে জড়িয়ে ধরেও মনে হচ্ছে ওর কোল ফাঁকা হয়ে গেছে।

'ওর কোন ক্ষতি হলে খুন করে ফেলব তোমাকে,' মোনার চোখে শুধু আক্রোশ।

'তুমি কোন বোকামি করে না বসলে ওদের কোন ভয় নেই।' রুস্তম শেরের কোলে শব্দ করে হাসছে রুমকি, একদৃষ্টে চেয়ে আছে বিকৃত কুৎসিত মুখটার দিকে। প্রত্যুত্তরে রুস্তম শেরও হাসল। 'পাশের বাড়িটা তো সুনীল দত্তের, তাই না?'

অবাক হতে ভুলে গেল মোনা। 'ওরা তো এখানে নেই। এক মাসের জন্যে কোলকাতায় বেড়াতে গেছে, মিসেস দত্তের বাড়ি কোলকাতাতেই।'

'জানি। কিন্তু ওদের গাড়িটা তো গ্যারেজেই রেখে গেছে। আমি গিয়ে গাড়িটা নিয়ে আসছি। তুমি মালপত্র নামিয়ে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াও। আরে, তোমার ছেলেও দেখি আমাকে পছন্দ করে ফেলেছে!'

রূপক মোনার কোল থেকে মন্ত্রমুগ্ধের মত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রুস্তম শেরের দিকে, খলখল করে হাসছে। অসুস্থ বোধ করল মোনা, লোকটা কি জাদু জানে? রূপকের দিকে হাত নেড়ে ওয়েভ করে বেরিয়ে গেল রুস্তম শের। কোয়ার্টারের গ্যারেজগুলো পেছনদিকে এক সারিতে বানানো, যাদের গাড়ি নেই তারা স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করে। সুনীল দত্ত গতবছর ডক্টরেট করে ফেরার সময় বিদেশ থেকে গাড়ি নিয়ে এসেছে। বড় শখের গাড়ি, বেচারা জানবে যখন না জানি কি করবে!

সুটকেস নিয়ে বাইরে এসে মিনিট দুয়েক দাঁড়াতেই গাড়ি নিয়ে চলে এল রুস্তম শের। মোনা নিজেই দরজা খুলে পেছনের সিটে উঠে বসল রূপককে কোলে নিয়ে। সুটকেসটা পায়ের কাছে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। রুস্তম শের সামনে থেকে রুমকিকে ওর কাছে ফিরিয়ে দিল। রুমকি অনিচ্ছার সঙ্গে মায়ের কোলে ফিরে এল, এখনও তাকিয়ে আছে রুস্তম শেরের দিকে। রূপকও হাত বাড়িয়ে ওকে ওয়েভ করছে।

বাঁ হাতে শাড়ির নিচে লুকানো কাঁচিটা স্পর্শ করল মোনা। প্রথম সুযোগেই ব্যবহার করতে হবে এটা।

সতেরো

ডেইরি ফার্ম আর শহরের কাছাকছি বলে এই সময়টাতে হাইওয়েতে ভিড় লেগেই থাকে। ট্রাক আর প্যাসেঞ্জার বাসের আধিক্য দেখে জাহিদ

আশ্বস্ত হল। রাস্তা খালি থাকলে প্ল্যানটা কাজে লাগানো কঠিন হত। পুলিসের জিপ আর ওর পাবলিকার মাঝখানে একটা ট্রাক আছে। হাইওয়েটা যেখানে সমকোণে বাঁক নিয়েছে, তার কাছাকাছি এসে খুব ধীরে ধীরে জাহিদ স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে একটা প্যাসেঞ্জার বাসকে ওভারটেক করল। এখন ওদের মাঝে ট্রাক ছাড়াও একটা বাস। হাবিব আর জসিম কিছু সন্দেহ করেনি। ওরা হয়ত স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারবে না জাহিদ কেটে পড়ার তালে আছে।

বাঁকটা ঘুরেই দ্রুতগতিতে ডানদিকের সাইড রোডে নেমে গেল জাহিদ, কাঁচা রাস্তা ধরে মিলিয়ে গেল গাছগাছালির ভেতর। ট্রাক আর বাসের জন্যে আগে থেকেই ওদের দৃষ্টির আড়ালে ছিল জাহিদ, অনেকটা এগিয়ে যাবার আগে টেরই পাবে না হাবিব আর জসিম কখন সে অদৃশ্য হয়েছে। টের পেলেও উল্টোদিক থেকে আসা ট্রাফিকের জন্যে হঠাৎ করে গাড়ি ঘোরাতে পারবে না।

কিছুটা এগিয়ে আবার হাইওয়েতে উঠল জাহিদ। এবার উল্টোদিকে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে গেছে, মনে হল পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে নিজের হার্টবিটের শব্দ। স্পীডোমিটারের কাঁটা সত্তরের ঘর ছুঁইছুঁই করছে। আশেপাশের যানবাহন ছিটকে দূরে সরে যাচ্ছে গালাগাল দিতে দিতে। ওদিকে নজর দিচ্ছে না জাহিদ। মাইল পাঁচেক দূরে হাইওয়ে থেকে একটু ভেতরে একটা ওয়ার্কশপের সামনে থেমে স্টার্ট বন্ধ করল। এখনও বিশ্বাস হতে চাচ্ছে না এইমাত্র বেআইনী একটা কাজ করে এসেছে ও।

ওয়ার্কশপের মালিক ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। 'আসালামুআলাইকুম, স্যার, কেমন আছেন? ঈদ মোবারক!' বছর ত্রিশেক বয়স, জাহিদের এক ছাত্রের বড় ভাই। গাড়ির যাবতীয় কাজ এখানেই করায় জাহিদ।

কোলাকুলি সেরে জাহিদ খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'গাড়িটা রেখে যাচ্ছি। ব্রেকটা শওগোল করছে,' তাহা মিথ্যে কথা, 'আর স্পেয়ার

টায়ারটা রিপিয়ার করে রেখ। তাড়াহুড়ার দরকার নেই, দু'পাঁচদিন দেরি হলেও আমার কিছু অসুবিধে হবে না।' জাহিদ জানে এই গাড়ি নিয়ে চিটাগাং যাওয়া যাবে না, পুলিস অতি সহজে ধরে ফেলবে। এখানে রেখে গেলে গাড়িটার নিরাপত্তা সম্বন্ধে অন্তত নিশ্চিন্ত থাকা যাবে। তাছাড়া আর একটা গাড়ি দরকার, সেজন্যে ফোন করতে হবে। রাস্তা থেকে গাড়ি চুরি করার মত হিম্মত এখনও ওর হয়নি। তাছাড়া এই গেয়ো বাজার এলাকায় রাস্তায় গাড়ি দেখা যায় কদাচিৎ। বাস বা টেম্পো ধরে কিছুতেই সন্ধ্যার আগে চিটাগাং পৌছানো যাবে না। কার কাছে গাড়ি চাইবে, তাও ঠিক করে রেখেছে মনে মনে। একটু ইতস্তত করে জাহিদ বলল, 'কামাল, তোমার ফোনটা ঠিক আছে তো? একটা ফোন করতে হবে।'

'হ্যাঁ, স্যার। ভেতরে আসেন।'

ঘড়ি দেখল জাহিদ। ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়েছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেল। আবুল হাশেম ভুঁইয়া কি এখনও অফিসে আছে?

চার নম্বার রিঙের পর ওদিক থেকে রিসিভার ওঠাল কেউ, 'হ্যালো?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জাহিদ, 'হাশেম ভাই, আমি জাহিদ বলছি।'

'কি ব্যাপার? কিছু ফেলে গেছ নাকি?'

'না না, ওসব কিছু না। হাশেম ভাই, আমি একটা বিপদে পড়েছি।' ওদিক থেকে কোন উত্তর না আসাতে আবার বলল, 'আমার বডিগার্ডদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

'হুঁ।' আর কিছু বললেন না ডক্টর ভুঁইয়া।

'আমার একটা গাড়ি দরকার। আপনি বলেছিলেন সাহায্যের দরকার পড়লে বলতে।'

'হ্যাঁ, মনে আছে। কিন্তু আরও বলেছিলাম পুলিসের ওপর বিশ্বাস রাখতে,' আস্তে ভাবলেশহীন কণ্ঠে বললেন তিনি।

ভয়ে দমবন্ধ হয়ে এল জাহিদের। গাড়ি না পেলে আবার নতুন করে প্ল্যান করতে হবে। সন্ধের আগে পৌঁছাতে না পারলে কি হবে খোদাই জানে! 'হাশেম ভাই...'

'ঠিক আছে,' ওকে থামিয়ে দিলেন ডক্টর ভুঁইয়া। 'আমার গাড়িটা নিতে পার, তবে ক্ষয়ক্ষতি হলে খরচপাতি তোমার।'

কাঁধের ওপর থেকে বিরাট বোঝা নেমে গেল। 'কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব...'

'দাঁড়াও। আর একটা শর্ত আছে। ফিরে এসে সবকিছু খুলে বলতে হবে আমাকে। চড়ুই পাখির কথা কেন জানতে চেয়েছিলে, সাইকোপম্পের উল্লেখ করায় কেন তোমার চেহারা সাদা হয়ে গিয়েছিল, সব খুলে বলতে হবে।'

হাসল জাহিদ। 'সব বলব, হাশেম ভাই, সব বলব। আবার ভাগ্য ভাল হলে আপনি হয়ত বিশ্বাস করেও ফেলতে পারেন।'

'তুমি কি গাড়ি নিতে আসবে?'

'যদি আপনার অসুবিধা না হয় গাড়িটা নিয়ে চৌরাস্তায় চলে আসুন। আমি চা দোকানটার কাছে থাকব।'

ফোন ছেড়ে কামালের কাছে বিদায় নিয়ে মোড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করল জাহিদ। পায়জামা পাঞ্জাবী পরে আছে ও। সাধারণ পথচারীদের ভিড়ে মিশে যেতে অসুবিধা হল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ওর পরিচিত পরিমণ্ডলের পরিধি খুবই ছোট, চেনা কারও সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা কম। ছাত্ররা কেউ না দেখলেই হল। ডক্টর ভুঁইয়ার গাড়ি ধার করার ব্যাপারটা গোপন রাখতেই হবে।

চা দোকানের সামনে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে জাহিদ। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হাইওয়ের দিকে নজর রাখছে পুলিসের গাড়ি দেখা যায় কিনা। প্রায় বিশ মিনিট পর দেখা গেল ডক্টর ভুঁইয়ার মেরুন রঙের ফোক্সওয়াগেনটাকে। দোকানের ছাউনির তলা থেকে বেরিয়ে এল

জাহিদ।

গাড়ি থেকে নেমে এক হাতে চাবি আর এক হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগ বাড়িয়ে ধরলেন ডক্টর ভুঁইয়া। 'তোমার দরকার হতে পারে ভেবে দু'একটা জিনিস নিয়ে এসেছি।'

পলিথিনের ব্যাগটা খুলে কৃতজ্ঞতায় জাহিদের দু'চোখ জলে ভরে গেল। একটা বড় ফ্রেমের সানগ্লাস, সাদা রঙের একটা স্পোর্টস্ ক্যাপ—পুরোপুরি ছদ্মবেশ না হলেও এ দুটো পরা অবস্থায় জাহিদকে চেনা কষ্ট হবে—আর তিনটে চকোলেট-বার বের হল ব্যাগটা থেকে। খাবার কথা ও ভুলেই গেছিল, অথচ ডক্টর ভুঁইয়া ভোলেননি।

'ট্যাংকে তেল নেই। আসার পথে পেট্রল পাম্প পড়েনি, তাই কিনতে পারিনি। কতদূর যাবে তুমি তা তো জানি না। তবে যা তেল আছে তাতে বড় জোর আর মাইল দশেক চলবে।' পকেট থেকে কাঠের তৈরি ইঞ্চি তিনেক লম্বা ফাঁপা একটা দণ্ড বের করে জাহিদের হাতে দিলেন তিনি, বললেন, 'এটা হল "বার্ড-কলার-হুইসল্"। গত বছর যখন ব্রেজিলে গিয়েছিলাম, এক রেড ইণ্ডিয়ান আদিবাসী এটা উপহার দিয়েছিল আমাকে। হঠাৎ করে মনে হল তোমার কাজে লাগতে পারে, তাই নিয়ে এলাম। এটায় ফুঁ দিয়ে পাখিদের ডাকতে হয়।'

কি বলবে বুঝতে পারল না জাহিদ, অনেক কষ্টে আবেগ দমন করার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ডক্টর ভুঁইয়া, 'জাহিদ, বাঁশিটা আর বোধহয় তোমার দরকার হবে না। ওই দ্যাখ!'

ওনার দৃষ্টি অনুসরণ করে রোমাঞ্চিত হল জাহিদ। কয়েক শ' চড়ুইপাখি বসে আছে ওর পেছনে দোকানের ছাদে, গাছের ডালে। আরও অগুনতি নেমে আসছে পেছনের গ্রামের ওপর দিয়ে। নিঃশব্দে। শিউরে উঠল জাহিদ। আশেপাশের দু'একজন লোক কৌতূহলী চোখে দেখছে। পাখিগুলো একদৃষ্টে চেয়ে আছে জাহিদের দিকে কালো পুঁতির

মত পলকহীন চোখে, অন্য কোনদিকে মনোযোগ নেই। ওপরের সব জায়গা ভর্তি হয়ে গেলে মাটিতে এসে বসতে লাগল চড়ুই পাখির ঝাঁক—ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বৃত্তটা জাহিদকে মাঝে রেখে।

'মাই গড!' কাঁপা গলায় বলে উঠলেন ডক্টর ভুঁইয়া, 'সাইকোপম্প! এসব কি ঘটছে?'

চারপাশের লোকজনও বিমূঢ় হয়ে বোঝার চেষ্টা করছে ব্যাপারটা। এগিয়ে গিয়ে মাটিতে পা ঠুকল জাহিদ, একটুও ভয় পেল না পাখিগুলো, ডানা ঝাপটে কয়েক পা পিছিয়ে গেল শুধু।

'যাহ্!' ফিসফিস করে বলে উঠল জাহিদ: 'রাস্তম শেরের কাছে উড়ে যা!'

মুহূর্তে সবগুলো পাখি একসঙ্গে ডানা মেলল, নিমেষে কালো হয়ে গেল আকাশ। বাজারের লোকজন জটলা পাকিয়ে তামাশা দেখছে। দক্ষিণ দিকে উড়ে চলেছে বিশাল কালো চাদরের মত ঝাঁকটা।

জাহিদের হাত চেপে ধরলেন ডক্টর ভুঁইয়া। 'জাহিদ, পাখিগুলো কোথায় যাচ্ছে তুমি জানো, তাই না?'

'হ্যাঁ। জানি। আমাকেও যেতে হবে, হাশেম ভাই। অনেক উপকার করেছেন, কিভাবে প্রতিদান দেব জানি না। দোয়া করবেন, আমার স্ত্রী আর বাচ্চাদের জন্যে।'

ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ডক্টর ভুঁইয়া। 'সাবধানে থেক, জাহিদ, খুব সাবধান! আমি সবসময় চিন্তায় থাকব, বিপদ কেটে গেলে একটা খবর দিয়ো।'

জাহিদের বন্ধ চোখের কোল বেয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে নেমে ভিজিয়ে দিল ডক্টর ভুঁইয়ার কোটের আস্তিন।

আঠারো

অবশেষে লণ্ডনে ডক্টর জে. ম্যাকলিনকে ফোনে পাওয়া গেল। এরমধ্যে ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান আরও তিনদিন চেষ্টা করেছে, তখনও তিনি লণ্ডনে ফেরেননি। দুপুর সাড়ে তিনটে, জাহিদ তখন ডক্টর ভুঁইয়ার ফোক্সওয়াগেন নিয়ে কুমিল্লা পেরিয়ে গেছে।

অপারেটরের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরের পর ডক্টর ম্যাকলিনের গলা ভেসে এল, 'হ্যালো, জেরেমি স্পিকিং।' লোকাল কলের চেয়েও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

'আমি বাংলাদেশ থেকে একজন পুলিস অফিসার বলছি, ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান। একটা হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ব্যাপারে আপনাকে খুঁজছি বেশ ক'দিন ধরে।'

'হত্যাকাণ্ড! বলেন কি! অপারেশন টেবিল ছাড়া কোথাও কাউকে আমি খুন করিনি, ইন্সপেক্টর। তা-ও রিটায়ার করেছি প্রায় পনেরো বছর হয়ে গেল।' হা হা করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল ডাক্তার, কণ্ঠস্বর শুনে মনেই হয় না ভদ্রলোকের বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে।

লজ্জা পেল শাহেদ। 'না না, আপনাকে অভিযুক্ত করার ইচ্ছা বা অধিকার কোনটাই আমার নেই। আসলে তদন্তের সাথে জড়িত এক লোকের ব্যাপারে আপনাকে এতদূর থেকে ফোন করেছি। প্রায় ত্রিশ বছর আগে আপনি ভদ্রলোকের মগজ থেকে একটা টিউমার অপসারণ

করেছিলেন। তখন অবশ্য সে এগারো-বারো বছরের কিশোর, তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে...'

'জাহিদ হাসান, ১৯৬০ সালে। আমার মনে আছে, কি হয়েছে ওর? কি করছে সে আজকাল?'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল শাহেদ। চিন্তাই করতে পারেনি এত বছর পরেও বৃদ্ধ এই ভদ্রলোক ঘটনাটা মনে রাখবেন। বরং মনে করাবার জন্যে নানা রকম কসরৎ করতে হবে বলেই ধরে নিয়েছিল ও। 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। পেশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তবে লেখক হিসেবেও খুব নাম করেছেন।'

'বাহ্! যতদূর মনে পড়ে ওর বাবা বলেছিলেন ছেলেটা ভবিষ্যতের শেক্সপিয়ার। আমি সাধারণত প্রাক্তন রোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি, অবশ্য প্রয়োজন বিশেষে। একমাত্র জাহিদ হাসানের সঙ্গেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় দূরত্বের কারণে। পরবর্তী জীবনে এজন্যে সবসময় নিজেকে দোষারোপ করেছি। ঠিক কি জানতে চান আপনি?'

'এতবছর পর ভদ্রলোক আবার মাথা ব্যথায় ভুগছেন, ঠিক মাথা ব্যথা নয়। আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। উনি বলছেন টিউমার অপারেশনের আগে ঠিক ওরকমই হত।'

'স্ট্যাণ্ডার্ড টেস্টগুলো করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, সবই নেগেটিভ।'

'যাই হয়ে থাকুক না কেন, আমার মনে হয় না আগের টিউমারের সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ আছে। আচ্ছা, এই ছেলেটা কি খুনের সাক্ষী? নাকি তাকে খুনী বলে সন্দেহ করছেন?'

অপ্রস্তুত হয়ে গেল শাহেদ। 'মানে...আমি...'

'ব্রেন টিউমারের রোগীরা অনেক সময়ই অদ্ভুত আচরণ করে থাকে। তবে ছেলেটার মগজে আসলে কোন টিউমার ছিল না, অন্তত স্বাভাবিক কোন টিউমার নয়। এই ধরনের ঘটনা পৃথিবীতে আর মাত্র

তিনবার দেখা গেছে।'

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, নিজের অজান্তেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে শাহেদ। 'আমি জানি আপনারা রোগীর যাবতীয় তথ্য কনফিডেনশিয়াল হিসেবে গণ্য করেন। কিন্তু এই মুহূর্তে...'

'না না, জানতে আমার কোন আপত্তি নেই। বরং আজকাল আমার মনে হয় ছেলেটার বাবাকে ব্যাপারটা খুলে বললেই আমি ভাল করতাম। ঘটনাটা এতই অসাধারণ ছিল যে জাহিদ হাসানকে এতদিন পরেও ভুলিনি আমি।'

সময় বয়ে যাচ্ছে, কোন মুহূর্তে লাইন কেটে যায় কে জানে! শাহেদ একটু তাড়া দিল, 'ডক্টর, ঠিক কি হয়েছিল জাহিদের?'

'প্রচণ্ড মাথাব্যথায় ভুগছিল ছেলেটা, সঙ্গে ফ্যানটম সাউণ্ড...'

'ফ্যানটম সাউণ্ড...সেটা আবার কি?'

'মগজে টিউমার থাকলে রোগী অনেকসময় নানা ধরনের শব্দ শুনতে পায়। জাহিদ শুনত চড়ুই পাখির চেঁচামেচি। এরপরই মাথা ব্যথা দেখা দিত। ধীরে ধীরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। টিউমার ভেবেই অপারেট করি আমি, কিন্তু দেখা গেল সেটা ছেলেটার যমজ ভাই।'

'হোয়াট?' শাহেদের ঘাড়ের পেছনের চুল সড় সড় করে দাঁড়িয়ে গেল।

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। তবে খুব একটা অবাক হবার কিছু নেই। যমজ ভ্রূণ বেশিরভাগ সময় বেড়ে ওঠার আগেই এককে রূপান্তরিত হয় জরায়ুর ভেতরে থেকেই। তবে অনেকসময় এই রূপান্তর সম্পূর্ণ হয় না। জাহিদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। সহজ ভাষায় বলতে গেলে ভ্রূণ অবস্থায় জাহিদ ওর যমজ ভাইকে খেয়ে ফেলেছিল। বোনও হতে পারে, তবে আমার ধারণা সেটা ভাই-ই ছিল। ফ্যাটারনাল টুইন্সের ক্ষেত্রে এ ধরনের রূপান্তরের ঘটনা অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়, পরিসংখ্যান তাই বলে। অসম্পূর্ণ ভ্রূণের ভগ্নাংশ আশ্রয় নেয় জাহিদের

মগজে। আমার ধারণা ওর কৈশোরোদ্গমের (পিউবার্টি) সঙ্গে সঙ্গে টিস্যুগুলো বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তাতেই ছেলেটা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে আমার ধারণা ফরেন টিস্যু সবটুকুই আমি কেটে বাদ দিতে পেরেছি।'

গলা শুকিয়ে গেছে শাহেদের, মনে হচ্ছে এতক্ষণ ধরে ভৌতিক বা সায়েন্স ফিকশন মুভি দেখেছে। কোনমতে ঢোক গিলে বলল, 'অদ্ভুত! অবিশ্বাস্য! আপনি বলছেন জাহিদ ব্যাপারটা জানে না?'

'না, কাউকেই বলিনি আমি। ওর বাবা শুনলে শুধুশুধু ভয় পেতেন। তবে অপারেশনের পর এমন একটা রহস্যময় ঘটনা ঘটে যার সঙ্গে এর কোন তুলনাই হয় না।'

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল শাহেদের। 'কি হয়েছিল?'

চুপ করে একটু দম নিয়ে নিলেন বৃদ্ধ ডাক্তার। তারপর বললেন, 'জাহিদের অপারেশনের পরও স্টেবল্ আছে দেখে আমি টেনিস খেলতে চলে যাই। তাই ঘটনার সময় আমি হাসপাতালে উপস্থিত ছিলাম না। ছেলেটাকে ও. টি. থেকে বের করে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে যাবার পরপরই লক্ষ লক্ষ চড়ুই পাখি লণ্ডন জেনারেল হসপিটাল আক্রমণ করে।'

'মানে? ঠিক কি...'

'শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, তাই না? লাইব্রেরিতে গিয়ে খুঁজে দেখলে ওই সময়ের স্থানীয় খবরের কাগজে ঘটনাটার বিবরণ পেয়ে যাবেন। পূর্ব দিক থেকে বিশাল এক ঝাঁক চড়ুই পাখি উড়ে এসে সরাসরি হাসপাতালের দক্ষিণ দিকে আঘাত হানে, ওখানেই ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, যেখানে জাহিদকে রাখা হয়েছিল। ওদিকের বেশিরভাগ কাঁচের জানালা ভেঙে পড়েছিল, পরে প্রায় তিন শো চড়ুই পাখির মৃতদেহ সরানো হয়। ওদিকের দেয়াল প্রায় পুরোটাই কাঁচের তৈরি। খবরের কাগজে বলা হয়েছিল সূর্যের আলো কাচের

দেয়ালে প্রতিফলন ঘটালে চড়ুই পাখির ঝাঁক দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ওদিকে ধেয়ে যায়।'

'ব্যাখ্যাটা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য শোনাচ্ছে না।'

'ঠিক তাই। জাহিদ হাসান মাথাব্যথার আগে চড়ুই পাখির শব্দ শুনত। আমি ডাক্তার, অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু মনে হয় জাহিদের অপারেশনের সঙ্গে এই ঘটনার সম্পর্ক আছে।'

'পাখিরা আবার উড়ছে!' বিড়বিড় করে উঠল শাহেদ।

'কি বললেন?'

'না না, কিছু না। বলে যান।'

'আর তেমন কিছু বলার নেই। আমি কি আপনার কৌতূহল মেটাতে পেরেছি?'

'নিশ্চয়ই, ডক্টর। অসংখ্য ধন্যবাদ,' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে শাহেদের, ঠোঁট দুটো মনে হচ্ছে ঠাণ্ডায় জমে গেছে।

'জাহিদকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন, গুডবাই।'

'গুডবাই, ডক্টর।'

মাথায় হাত দিয়ে নির্বাক হয়ে বসে রইল শাহেদ। স্বপ্নেও কল্পনা করেনি সব ঘটনার পেছনে এ ধরনের একটা ব্যাখ্যা থাকতে পারে। ব্যাখ্যাটা যে ঠিক কি, এখনও তা পরিষ্কার নয়। জাহিদ একক কোন ব্যক্তিত্ব নয়, সবসময় ওর মধ্যে অন্য একটা লোক বাস করে এসেছে—এটুকু মেনে নিতেই হবে। যুক্তিগ্রাহ্য না হলেও ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর ভয়েসপ্রিন্টও এই ব্যাখ্যাকে সমর্থন করছে। ডক্টর ম্যাকলিনের ধারণা কৈশোরোদ্গমের সাথে সাথে জাহিদের মগজে চেপে বসা ওর যমজ ভ্রূণের অবশিষ্টাংশ বাড়তে শুরু করে। শাহেদের ধারণা অন্যরকম। ওই সময়েই জাহিদ লিখতে শুরু করেছিল, আর ওর অজান্তেই ওর ভেতরে বাড়তে থাকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা সত্তা। শিউরে উঠল শাহেদ। আর যাই হোক, জাহিদের মুখ থেকে শোনা গল্প হেসে উড়িয়ে দিতে পারছে

না।

ডিউটি শেষ করে বের হবার ঠিক আগের মুহূর্তে ফোনটা বেজে উঠল। বিরক্ত হল শাহেদ। রিসিভার উঠাতে হল নেহায়েত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, 'পতেঙ্গা থানা।'

'হ্যালো, ইন্সপেক্টর সাহেব, আমি ওসমান সদাগর বলছি।'

বিরক্তি চরমে উঠল। শাহেদের ধারণা লোকটা স্মাগলার। প্রচুর টাকাপয়সার মালিক, শাহেদকে নানাসময়ে বিভিন্ন মূল্যবান ভেট গছাবার চেষ্টা করেছে। 'কি ব্যাপার, বলেন?' সংক্ষেপে সারতে চাইল শাহেদ।

'এই মানে...আমার একানে একটু ঝামেলা হয়েচে আর কি। আমার বাড়ির পেছনে যে গোয়ালঘরটা আছে, আমার মনে হয় কোন গাড়ি চোর ওকানে গাড়ি লুকিয়ে রেকেছিল,' প্রাণপণে শুদ্ধ কথা বলার চেষ্টা করছে ওসমান সওদাগর। থানা থেকে মাইল দুয়েক দূরে ওর বাড়ি। কিছুদিন আগে ডেইরি ফার্ম খোলার চেষ্টা করেছিল, মাস ছয়েকের মধ্যেই লাটে ওঠে। ওর বাড়ির পেছনে কয়েক বিঘা খালি জমিতে চালাঘরগুলো এখন রোদে পুড়ছে আর বৃষ্টিতে ভিজছে। জাহিদের ধারণা জাহাজ থেকে নামানো চোরাই মালের গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করছে সে জায়গাটাকে।

'কেমন করে বুঝলেন ওখানে চোরাই গাড়ি ছিল?'

'একটু আগে জানালা দিয়ে দেকলাম আৎকা একটা বিরাট গাড়ি গোয়ালঘর থেকে বাইরে চলি আইসল। আমাকে না বলি কেউ তো ওকানে গাড়ি রাকবে না।'

'কি গাড়ি ছিল ওটা, দেখেছেন?' কাগজ কলম নিয়ে তৈরি হল শাহেদ।

'কালা রঙের ফোর্ড এসকর্ট। আমার চোক তো আল্লার রহমতে একনও বেশ ভাল, নাম্বারটাও লিকে রাকছি। খুলনার নাম্বার প্লেট।

ড্রাইবারের মুখ দেকি নাই। বিরাট শরীল, চওড়া কাঁধ।'

লিখতে লিখতে শাহেদ হঠাৎ চমকে উঠল। কোথায় যেন কে কালো ফোর্ড এসকর্টের কথা বলেছিল, খুলনার নাম্বার প্লেট! হ্যাঁ, মনে পড়েছে। জাহিদ খুনীর বর্ণনা দিচ্ছিল, কালো ফোর্ড এসকর্ট চালায়, খুলনার নাম্বার প্লেট!

'নাম্বারটা লিকেছেন তো, ইন্সপেক্টর সাহেব?'

'অ্যাঁ···হ্যাঁ,' প্রাণপণে নিজেকে ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছে জাহিদ। 'আচ্ছা, ওসমান সাহেব, গাড়িটার বাম্পারে কি কোন স্টিকার লাগানো ছিল?'

'আপনি জানলেন ক্যামনে?' অবাক হয়ে গেল ওসমান সওদাগর। 'ওই একই ইস্টিকার লাগানো আছে আমার চেলের ঘরের দরজায়। এত দূর থেকে পড়তে না পারলে কি হবে, দেকেই চিনছি। ওটাতে লেখা আছে "ওস্তাদের মাইর শেষ রাতে"।'

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিল জাহিদ। ঘটনার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছে না। জাহিদের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

একবার রিঙ বাজতেই ওদিক থেকে অচেনা কোন লোক ফোন ধরল, 'হ্যালো, কে বলছেন?'

'আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছি, পতেঙ্গা থানার ইন্সপেক্টর। জাহিদ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'ওহ্! আমাদেরই উচিত ছিল আপনাকে জানানো, এদিকে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। আমি সাভার থানার ও. সি. বলছি।'

শাহেদের হার্টবিট বেড়ে গেল। জাহিদের বাসায় পুলিস! 'কি হয়েছে? জাহিদ সাহেব ঠিক আছেন তো?'

'উনি ঠিকই আছেন। ওনাকে যে দু'জন কনস্টেবল গার্ড দিচ্ছিল তাদেরকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বাড়ি এসে বউ-বাচ্চা নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেছেন। বাড়িতে যে দু'জন পাহারা দিচ্ছিল, তাদের লাশ

পাওয়া গেছে, যতদূর মনে হচ্ছে জাহিদ হাসানই খুন দুটো করেছে।'

ঘামতে শুরু করেছে শাহেদ, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না, 'কিভাবে পালিয়েছে ওরা?'

'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। জাহিদ হাসানের বাড়িতেই, যতদূর মনে হচ্ছে। সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে ওদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা ভাবছিলাম আপনাকে খবর দেব, কিন্তু এদিককার আলোয় সময় করে উঠতে পারছিলাম না। পরেপায় তো জাহিদ হাসানের বাড়ি, আপনি একটু ওদিকে লক্ষ্য রাখবেন। অবশ্য মনে হয় না ওখানে যাবে, সে ভাল করেই জানে পুলিস প্রথমেই ওর বাড়িতে যাবে।'

ফোন রেখে দিয়ে বসে বসে ঘামতে লাগল শাহেদ। কেমন করে তা হয়? জাহিদ হাসান কি মানসিক রোগী? পুরো ব্যাপারটাই নিজে নিজে কল্পনা করে নিয়ে সত্যি বলে ভাবতে শুরু করেছে? ফোর্ড এসকর্ট গাড়িটাও হয়ত ওরই, রুস্তম শেরের বলে চালাতে চাচ্ছে। লুকিয়ে রেখেছিল ওসমান সওদাগরের গোয়ালঘরে, যাতে কেউ না দেখে। কিন্তু ওসমান সওদাগর কেন এতদিন দেখেনি? শাহেদ জানে গোয়ালঘরটা চোরাই মালের গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করে সে, সেখানে একটা গাড়ি ক'দিন লুকিয়ে রাখা যাবে? হয়ত সত্যিই রুস্তম শের বেঁচে উঠেছে! হয়ত জাহিদ সত্যি কথাই বলছে। অন্তত ও যা বলেছে তা ও নিজে বিশ্বাস করে। কিন্তু শাহেদ কি এত সহজে বিশ্বাস করবে?

আনমনে থানা থেকে বেরিয়ে এল শাহেদ। ইচ্ছে করেই কাউকে কিছু জানাল না। ও জানে গায়ের জোর এখানে কাজে দেবে না, কাউকে সঙ্গে নেয়া মানে তার মৃত্যু ডেকে আনা। আগে রহস্যের জট খুলতে হবে। জানতে হবে পাখিরা কেন উড়ছে।

উনিশ

পুরো রাস্তা নতুন লেখার পরিকল্পনা নিয়ে বকবক করে গেল রুস্তম শের যেটা ও আর জাহিদ মিলে লিখবে। গল্পটা সে জানে, জাহিদকে শুধু লিখে দিতে হবে। মোনা আর বাচ্চাদের সঙ্গে খুবই ভদ্র ব্যবহার করছে। পথে দু'বার নির্জন রাস্তার পাশে থেমে বাচ্চাদের জামাকাপড় বদলাতে হয়েছে, দু'বারই রুস্তম শের মোনাকে সাহায্য করেছে, তবে ওর একটা হাত সবসময় অবসর ছিল। কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি রুস্তম শের। দুধ খেয়ে বাচ্চারা বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিয়েছে। বাজার এলাকা বা ফেরিঘাটে লোকজন ভয় আর কৌতূহল মেশানো চোখে চাদরে ঢাকা রুস্তম শেরকে দেখার চেষ্টা করেছে, তবে কেউ কোন প্রশ্ন করেনি।

পতেঙ্গার কাছাকাছি এসে গাড়ি বদলে নিয়েছে রুস্তম শের। মোনা টের পেয়েছে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওসমান সওদাগরের বাড়ির পেছনে চলে এসেছে ওরা। এখান থেকে ওদের বাড়ি আরও মাইল ছয়েকের রাস্তা। রূপককে জিম্মি হিসেবে সঙ্গে করে নিয়ে গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল রুস্তম শের। একটু পরেই কালো রঙের ফোর্ড এসকর্টটা চালিয়ে ফিরে এল। চমকে উঠল মোনা। গাড়িটা চিনতে একটুও অসুবিধা হয়নি, অথচ কোনদিন দেখেনি ও গাড়িটাকে। তবে চমকটা ভেঙে যেতে সময় লাগল না। রুস্তম শের

যখন স্বয়ং রক্তমাংসের শরীর নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে, এ তো নেহাতই একটা জড় পদার্থ! কিন্তু এখানে কিভাবে এল গাড়িটা? জাহিদ রুস্তম শেরকে গোর দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু জ্যান্ত অবস্থায়। মন থেকে ওকে মেরে ফেলতে পারেনি। তাই কবর খুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে সে। গাড়িটাকেও কি জাহিদ মনে মনে এখানেই লুকিয়ে রেখেছিল? রুস্তম শেরের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব হয়ে উঠেছে গাড়িটাও! রুস্তম শের জানত গাড়িটা এখানেই আছে, তাই অতিরিক্ত সাবধানতা বজায় রাখতে সুনীল দত্তর গাড়িটা জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে গেল। পুলিস যদি ভাঙা গ্যারেজের নিখোঁজ গাড়িটা খুঁজতে শুরু করে, তবে এই গাড়িতে থানার আশেপাশে যাওয়া বোকামি। রুস্তম শের জানে পুলিস একসময় পৌঁছে যাবে, তাতে ওর তেমন কোন ভয় নেই। শুধু একটু সময় দরকার ওর। লেখাটা শেষ করার মত সময়। এরপরে কোন ঝামেলাকেই ও কেয়ার করবে না। রুস্তম শেরের চারটে বই-ই জাহিদ পতেঙ্গার এই বাড়িতে বসে লিখেছে, সেজন্যেই কি যে কোন মূল্যে এখানে আসার ঝুঁকি নিয়েছে রুস্তম শের?

ফোর্ড এসকর্ট কারও সন্দেহ না জাগিয়ে বিনা বাধায় লাল ইঁটের দোতলা বাড়িটার গাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রুস্তম শেরের হাতে লাগেজ, মোনা বাচ্চাদের কোলে নিয়ে দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকল।

'আমি একটু বাথরুমে যাব,' ঘোষণা করল মোনা।

'ঠিক আছে,' রুস্তম শের সানগ্লাস আর চাদর খুলে ফেলেছে, মোনা ওর দিকে সরাসরি তাকাতে পারছে না, 'আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? বাথরুমের ভেতর তুমি কিভাবে থাকবে?' রাগে সাতখানা হয়ে ফেটে পড়ল মোনা।

'অত রাগের কি আছে, মেমসাহেব?' খলখল করে শূন্য দাঁতে প্রেতের মত হাসল রুস্তম শের। 'আমি দরজার পাশে বাইরে দাঁড়াব,

দরজাটা খোলা থাকবে।'

আপত্তি করে কোন লাভ নেই। দোতলায় উঠে এল ওরা। রুস্তম শের হাত বাড়াতেই খুশির শব্দ করতে করতে মোনার কোল থেকে লাফিয়ে ওর কোলে চলে গেল রূপক আর রুমকি। দুঃখে চোখে জল এল মোনার, বাচ্চা দুটো অচেনা লোক দেখলেই সিটিয়ে যায়। কোলে যাওয়া দূরের কথা। অথচ রাক্ষসের মত দেখতে এই লোকটাকে কেন ওরা এত পছন্দ করছে? কিচ্ছু করার নেই, বাথরুমের দরজা খোলা রেখেই কাজ সারল মোনা। ওর দিকে পিঠ দিয়ে বাচ্চাদের কোলে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে রইল রুস্তম শের।

শাড়িটা ঠিকঠাক করছে, হঠাৎ এই সময় লাফিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াল রুস্তম শের। 'বেরিয়ে এস! এক্ষুনি বেরিয়ে এস!' বাচ্চাদেরকে শোবার ঘরের মেঝেতে ছেড়ে দিয়ে মোনার হাত ধরে টানতে টানতে খাটের পাশে নিয়ে এল। 'কে যেন এদিকে আসছে! জাহিদ নয়। জাহিদ হলে আমি জানতাম!'

'আমি তো কিছু...'

'গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। তুমি শুনতে পাচ্ছ না?'

'না তো!' সত্যিই মোনা কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

'শোনার দরকার নেই। আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। হাত দুটো পেছনে আন,' পকেট থেকে একটা প্যাডহেসিভ টেপ বের করে খুলতে শুরু করেছে রুস্তম শের।

'বাচ্চারা...'

'কোন ভয় নেই। ওরা খেলা করুক। আমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে যাব।' মোনার হাত দুটো টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে। হঠাৎ এক ঝটকায় ওর পেটিকোট তুলে ধরে সেফটিপিন দিয়ে আটকানো কাঁচিটা নিপুণ হাতে খুলে নিয়ে এল রুস্তম শের। 'কিছু মনে কর না, ভদ্রতার সময় নেই এখন।' কাঁচি দিয়ে রোল থেকে

টেপটা কেটে নিল।

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে মোনা। 'তুমি জানতে!'

'কাঁচিটা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে যখন নামছিলে, তখনই তোমার চোখে ফুটে উঠেছিল। এই মুহূর্ত থেকেই আমি এটার অস্তিত্ব জানি।' হেসে উঠল রুস্তম শের। 'আর বোকামি করতে যেয়ো না যেন। যাই হোক, আমি বাইরে যাচ্ছি। দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি, বাচ্চারা সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ার ভয় নেই। বড় জোর মাটিতে পড়ে থাকা ধুলোবালি মুখে পুরবে, তাতে তেমন কোন ক্ষতি হবে না।'

বাইরে থেকে দরজায় হুড়কো দিয়ে বেড়ালের মত নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল রুস্তম শের, মিলিয়ে গেল ঘন গাছপালার আড়ালে।

শাহেদ ওসমান সওদাগরের বাড়ির আশেপাশের রাস্তায় কোন মালিকহীন গাড়ি দেখতে পেল না। ফোর্ড এসকর্ট যে নিতে এসেছে, সে নিশ্চয়ই পায়ে হেঁটে এতদূর আসেনি। তাছাড়া সঙ্গে বাচ্চা রয়েছে, যদি জাহিদ হয়ে থাকে, তবে যে গাড়িতে এসেছে সেটা আশেপাশেই কোথাও থাকবে। পেছনের জঙ্গলটাও দেখা দরকার।

রাস্তা ছেড়ে মেঠো পথ ধরে ধুলো উড়িয়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে জিপ চালাল শাহেদ। একটু খুঁজতেই নীল রঙের একটা গাড়ি পেয়ে গেল। নাহ্! জাহিদের পাবলিকা নয়। আশেপাশে লোকজন থাকে, তাদের কারও হতে পারে। গাড়িটা লুকিয়ে রাখা হয়নি, মেটে রাস্তার একপাশে যত্ন করে পার্ক করা। হয়ত পিকনিকে এসেছে ছেলেপিলে নিয়ে। তবু পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

জিপ ছেড়ে নেমে গাড়িটার চারপাশে ঘুরল শাহেদ। সন্দেহজনক কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পেছনের দরজার হাতলে চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল। লক করা হয়নি। কেন? সিটের ওপর হাঁটু গেড়ে উবু হয়ে

ভেতরে উঁকি দিল শাহেদ। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডটা লাফ দিল। বাচ্চাদের পায়ের ছোট্ট এক পাটি জুতো পড়ে আছে সিটের নিচে। অবশ্য এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। ঢাকার নাম্বার প্লেটওয়ালা যে-কোন গাড়িতে বাচ্চা থাকতেই পারে, এখানে গাড়ি পার্ক করার কোন বিধিনিষেধও নেই। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও গাড়িতে আর কিছুই পেল না শাহেদ, তবু মনটা খুঁতখুঁত করছে। মাথা নিচু করে গাড়ি থেকে বের হতে যেতেই বরফের মত জমে গেল।

ইগনিশনের তারগুলো ঝুলছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না চাবি দিয়ে নয়, তার ছিঁড়ে গাড়ি স্টার্ট দেয়া হয়েছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে অভ্যস্ত হাতের কাজ।

দু'এক মুহূর্ত ইতস্তত করল শাহেদ। থানায় খবর দেয়া দরকার। কিন্তু তাহলে একা যাওয়া হবে না ওর। এতগুলো নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের নায়ক যদি জাহিদের বাড়িটায় আশ্রয় নিয়ে থাকে, তবে সহকর্মীদের বিপদের মধ্যে ফেলার কোন মানে হয় না। ভেতরের রহস্যের কিনারা করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। হাজারটা প্রশ্ন ঘুরছে ওর মাথায় চরকির মত। একদিকে কর্তব্য, অন্যদিকে কৌতূহল। সত্যিই যদি ওটা রুস্তম শের হয়ে থাকে? জাহিদ যদি সত্যি কথাই বলে থাকে? জাহিদ নয়, হয়ত রুস্তম শেরই খুন করেছে গার্ডদের, কিডন্যাপ করেছে মোনা আর বাচ্চাদেরকে। তারপর জাহিদকে বাধ্য করেছে আসতে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে সেনাবাহিনী এলেও ওর কিছু করতে পারবে না। একা যাওয়াই স্থির করল শাহেদ, ওর সন্দেহের কথা কাউকে বলে বোকা বনার কোন মানে হয় না।

জাহিদের বাড়িটা মেইন রোড থেকে বেশ অনেকটা ভেতরে। কাঁচা রাস্তা ধরে যেতে প্রায় মাইল দুয়েক। কাঁটাতারের বেড়া দেখা যেতেই জিপ থামিয়ে নেমে এল শাহেদ। এখান থেকেই জাহিদের ভূসম্পত্তির

শুরু। ইঞ্জিনের শব্দে বাড়ির অতিথিদের চমকে দিতে চায় না শাহেদ। তাই জিপটা এখানেই রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। লোহার গেট খোলাই আছে, ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। আধা মাইলটাক হাঁটলেই বাড়িটা দেখা যাবে। সুরকি বিছানো রাস্তা ধরে নয়, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কোনাকুনি রওনা হল শাহেদ।

মাত্র সূর্য ডুবতে শুরু করেছে, কিন্তু ঘন গাছপালার ভেতর দিনের আলোর কিছুই অবশিষ্ট নেই। অসময়ে আঁধার নেমে এসেছে চারধারে। ডালপালা সরিয়ে হাঁটতে রীতিমত অসুবিধা হচ্ছে।

হঠাৎ উপরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল শাহেদ। আশেপাশের প্রতিটা গাছের ডালে সার বেঁধে বসে আছে অসংখ্য চড়ুই পাখি! পাখির ভিড়ে গাছের পাতা দেখা যাচ্ছে না, যতদূর চোখ যায় শুধু পাখি আর পাখি!

'মাই গড্!' ফিসফিস করে নিজের অজান্তেই বলে উঠল শাহেদ। চারপাশের নির্জনতায় ঢেউ তুলল এই অস্পষ্ট শব্দটুকু। কিন্তু পাখিরা একটুও নড়ল না। একদৃষ্টে চেয়ে আছে শাহেদের দিকে, মনে হচ্ছে যেন কারও দেহে প্রাণ নেই। কান পেতেও কোন শব্দ শুনতে পেল না শাহেদ, ঝিঁঝি পোকারা পর্যন্ত আজ ডাকছে না। চারধারে মৃত্যুর নীরবতা।

হোলস্টার থেকে রিভলভারটা খুলে হাতে নিয়ে কুঁজো হয়ে দ্রুতগতিতে এগুতে থাকল শাহেদ। জানতে হবে কালো ফোর্ড এসকর্ট গাড়িটা সত্যিই এখানে এসেছে কি না। যদি এসে থাকে, তবে কে চালিয়ে এসেছে? জাহিদ, নাকি অন্য কেউ? জাহিদের স্ত্রী আর বাচ্চাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই শাহেদের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু এত পাখি এল কোত্থেকে?

কিছুক্ষণ পর উঁচু মত একটা খোলা জায়গায় পৌঁছল শাহেদ। এখান থেকে বাড়ির একটা পাশ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সামনেটা গাছের

আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। মুখ তুলে আশেপাশে কোথাও চড়ুইপাখি দেখতে পেল না. ওকে অনুসরণ করেনি পাখিগুলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটু ডানদিকে সরে যাবার চেষ্টা করল শাহেদ, যাতে বাড়ির সামনেটা দেখা যায়।

বাঁ হাতে সেগুন গাছের একটা ডাল ধরে নিচে নামতে যেতেই বরফের মত জমে গেল শাহেদ।

ডান কানের পেছনে ধাতব কোন কিছুর শীতল স্পর্শ পেল. বিরক্তিকর কর্কশ কণ্ঠে পেছন থেকে কেউ বলে উঠল, 'একটু নড়েছ তো ঘিলু উড়িয়ে দেব।'

খুব ধীরে ধীরে ঘাড় ঘোরাল শাহেদ।

দেখার পর মনে হল এর চেয়ে অন্ধ হয়ে যাওয়াও ভাল ছিল। দুঃস্বপ্নেও কেউ এমন ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে না।

'উৎসবে যোগদানের জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি,' হো হো করে হেসে উঠল রুস্তম শের। হ্যাঁ, রুস্তম শের—শাহেদ ওর সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে এক মুহূর্তের মধ্যে। হাসতে থাকা মুখের ভেতর কালচে লাল বিরাট জিভটা জ্যান্ত সাপের মত নড়ছে, সাদা হয়ে ফুলে আছে দাঁত-শূন্য মাড়ী, অবশিষ্ট দু'একটা দাঁত কেমনমতে লেগে আছে পচধরা মাড়ীর সঙ্গে। মনে হচ্ছে কেউ যেন জ্যান্ত অবস্থায় লোকটার গায়ের চামড়া খুলে নিয়েছে। ফোসকার মত তাজা ক্ষত মুখ আর হাতের দৃশ্যমান অংশে, রক্ত মেশানো পুঁজ ভেসে উঠছে। এমনকি চুলহীন মাথাটাও ঢেকে গেছে ভেজা ভেজা ঘা'তে। মানুষ নয়, যেন অশরীরী আত্মা! এর কোন অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল না, থাকতে পারে না!

দারুণ জোরে ছুটতে পারেন কিন্তু আপনি, আমাকেই একটু হলে ধোঁকা দিয়ে দিচ্ছিলেন। অথচ আপনাকেই খুঁজতে এসেছি আমি। যাই হোক, বাচ্চা দুটো আমার হাতে আছে, জানেন তো? কোন গোলমাল

করবেন না। রিভলভারটা ছুঁড়ে ওই ক্যামশ্যাফটের তলায় ফেলে দিন।' খুব আন্তরিক কণ্ঠে বলল রুস্তম শের, খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে ওকে।

কথামত রিভলভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল শাহেদ। এই লোকের সঙ্গে চালাকি করার মানে হয় না। শাহেদের পেছন পেছন বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল রুস্তম শের।

এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে এই লোকটাই রুস্তম শের। উচ্চতা আর দৈহিক গঠন মিলে যাচ্ছে খাপে খাপে, কিন্তু এই অবস্থা হল কেমন করে? আর একবার শিউরে উঠল শাহেদ। স্ত্রী আর ছেলের কথা মনে করে মনটা কেঁদে উঠল, ওদেরকে আর দেখতে পাবে না ও। ওরা কি কোনদিন জানতে পারবে কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছে শাহেদ? কেউ কি বিশ্বাস করবে?

বাড়ির সামনে কালো ফোর্ড এসকর্টটা পার্ক করা। কাছে আসতে পেছনের বাম্পারে লাগানো স্টিকারটা পড়ল শাহেদ, 'ওস্তাদের মাইর শেষ রাতে।' হঠাৎ করেই কেন যেন ভয়টা কমে গেল, মনে হচ্ছে যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে সব কিছু। কোনকিছুই গায়ে লাগছে না।

'গাড়িটা কেমন? দারুণ না?' রুস্তম শের পেছন থেকে জানতে চাইল।

'চট্টগ্রামের সব পুলিস এই মুহূর্তে গাড়িটা খুঁজছে।'

উঁচু গলায় হেসে উঠল রুস্তম শের, 'এখনও আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন? আপনি তো মশাই সুবিধের লোক নন! যাই হোক, আজেবাজে কথা রাখুন। আমরা এখন জাহিদ হাসানের জন্যে অপেক্ষা করব।' রিভলভারের নল শাহেদের পিঠে ঠেকিয়ে সামনের দিকে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিল, 'ঘরে ঢুকুন, দরজা খোলাই আছে।'

পাশ ফিরে সামনের দিকে বাড়ানো রুস্তম শেরের বাঁ হাতের তালুর দিকে চোখ যেতে অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করল শাহেদ। ওপরের চামড়ায় ঘিনঘিনে ক্ষত, কিন্তু তালুর সাদাটে ফ্যাকাসে ত্বকে নিষ্কলুষ

নির্ভাজ—এমনকি একটা রেখা পর্যন্ত নেই!

দোতলায় শোবার ঘরে উঠে এল ওরা।

'ঠিক আছেন তো, শাহেদ সাহেব?' ওকে দেখে মোনা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, রূপক আর রুমকি মোনার দু'কাঁধ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমি অকারণে কাউকে ব্যথা দিই না,' রুস্তম শের ইঙ্গিতে কাবার্ডের ওপর বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রেখে যাওয়া কাঁচিটা দেখাল, 'মেমসাহেবের হাতের বাঁধনটা কেটে দিন তো, শাহেদ সাহেব! আপনিই তাহলে ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান! হুঁঃ।'

লোকটা ওকে চেনে! কারণ জাহিদ ওকে চেনে। কেন যেন আবার মৃত্যুর কথা মনে এল। রুস্তম শের কি বাইরের চড়ুইদের উপস্থিতি টের পেয়েছে? মন হয় না। চড়ুইদের সঙ্গে ওর সম্পর্কই বা কি?

ধীরে ধীরে মোনার হাতের বাঁধন কেটে দিল শাহেদ, কেমন যেন নির্লিপ্ত নিস্পৃহ একটা ভাব ঘিরে ধরেছে ওকে। ভয়ের একটা সীমা আছে, সেটা পেরিয়ে এসেছে ও। চারদিকে কি ঘটছে কেন ঘটছে সে সম্বন্ধে যেন কোন উৎসাহই নেই ওর।

শক্ত করে বাঁধার কারণে লাল হয়ে ফুলে উঠেছে মোনার হাতের কব্জি, দু'হাতে ডলতে ডলতে উঠে দাঁড়াল। 'বাচ্চাদের খাবার সময় হয়েছে। ওদেরকে নিচে নিয়ে যাই?' সারা রাস্তা ঘুমিয়ে এসে রূপক আর রুমকি এখন প্রাণশক্তিতে উচ্ছল, চারদিকে ছোটাছুটি করে খেলা করছে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে যাও,' রুস্তম শেরকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে। ডান হাতে রিভলভার, পাপড়িহীন মাছের মত চোখের দৃষ্টি শাহেদ আর মোনার ওপর ঘুরছে অনবরত। 'আমরাও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। ইন্সপেক্টরের সঙ্গে আমার কথা আছে।'

সবাই মিলে নিচের কিচেনে নেমে এল। মোনা সঙ্গে করে বাচ্চাদের জন্যে আনা আতপ চাল আর সব্জি দিয়ে পিশ্‌প্যাশ্‌ রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিচেনটা বিশাল। একপাশে চার চেয়ারের একটা ডাইনিং টেবিল। রুস্তম শের রিভলভার হাতে একটা চেয়ার টেনে বসল। শাহেদ দেয়ালে হেলান দিয়ে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে বাচ্চাদের ওপর নজর রাখতে লাগল যাতে টেবিলের কোনা মাথায় না লাগে বা চেয়ার উল্টে তলায় চাপা না পড়ে। রুস্তম শের একনাগাড়ে বকবক করে চলেছে।

'আপনি ভাবছেন আমি আপনাকে মেরে ফেলব, তাই না? অস্বীকার করে লাভ নেই, আপনার চোখে আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি। এই ধরনের দৃষ্টির সঙ্গে আমি খুব পরিচিত। অবশ্য আমি বলতে পারি যে, না, আমি খুন করব না। কিন্তু আমার মনে হয় আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না।' পকেট থেকে ভেজা একটা ন্যাকড়া বের করে মুখের পুঁজরক্ত মুছে নিল রুস্তম শের, আবার সেটা পকেটে পুরে রাখল ডান হাতের রিভলভার একচুল নড়ল না। 'আপনার তো পুলিসী অভিজ্ঞতাও আছে।'

'ঠিকই বলেছেন,' শীতল ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে শাহেদ দানবটার বিকৃত চেহারার দিকে। 'অবশ্য এধরনের অভিজ্ঞতা কোন পুলিসের আছে কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে।'

পেছনে মাথা হেলিয়ে হো হো করে ঘর কাটিয়ে হেসে উঠল রুস্তম শের। বাচ্চারা চমকে উঠে খেলা থামিয়ে ওর দিকে তাকাল, পরমুহূর্তে ওরাও হাসতে শুরু করল রুস্তম শেরের অনুকরণে। শাহেদ চকিতে মোনার দিকে চাইল, কাজ থামিয়ে শক্ত হয়ে মোনা একদৃষ্টে চেয়ে আছে রুস্তম শেরের দিকে। ওর চোখে ঘৃণা আর ভয় ছাড়াও আর একটা জিনিস দেখতে পেল শাহেদ—ঈর্ষা। রুস্তম শের কি জানে এই মহিলা ওর জন্যে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াতে পারে?

হঠাৎ করে হাসি থামিয়ে শাহেদের দিকে ঝুঁকে এল রুস্তম শের, ভক্ করে পচা একটা গন্ধ ধাক্কা খেল ওর নাকে। 'ঠিক বলেছেন আপনি। তবে যদি ইচ্ছে হয় নাও মারতে পারি আপনাকে, কিছুই বলা যায় না। পরে সিদ্ধান্ত নেব। আজ রাতটা বড় ব্যস্ত আছি আমি। জাহিদ লেখার ব্যাপারে সাহায্য করবে আমাকে। সকালের আগেই আশা করি আমরা শেষ করে ফেলতে পারব।'

'ও চায় জাহিদ ওকে শিখিয়ে দিক কিভাবে লিখতে হয়,' মোনা বলল, 'ওরা নাকি একসঙ্গে একটা বই লিখবে।'

'ঠিক তা নয়,' আপত্তি জানাল রুস্তম শের। একটু যেন রেগেও উঠল। 'জাহিদ আমার কাছে ঋণী, তুমি তা ভাল করেই জানো, মেমসাহেব। কিভাবে লিখতে হয় তা হয়ত জাহিদ আগে থেকেই জানত। কিন্তু আমিই ওকে শিখিয়েছি কিভাবে লিখলে মানুষ সেটা পড়তে চাইবে। কেউ যদি পড়তে না চায়, তবে লিখে কি লাভ?'

'তুমি তার কি বুঝবে!' অবজ্ঞাভরে বলল মোনা।

মোনাকে পাত্তা না দিয়ে শাহেদকে বোঝাতে থাকল রুস্তম শের। 'জাহিদের কাছ থেকে আমি যা চাই, তা...কি বলে...একধরনের ট্র্যান্সফিউশন বলতে পারেন। লেখার ক্ষমতাটা আমার মধ্যে আছে, কিন্তু কিভাবে সেটাকে কাজে লাগাতে হয়, তা শুধু জাহিদই জানে। ও শুধু আমাকে সাহায্য করবে ক্ষমতাটা ফিরে পেতে। জানেন তো, আমার দরকারী জিনিসপত্র সবই জাহিদ তৈরি করে দিয়েছে।'

না, কখনোই না, ভাবল শাহেদ। না জেনেই হয়ত মিথ্যে কথা বলছ তুমি। জাহিদ একা নয়, দু'জনে মিলেই তোমরা সব অঘটন ঘটিয়েছ। কারণ প্রথম থেকেই তুমি ওর সঙ্গে ছিলে। জন্মের আগেই জাহিদ তোমাকে নিকেশ করার চেষ্টা করেছিল, পুরোপুরি সফল হয়নি সে। তারপর, এগারো বছর পর ডাক্তার ম্যাকলিন সমর্থ হন, কিন্তু সাময়িক সময়ের জন্যে মাত্র। অবশেষে জাহিদ তোমাকে আমন্ত্রণ

জানাল নিজের অজান্তেই। কারণ তোমার অস্তিত্বের কথা ও কিছুই জানত না। ডাক্তার ম্যাকলিন ওকে বলেননি। সুযোগ বুঝে তুমি এসে হাজির হলে। আসলে তুমি জাহিদের মৃত যমজ ভাইয়ের প্রেতাত্মা ...পুরোপুরি প্রেতাত্মা নও...অথবা প্রেতাত্মার চেয়েও বেশি কিছু।'

মিটসেফের দরজা খুলে তার ভেতরে ঢোকার পায়তারা কষতে যেতে রূপককে ধরে ফেলল শাহেদ, একহাতে মিটসেফের দরজার ছিটকিনি আটকে দিল। সেদিকে তাকিয়ে ভাবুকের মত রুস্তম শের বলল, 'আসলে সব প্রকৃতির খেয়াল।'

'খেয়াল নয়, পাগলামি,' ফোড়ন কাটল শাহেদ।

আবার হেসে উঠল রুস্তম শের, 'আপনার সঙ্গে আমি একমত। তবে ঘটনাটা ঘটেছে। কিভাবে ঘটেছে তা না জানলে আমার ক্ষতি নেই, কিন্তু এখন আমি বাস্তব—সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার।'

না, তুমি ভুল বলছ, ভাবল শাহেদ। কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছে সেটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার। তোমার কাছে না হলেও আমাদের জন্যে তো বটেই। কারণ একমাত্র সেটাই আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে।

'আমি নিজেকেই নিজে সৃষ্টি করেছি,' বলতে থাকল রুস্তম শের, 'কিন্তু লেখা ব্যাপারটা বড় সোজা কাজ না, কি বলেন? প্রচুর খাটুনির দরকার। এরকম তো আর প্রতিদিন ঘটে না!'

'আল্লাহ্ না করুন!' মোনা বলে উঠল।

ঝট করে ওর দিকে ঘুরে তাকাল রুস্তম শের, সাপের মত ফুঁসে উঠল, 'খবরদার! বড় বেশি কথা বলছ তুমি! বাচ্চাদের কথা বলে গেছ নাকি?'

মুখ নিচু করে চুলায় চড়ানো ছোট্ট হাঁড়িতে চামচ নাড়তে থাকল মোনা, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। 'শাহেদ সাহেব, বাচ্চাদেরকে

টেবিলের ওপর একটু বসিয়ে দেবেন? খাওয়া রেডি।'

ছোট্ট দুটো বাটিতে পিশ্‌প্যাশ্‌ ঢেলে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল মোনা। চেয়ারে বসে রুমকিকে খাওয়াতে শুরু করল। শাহেদ অন্য বাটিটা টেনে নিয়ে রূপকের ভার নিল। মোনা নীরবে চোখের ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানাল।

রুস্তম শের উঠে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে, আনমনে রিভলভারের নল দিয়ে আঁচড় কাটছে শার্টের বুকে। বোতামে লেগে অস্বস্তিকর খসখসে শব্দ উঠছে। 'আপনাকে কাজে লাগাতে হবে। আচ্ছা, এখানে আসার কথা কাউকে বলে এসেছেন নাকি?'

শাহেদের মনে হল সত্যি কথা বলাই ভাল, লোকটা স্বয়ংক্রিয় লাইডিটেক্টর। মিথ্যে বললে নিমেষে ধরে ফেলবে।

'না,' অবশেষে ঘাড় নেড়ে বলল শাহেদ, মনোযোগ দিয়ে চামচে করে রূপককে খাওয়াচ্ছে। ওসমান সওদাগরের ফোনের কথা খুলে বলল।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রুস্তম শের। 'এই সব গেঁয়ো লোকের স্বভাবই পরের ব্যাপারে নাক গলানো। তারপর ফোন পাওয়ার পর কি করলেন আপনি?'

শাহেদ বুঝল এটা একটা ফাঁদ। রুস্তম শের ভাল করেই জানে কি ঘটেছে, শুধু দেখতে চাইছে শাহেদ সত্যি কথা বলে কি না। শাহেদকে একা দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে। এখন শুধু জানতে চাইছে ও কতটা বোকা। বোকামি করল না শাহেদ, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি কথাই বলে গেল।

'আপনার আয়ু একদিনের জন্যে বাড়িয়ে দেয়া হল। বাচ্চাদের খাওয়া হয়ে গেলে কি করতে হবে মন দিয়ে শুনুন।'

'কি বলতে হবে জানেন তো?' দোতলার বারান্দামত খোলা জায়গাটায় টেলিফোনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল শাহেদ।

'চালাকি করতে গেলে কি হবে তা তো জানেনই,' ইঙ্গিতে রূপককে দেখাল রুস্তম শের। কিচেন থেকে বের হবার সময় বাঁদর হিসেবে বাচ্চাটাকে কোলে করে নিয়ে এসেছে।

'ভয় দেখানর কোন দরকার নেই,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল শাহেদ। টেলিফোন সেটটা বিশাল কাঁচের জানালার পাশে উঁচু একটা টেবিলের ওপর রাখা। রিসিভার তুলতে তুলতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল শাহেদ। দেয়াল বেয়ে মানিপ্ল্যান্টের লতা উঠে এসেছে দোতলার জানালার গ্রিলে। অন্ধকার নেমে আসায় বেশিদূর দৃষ্টি গেল না, কিন্তু আশেপাশে চড়ুইপাখির কোন চিহ্ন নেই।

'কি দেখছেন আপনি?'

চমকে উঠল শাহেদ, রুস্তম শেরের ভয়াল চোখে চোখ রাখল, 'না...কিছু না।'

রুস্তম শের এগিয়ে এসে জানালা দিয়ে বাইরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলাল। 'এমনি এমনি বাইরে তাকাননি আপনি, কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছিলেন।'

পিঠে রুস্তম শেরের শীতল দৃষ্টি অনুভব করল শাহেদ। 'জাহিদ সাহেবের কথা ভাবছিলাম, এতক্ষণে পৌঁছে যাবার কথা,' যথাসম্ভব শান্ত থাকার চেষ্টা করল।

'আশাকরি সত্যি কথা বলছেন।' রিভলভারের ডগা দিয়ে রূপকের পায়ের তলায় খোঁচা দিতে সুড়সুড়ি লেগে হেসে উঠল সে, রুস্তম শেরও হাসছে, 'তাহলে শুরু করা যাক।'

মোনা দেখতে পেলে খেপে উঠবে, ভাবল শাহেদ।

ডায়াল ঘুরিয়ে রিসিভারটা কানে চেপে ধরল শাহেদ, ওপাশে রিঙ হচ্ছে। রুস্তম শের ওর পিঠের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, গন্ধে বত্রিশ নাড়ি পাক দিয়ে উঠল।

ওদিক থেকে সাব-ইন্সপেক্টর জানে আলমের কণ্ঠ ভেসে এল, 'পতেঙ্গা থানা, হ্যালো?'

'হ্যালো, আলম, আমি শাহেদ। জাহিদ হাসানের বাড়ি থেকে বলছি। ঢাকা থেকে বলেছিল চেক করে দেখতে। এখানে কেউ নেই। তুমি একটু ঢাকায় খবরটা দিয়ে দিতে পারবে?'

'জ্বী, স্যার, এক্ষুনি খবর দেবার ব্যবস্থা করছি। আপনি কি এখন থানায় ফিরবেন?'

'না। গাড়িটা গোলমাল করছে। কারবুরেটারে গণ্ডগোল। স্টার্ট নিচ্ছে না। আজ আর কিছু করা যাবে না। ভাবছি হেঁটে বড় রাস্তা পর্যন্ত যাব, ওখান থেকে রিকশা নিয়ে বাড়ি ফিরব।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

ফোন রেখে রুস্তম শেরের দিকে ফিরল শাহেদ, 'সন্তুষ্ট?'

'দারুণ!' হাসছে রুস্তম শের। 'ব্যাটা কিছুই সন্দেহ করবে না।' রিভলভারের ডগা দিয়ে আবার রূপককে সুড়সুড়ি দিতে শুরু করেছে। হেসে গড়িয়ে পড়ছে বাচ্চাটা, মাঝে মাঝে ছোট্ট হাত বাড়িয়ে রুস্তম শেরের ঘা ভরা মুখটা ঠেলে দিচ্ছে খেলাচ্ছলে। 'বাচ্চাটা কি সুন্দর, তাই না?' ইস্পাতের নলটা দিয়ে রূপকের বগলে আবার খোঁচা দিল রুস্তম শের। হাসতে হাসতে খুন হয়ে যাচ্ছে রূপক।

ঢোক গিলল শাহেদ, 'ওরকম করছেন কেন? যে-কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

'দুর্ঘটনা? হাহ্! আপনাদের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, আমার ক্ষেত্রে কখনোই নয়।' রূপককে উপরে ছুঁড়ে আবার লুফে নিল রুস্তম শের। 'এখন নিচে চলুন, দেখি কিছু খাবার-দাবার পাওয়া যায় কিনা।' এক টানে ফোনের তারটা ছিঁড়ে ফেলল সে।

কিচেন থেকে ওরা বেরিয়ে যেতেই মোনা মিটসেফের ড্রয়ার খুলে

ফেলল। কাঠের হাতলওয়ালা স্টেইনলেস স্টিলের ছুরিটা তুলে নিয়ে দরজায় চলে এল। নাহ্, ওরা দোতলায় উঠে গেছে। এক হাতে রুমকিকে তুলে নিয়ে দ্রুত বসার ঘরে ঢুকল মোনা, শব্দ হবার ভয়ে পা থেকে স্যাণ্ডেল খুলে ফেলেছে। এদিক ওদিক চেয়ে সোফাটাকেই পছন্দ হল। বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গিয়ে ছুরিটা সোফার গদির ভাঁজে ঢুকিয়ে দিল সে। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সোফায় বসা অবস্থায় নিমেষে ছুরিটা তুলে নেয়া যাবে। যদি কোনভাবে রুস্তম শেরকে সোফায় ওর পাশাপাশি বসানো যায়! কাজটা খুব একটা কঠিন হবে না। মেয়ে হয়ে জন্মেছে মোনা, পুরুষের চোখের দৃষ্টি বুঝতে অসুবিধা হয় না। রুস্তম শের ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, ছলেবলে সোফায় ওর পাশে বসানো এমন কোন কঠিন কাজ হবে না। ভাবতে গিয়ে বমি পেল মোনার, কিন্তু এটাই বাঁচার একমাত্র উপায়।

জাহিদ আসার আগেই রুস্তম শেরকে খুন করতে হবে। কিছুতেই ওদের দু'জনকে মুখোমুখি হতে দেয়া যাবে না। রুস্তম শের যদি নিজ থেকে লিখতে শুরু করে, জাহিদ কি তারপরেও বেঁচে থাকবে? ওরা দু'জনে একসঙ্গে কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারে না। লিখতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে রুস্তম শেরের দেহের ঘা শুকিয়ে আসতে শুরু করবে, পূর্ণ জীবনীশক্তি ফিরে পেতে শুরু করবে সে। কিন্তু জাহিদের ভাগ্যে কি ঘটবে? কোন সন্দেহ নেই জাহিদের শরীরে পচন ধরতে শুরু করবে। মোনা বেঁচে থাকতে কিছুতেই তা হতে পারে না। এত সহজে কিছুতেই হারবে না মোনা।

রুমকিকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবার রান্নাঘরে ফিরে এল, স্যাণ্ডেল জোড়া পরে নিল পায়ে। রুমকি ওকে দরজার দিকে ঠেলছে, ন্যালিশের ভঙ্গিতে অস্ফুটে কিছু বলার চেষ্টা করছে। এক মুহূর্তের জন্যেও রূপককে ছেড়ে থাকতে চায় না মেয়েটা, ভাইয়ের কাছে যেতে চাইছে। ওকে মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে কল ছেড়ে থালা বাসন ধুতে বসল মোনা।

দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বলল, তোমার সময় ঘনিয়ে এসেছে রুস্তম শের।

শাহেদ ঢুকল রান্নাঘরে, পেছনে রূপককে কোলে নিয়ে রুস্তম শের। রুমকিকে দেখে ছটফট করে উঠল রূপক। রুস্তম শের ওকে মেঝেতে নামিয়ে দিতেই মুখে দুর্বোধ্য খুশির শব্দ তুলে হামাগুড়ি দিয়ে দু'ভাইবোন পরস্পরের দিকে ছুটে গেল।

'কিছু খেতে দাও তো, মেমসাহেব। খিদে পেয়েছে,' রুস্তম শের বলল।

বছরের চার মাসই জাহিদ আর মোনা এ বাড়িতে থাকে। বসবাসের সব ব্যবস্থাই এখানে আছে, সাভার থেকে বলতে গেলে কিছুই বয়ে আনতে হয় না ওদেরকে। একটু খুঁজতেই কয়েকটা ফুজি নুডলসের প্যাকেট পেয়ে গেল মোনা। দ্রুতহাতে দুবাটি সুপ বানাল, নিজের জন্যে নিল না। খাবার মুখে তুলতে পারবে না, তা ভাল করেই জানে সে।

সুপ শেষ হবার আগেই পৌঁছে গেল জাহিদ।

বিশ

পাহাড়তলীর একটা স্টেশনারী দোকানে থেমেছিল জাহিদ। এক ডজন এইচ-বি পেন্সিল আর একটা পেন্সিল শার্পনার কিনল। দাম মিটিয়ে গাড়িতে ফিরে শার্পনারে পেন্সিলগুলো ধারাল করে কেটে পাঞ্জাবীর

পকেটে রেখে দিল। রুস্তম শের কি আন্দাজ করতে পারবে কেন জাহিদ কিনেছে পেন্সিলগুলো? মনে হয় না। বরং উল্টো খুশিই হবে। রুস্তম শেরের প্রতিটা বই জাহিদ পতেঙ্গার বাড়িতে বসেই লিখেছে, ও বাড়িতে বেশ কিছু পেন্সিল এখনও রয়ে গেছে। তবু জাহিদ সাহস করে পেন্সিলগুলো কিনে ফেলল।

আবুল হাশেম ভুঁইয়ার ফোক্সওয়াগেন রাস্তায় বেশ ঝামেলা করেছে। সাইলেন্সার কোন কাজ করছে না, উৎকট শব্দ হচ্ছে। বেশ কবার চামড়ার নিচে অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়েছে, জাহিদ এখন জানে ওটা রুস্তম শেরের উপস্থিতির চিহ্ন। রুস্তম শের ওর ভেতর ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে। ফলে যতবার শরীরের ভেতর অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়েছে, ততবার গলা ছেড়ে জাহিদ গাইতে শুরু করেছে 'আল্লাহ্ মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই' অথবা 'আমরা দু'জনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে'—যখন যা মুখে এসেছে। রুস্তম শেরকে কিছুতেই বুঝতে দেবে না ওর পরিকল্পনা।

খোলা জানালায় কর্ণফুলির ভেজা বাতাস আছড়ে পড়ল। জাহিদের গলা শুকিয়ে গেছে। শরীফ চাচার বাড়ির রাস্তাটা পার হতে আরও নার্ভাস হয়ে গেল—কেমন আছে মোনা আর বাচ্চারা? রুস্তম শের ওদের কোন ক্ষতি করেনি তো? সন্ধের পর রাস্তায় লোকজন কমে গেছে, গাড়ির উৎকট শব্দে আকৃষ্ট হয়ে পথচারীরা উৎসুক চোখে তাকাচ্ছে। বড় ইচ্ছে করল গাড়ি থেকে নেমে ওদের কাছে দৌড়ে যেতে, ভাই, আমাকে সাহায্য করুন, নিষ্ঠুর হিংস্র এক খুনী আমার বউ-বাচ্চাকে আটকে রেখেছে!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডানদিকের কাঁচা রাস্তায় মোড় নিল। কিছুদূর যেতেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল। চড়ুই পাখি! হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ চড়ুই পাখি! যেদিকে চোখ যায় পাখি ছাড়া কিছু নেই! গাছপালা-রাস্তা সবকিছু ঢাকা পড়ে গেছে পাখিতে! আশ্চর্য!

কতদূর গেছে ওরা? বাড়ি পর্যন্ত? রুস্তম শের যদি ওদের দেখে ফেলে! কিন্তু রাস্তা ঢাকা পড়েছে পাখিতে, কেমন করে গাড়ি চালাবে জাহিদ? হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়, একে অন্ধকার—তার উপর মাইল দু'য়েক রাস্তা। গাড়ি নিয়েই যেতে হবে ওকে, চাকার নিচে ওরা পিষে গেলে করার কিছু নেই। জাহিদকে যেতেই হবে।

ব্রেক থেকে পা তুলে আলতো করে গ্যাস দাবাল। মৃদু আর্তনাদ করে ফোক্সওয়াগেন গুবরে পোকার মত সামনে এগুলো। শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করে ফেলল জাহিদ, কল্পনায় দেখতে পেল চাকার নিচে ভর্তা হয়ে যাচ্ছে চড়ুইরা, রক্ত আর পালকে মাখামাখি হয়ে গেছে টায়ার চারটে! কিন্তু না, তেমন কিছু তো ঘটল না! চোখ খুলতেই অবাক হয়ে গেল জাহিদ। হেডলাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে টায়ারের সামনে বেশ কিছুটা জায়গায় সরু দুটো ফিতের মত রাস্তা বেরিয়ে পড়েছে, টায়ার চারটে যেখান দিয়ে যাবার কথা ঠিক সেই জায়গা বরাবর।

দাঁতের ফাঁক দিয়ে চেপে রাখা নিঃশ্বাস শিষ কেটে বেরিয়ে এল। দুফোঁটা ঘাম গড়িয়ে পড়ল কানের পাশ দিয়ে। 'খোদা!' বিড়বিড় করে উঠল জাহিদ। 'জীবন্মৃতের জগতে চলে এসেছি, খোদা, তুমি আমাকে রক্ষা কর।'

কার্পেটের মত বিছিয়ে থাকা পাখির রাজ্যে মৃদু আলোড়ন দেখা যাচ্ছে। গাড়িটা যতই সামনে এগুচ্ছে ওরা নড়েচড়ে জায়গা করে দিচ্ছে, লম্বা দুটো সরু রেখার মত রাস্তা খুলে যাচ্ছে জাহিদের সামনে। রিয়ার ভিউ মিররে দেখল গাড়িটা এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নড়েচড়ে পেছনের রাস্তা আবার ঢেকে দিচ্ছে ওরা। মাথার ওপর ঠুকঠুক শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে গাড়ির ছাদে এসে বসেছে বেশ কিছু চড়ুই। আঁশটে গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে বাতাস। হেডলাইটের আলোয় যতদূর চোখ যায় শুধু পাখি আর পাখি, একদৃষ্টে চেয়ে আছে জাহিদের দিকে।

ভয়ে জাহিদের হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। হাশেম ভাইয়ের কথা মনে পড়ল, 'সাবধানে থেকো, খুব সাবধানে।' পরলোকের ওপর মানুষের কোন ক্ষমতা নেই। ভীষণ ইচ্ছে করল গাড়ি ঘুরিয়ে এখান থেকে বহুদূরে কোথাও পালিয়ে যেতে। চড়ুইরা ওর সামনে রাস্তা খুলে দিচ্ছে, ঠিক একইভাবে বন্ধ করে দিচ্ছে ফেরার রাস্তা। জাহিদ জানে এই মুহূর্তে ফিরে যাবার কথা চিন্তা করা বাতুলতা।

রাস্তার পাশে পার্ক করা শাহেদের জীপটাও দেখতে পেল না। চাদরের মত ওটাকে ঢেকে আছে চড়ুই পাখিরা। জাহিদ শুধু দেখল কিছুটা জায়গা ঢিবির মত উঁচু হয়ে আছে। ওদিকে মন দেবার মত সময় নেই, খোলা গেট দিয়ে বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়ল জাহিদ। চড়ুই পাখিরা এখনও সামনে খুলে দিচ্ছে রাস্তা।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পাখিদের তৈরি কার্পেটটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। এরপর থেকে সবকিছু স্বাভাবিক, একটা পাখিও দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে। অদৃশ্য একটা দেয়াল যেন ওদেরকে বাধা দিচ্ছে। দেয়ালের ওপার থেকে চেয়ে আছে ওরা জাহিদের দিকে।

খালি জায়গায় বেরিয়ে এসে পেছনে তাকাল জাহিদ। একরাশ অন্ধকার উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে নিঃশব্দে। প্রাণপণে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে জাহিদ। এটা ধৈর্য হারাবার সময় নয়।

গাড়ি বারান্দা পার্ক করা কালো ফোর্ড এসকর্ট অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। এক নজরেই চিনতে পারল জাহিদ। মৃদু একটা গর্জন তুলে ফোক্সওয়াগেনের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল, দরজা খুল নেমে এল জাহিদ।

দোতলা বাড়ির প্রতিটি জানালায় আলো জ্বলছে।

সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে রুস্তম শের। কোলে রুমকি। সূক্ষ্ম একধরনের ঈর্ষা বোধ করল জাহিদ। অস্বীকার করতে পারছে না এই লোকটাকে একসময় আদর্শ পুরুষ হিসেবে পূজো করত ও। নিজে যা

নয়, চেষ্টা করেও কোনদিন যা হতে পারবে না, রুস্তম শেরকে ঠিক তেমনিভাবে সৃষ্টি করেছিল জাহিদ। ওর স্বপ্নের নায়ক আজ দুঃস্বপ্ন হয়ে বাস্তবে আবির্ভূত হয়েছে, অথচ কেন ওকে সহ্য করতে পারছে না ও?

জাহিদের প্রতি একই সঙ্গে প্রচণ্ড আকর্ষণ আর আক্রোশ অনুভব করছে রুস্তম শের। এই লোকটাই বড় যত্নে ওকে সৃষ্টি করেছে, ওর সব ক্ষমতাই জাহিদের কাছ থেকে পাওয়া। বিনিময়ে জাহিদকে কি কিছুই সে দেয়নি? বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ চাকরি করেও জাহিদ আজ অগাধ টাকার মালিক। সে তো রুস্তম শেরের জন্যেই সম্ভব হয়েছে। অথচ কত সহজে অকৃতজ্ঞ লোকটা ওকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে, ঠিক যখন প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

'কেমন আছ, জাহিদ?' রুস্তম শের এত আস্তে কথা বলল যে কান পেতে শুনতে হয়।

'রূপক-রুমকি-মোনা ওরা ঠিক আছে তো?' খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল জাহিদ।

হাসল রুস্তম শের, 'সবাই ভাল আছে, তুমি যতক্ষণ কথা শুনবে কেউ ওদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। লেখার জন্যে তৈরি তো?'

'হ্যাঁ,' জাহিদ লক্ষ্য করল মুখের ঘায়ের কারণে রুস্তম শেরের গালের লম্বা কাটা দাগটা বোঝা যাচ্ছে না।

'তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।' তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে রুস্তম শের।

'তোমাকেও তো সুবিধের দেখাচ্ছে না। আয়নায় নিজেকে দেখেছ?'

পেছনে মাথা হেলিয়ে হেসে উঠল রুস্তম শের, 'জানি।'

'তোমার কথামত কাজ করলে ওদেরকে ছেড়ে দেবে তো?' রুস্তম শেরের পেছনে রূপককে কোলে করে মোনা এসে দাঁড়িয়েছে, এই ক'ঘন্টার মধ্যেই মুখটা শুকিয়ে গেছে, ঘরে যে শাড়ি পরে ছিল সেটাই পরে আছে এখনও। ওর পাশে দাঁড়ানো শাহেদকে চিনতে পেরে

বিস্মিত হল জাহিদ।

'হ্যাঁ,' বাঁ হাতে নাকের কাছ থেকে পুঁজ মুছতে মুছতে জবাব দিল রুস্তম শের।

'প্রতিজ্ঞা কর।'

'ঠিক আছে, প্রতিজ্ঞা করলাম। জানো তো প্রতিজ্ঞা ভাঙি না আমি।'

জাহিদ নিঃসন্দেহ হল চড়ুই পাখির উপস্থিতির কথা জানে না রুস্তম শের। ওরা একান্তই জাহিদের।

ওদের দু'জনকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল মোনা। দু'জনের চেহারায় কোন মিল নেই, অথচ মনে হচ্ছে যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মিলটা ঠিক কোথায়, তা বোঝা যাচ্ছে না বলেই কেমন যেন খাপছাড়া দেখাচ্ছে দৃশ্যটা। জাহিদ বেঁটে, শ্যামলা, অতি সাধারণ চেহারা। রুস্তম শের মাথায় ওর চেয়ে কম করেও ফুটখানেক উঁচু, তেমনি প্রস্থ—তার ওপর শরীরময় বিশ্রী ঘা। অথচ মনে হচ্ছে যেন ওরা একই লোক! শিউরে উঠল মোনা।

ওদেরকে কথা বলতে দেখে হঠাৎ মনে হল সোফার গদির ভাঁজে লুকানো ছুরিটার কথা শাহেদকে বলার এটাই সুবর্ণ সুযোগ।

শাহেদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করার ঠিক আগের মুহূর্তে জাহিদ কঠিন গলায় ডাকল, 'মোনা!'

জাহিদের কণ্ঠে পরিষ্কার আদেশের সুর, যেন টের পেয়েছে মোনা কি করতে যাচ্ছে, ও চাচ্ছে না মোনা তা করে। অসম্ভব! জাহিদ কিভাবে জানবে মোনার মনের খবর? চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল মোনা, কেমন করে বুঝল জাহিদ!

রুস্তম শের রুমকিকে জাহিদের কোলে তুলে দিল। যেমন করে রুস্তম শেরের গলা জড়িয়ে ধরে খেলা করছিল, জাহিদের কোলে গিয়েও ঠিক তেমনি গলা জড়িয়ে ধরল রুমকি, এতক্ষণ পর বাবাকে

দেখে তেমন কোন উচ্ছ্বাস দেখাল না। রুমকি কি দু'জনের মধ্যে কোন পার্থক্য অনুভব করছে না? বুক টিপটিপ করতে লাগল মোনার।

রুমকিকে কোলে করে মোনার পাশ কেটে ঘরে ঢুকল জাহিদ। ওর চোখের ভাষা পরিষ্কার পড়তে পারল মোনা, 'বোকার মত কিছু করে বোসো না, আমার ওপর ভরসা রাখ।' তারপর এক হাতে মোনার কাঁধ জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি খুব দুঃখিত, মোনা। এরকম কিছু ঘটবে তা আমি চিন্তা করিনি। তোমরা ঠিক আছ তো?'

রুদ্ধ কণ্ঠে ওপরনিচ মাথা ঝাঁকিয়ে জাহিদের বুকের মধ্যে মুখ লুকাল মোনা, নিজেকে ছোট্ট মেয়ের মত অসহায় মনে হচ্ছে।

শাহেদের দিকে চেয়ে হাসির ভঙ্গি করল জাহিদ, 'কি, ইন্সপেক্টর সাহেব, এখন বিশ্বাস হচ্ছে তো?'

প্রত্যুত্তরে শাহেদ হাসতে পারল না, শুধু বলল, 'আপনার বহুদিনের পুরানো এক বন্ধুর সঙ্গে আজ কথা হল,' তারপর রুস্তম শেরের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনাকেও চেনেন ভদ্রলোক।'

অবাক হল রুস্তম শের। 'আমার তো মনে হয় না জাহিদের কোন বন্ধু আমাকে চেনে,' বলতে বলতে হাঁ করে বাঁ হাতে টান দিয়ে মাড়ী থেকে কালচে একটা দাঁত খুলে নিয়ে এল, দাঁতের গোড়ায় লালচে মাংস লেগে আছে। ঘৃণায় চোখ বন্ধ করে ফেলল মোনা। দাঁতটা বাইরে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিল রুস্তম শের।

বহুকষ্টে চোখ ফেরাল জাহিদ শাহেদের দিকে, 'কার কথা বলছেন?'

'ডক্টর ম্যাকলিন, লণ্ডন জেনারেল হসপিটালের ভূতপূর্ব সার্জন। আপনাদের দু'জনের কথাই মনে রেখেছেন ভদ্রলোক। কারণ অপারেশনটা খুব স্বাভাবিক ধরনের ছিল না। টিউমার নয়, আপনার মগজ থেকে ইনাকে কেটে বাদ দিয়েছিলেন তিনি,' ইঙ্গিতে রুস্তম শেরকে দেখাল শাহেদ।

'কি বলছেন আপনি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মোনা।

ডাক্তারের সঙ্গে ওর কথোপকথনের পুরোটাই খুলে বলল শাহেদ, শুধু হসপিটালে পাখিদের সমবেত আক্রমণের ব্যাপারটা চেপে গেল। কেন যেন মনে হচ্ছে জাহিদ পাখিদের উপস্থিতির কথা রুস্তম শেরের কাছ থেকে গোপন করতে চাইছে। আসার সময় জাহিদ নিশ্চয়ই গেটের কাছে পাখিদের জটলা দেখে এসেছে, অথচ একবারও তা মুখে উচ্চারণ করেনি। অবশ্য ও আসার আগে ওরা উড়েও যেতে পারে। তবে ভেবেচিন্তে চেপে যাওয়াই সাব্যস্ত করল।

শুনতে শুনতে মোনার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল, জাহিদ ওপর নিচে মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ, শাহেদ সাহেব। অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল।' তারপর রুস্তম শেরের উদ্দেশ্যে হাসল, 'তুমি একটা ভূত, রুস্তম শের। অদ্ভুত, তবে ভূত।'

'তাতে কিছু যায় আসে না। এখন চল কাজে লেগে পড়ি।' খুব স্বাভাবিক ভাবে সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করল রুস্তম শের। শাহেদ ওর কাছ থেকেই তীব্র প্রতিক্রিয়া আশা করছিল, অথচ ওকে একটুও উত্তেজিত মনে হচ্ছে না।

চোখের কোণে কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখে দ্রুত পাশ ফিরল শাহেদ। জানালার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ও, আবছা আঁধার ছাপিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল দুটো চড়ুই পাখি উড়ে এসে বসল জানালার ঠিক বাইরে গন্ধরাজ গাছের ডালে। পেছন পেছন উড়ে এল আর একটা। জাহিদের দিকে তাকাতেই ওর চোখের মণি নড়ে উঠতে দেখল শাহেদ। জাহিদও দেখেছে। তারমানে ওর ধারণাই ঠিক, জাহিদ রুস্তম শেরকে জানতে দিতে চায় না।

'কি হল? চল!' তাড়া দিল রুস্তম শের।

হঠাৎ মোনার মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল জাহিদ। 'মোনা, তোমার কিছু একটা প্ল্যান আছে, তাই না?'

ফ্যাকাসে মুখে চেয়ে রইল মোনা, মুখে উত্তর জোগাল না।

'বলে ফেল, মোনা, সত্যি কথা বল। আমাদের সবার নিরাপত্তা এর সঙ্গে জড়িত,' ধমকে উঠল জাহিদ।

হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে অসহায়ের মত এদিক ওদিক তাকাল মোনা, তারপর অস্ফুটে বলল, 'সোফার গদির ফাঁকে একটা লুকিয়ে ছুরি রেখেছি। ওরা দু'জন যখন দোতলায় ফোনে কথা বলছিল তখন রান্নাঘর থেকে ছুরিটা নিয়ে ওখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম।' মোনা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না জাহিদ হঠাৎ এভাবে ওকে অপ্রস্তুত করে দেবে, মনে হচ্ছে শেষ ভরসাটুকুও চলে গেল।

'আশ্চর্য!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল জাহিদ, রূপক আর রুমকি হঠাৎ চমকে গিয়ে কেঁপে উঠল।

রুস্তম শেরের পচধরা মুখে লম্বা হাসি, যেন খুব উপভোগ করছে স্বামী-স্ত্রীর মতান্তর। শাহেদও জাহিদের এই বোকামিতে বিরক্ত হয়েছে, মোনার প্ল্যানটা কাজে লেগে যেতেও পারত। শাহেদের অস্ত্র আগেই কেড়ে নিয়েছে রুস্তম শের, খালি হাতে এই দানবকে মোকাবেলা করার চিন্তা পাগলামি ছাড়া কিছু নয়।

'শাহেদ সাহেব, আমি ঠিক কাজটাই করেছি,' জাহিদ শক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, যেন শাহেদের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট টের পাচ্ছে সে। তারপর মোনার উদ্দেশ্যে বলল, 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখ, লক্ষ্মীটি। ছুরিটা বাইরে ফেলে দিয়ে এস।'

'আপনি কি মনে করছেন কথা শুনলেই আমাদের সবাইকে ছেড়ে দেবে ও?' রাগ চেপে রাখতে পারছে না শাহেদ।

'কখন কি করতে হবে আমি ভাল করেই তা জানি,' মোনার দিকে ফিরল জাহিদ, 'কি হল? যাও!'

রাগে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়াল শাহেদ।

মোনা রূপককে মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে সোফার কাছে

এগিয়ে গেল। যেন স্বপ্নের ঘোরে ছুরিটা তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'সাবধান!' সতর্ক করে দেবার ভঙ্গিতে বলে উঠল রুস্তম শের, হাতের রিভলভার মেঝেতে বসা রূপকের দিকে তাক করা।

সম্মোহিতের মত সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মোনা। তারপর ধীর পায়ে দরজা পেরিয়ে বাইরে চলে এল। ওকে বেরিয়ে আসতে দেখে ডজন তিনেক চড়ুই পাখি দরজার কাছ থেকে পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল পেছনের অন্ধকারে। কিন্তু উড়ে গেল না।

দু'হাতে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আছে ছুরিটা, চোখ দুটো দূরের অরণ্য দেখছে—মোনা কি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে? জাহিদ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। কি ভাবছে মোনা? সময় যে বড় কম! উদ্বিগ্ন চোখে রুস্তম শেরকে দেখল জাহিদ। না, ওকে শান্ত দেখাচ্ছে। মনোযোগ দিয়ে দেখছে মোনাকে। ও কি চড়ুই পাখিগুলোকে দেখতে পায়নি?

ছুরিটা অন্ধকারে ছুঁড়ে দিল মোনা, তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'এবার তবে ওপরে যাওয়া যাক!' রুস্তম শেরের কণ্ঠে খুশি চুঁইয়ে পড়ছে, 'তোমার টাইপরাইটার তো এখানে নেই, তাই না জাহিদ?'

'এখন টাইপরাইটার দরকার হবে না, তা তো তুমি ভাল করেই জানো।' পাঞ্জাবীর পকেট থেকে এইচ-বি পেন্সিলগুলো বের করে উঁচু করে ধরল জাহিদ।

হো হো করে হেসে উঠল রুস্তম শের, 'কিছুই দেখছি ভোলনি! আমিও প্রচুর পেন্সিল নিয়ে এসেছি আমার জন্যে। ইন্সপেক্টর সাহেব, যদি কিছু মনে না করেন গাড়ি থেকে পেন্সিলের বাক্সটা একটু নিয়ে আসবেন? সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে আছে।' জাহিদের দিকে তাকিয়ে পরিতৃপ্তির হাসি হাসল, 'বেশ বুঝতে পারছি লেখার জন্যে পাগল হয়ে

উঠেছ তুমি, তাই না, বস্?'

'ঠিক ধরেছ।' অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল দেখাচ্ছে জাহিদের চোখ দুটো, যেন উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না।

দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠল।

শিউড়ে উঠে চোখ বন্ধ করে ফেলল মোনা। দু'জনের মধ্য থেকে জাহিদকে আলাদা করে চিনতে কষ্ট হচ্ছে ওর। মুখোমুখি দেখা হবার পর থেকেই ওরা দু'জন যেন একটা ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে শুরু করেছে। মোনা আর সহ্য করতে পারছে না। মনে হচ্ছে যেন ওরা সবাই উঁচু পাহাড়ের একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে—শুধু গড়িয়ে পড়ার অপেক্ষা।

পেন্সিলের বাক্স আনতে বাইরে এল শাহেদ। ফোর্ড এসকর্টের দরজা খুলে ভেতরে মাথা গলাতেই ভক্ করে পচা দুর্গন্ধ ধাক্কা দিল নাকে। পেন্সিলের বাক্স তুলে নিয়ে মুহূর্তে বেরিয়ে এসে তাজা বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিল।

চড়ুই পাখিরা এসে গেছে। চারদিকে থেকে উড়ে আসছে ওরা, ধীরে ধীরে চাদরের মত ঢেকে দিচ্ছে ঘাস-জমি-গাছপালা। কেউ কোন শব্দ করছে না, মাটিতে নেমেই নিশ্চল হয়ে কোন কিছুর অপেক্ষা করছে। কি চায় ওরা?

একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেও শাহেদ রহস্য ভেদ করতে পারল না।

'ইন্সপেক্টর সাহেব, দোতলায় উঠে ডানদিকে ছোট্ট একটা ঘর পাবেন। ওটাই জাহিদের লেখার ঘর। ঘরের ডানদিকের কোণে একটা গোল টেবিল আছে, কাঁচের তৈরি একটা পরি সাজানো আছে ওতে। দয়া করে পেন্সিলের বাক্সটা ওই টেবিলটার ওপরে রেখে আসুন।' রুস্তম শের শাহেদের পিঠে রিভলভারের খোঁচা দিল।

শাহেদ প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে জাহিদের দিকে চাইতে সে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। অবাক হয়ে রুস্তম শেরের দিকে তাকাল শাহেদ, 'এ বাড়িতে কখনোই আসেননি আপনি। এত কিছু জানলেন কেমন করে?'

'এ বাড়ি আমার বহুদিনের পরিচিত। সশরীরে না হলেও স্বপ্নের মধ্যে বহুবার এখানে এসেছি আমি,' আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল রুস্তম শের।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবাই জাহিদের লেখার ঘরে একত্রিত হল। ঘরটা ছোট্ট। চারদিকের দেয়াল ঢাকা পড়েছে থরে থরে সাজিয়ে রাখা বই ভর্তি শেলফে। একদিকে একটা জানালা ছিল, কিন্তু জাহিদ বইয়ের আলমারি দিয়ে সেটা বহুদিন আগেই ঢেকে দিয়েছে লেখার সময় বার বার বাইরে চোখ চলে যায় বলে। ফলে দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। কোণে রাখা ছোট্ট গোল টেবিলটা ছাড়াও ঘরে আছে একটা বিশাল লেখার টেবিল। এতদিন একটা চেয়ার থাকত, আজ টেবিলের দু'পাশে মুখোমুখি দুটো চেয়ার সাজানো।

জাহিদ আর রুস্তম শের বসে আছে চেয়ার দুটোয়। জাহিদের কোলে রুমকি, রুস্তম শের কোলে নিয়েছে রূপককে।

'কতটা সময় আছে আমাদের হাতে, শাহেদ সাহেব?' প্রশ্ন করল জাহিদ। 'পুলিস সন্দেহ করে এখানে চেক করতে কতটা সময় নেবে? ভেবেচিন্তে সত্যি কথা বলবেন, এছাড়া বাঁচার কোন পথ নেই।'

ধৈর্য হারাল মোনা। 'জাহিদ, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? তাকিয়ে দেখ ওর দিক, পচে-গলে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে! লেখার ব্যাপারে তোমার সাহায্য চায় না সে, তোমার জীবন চুরি করে নিচ্ছে, তোমাকে নিঃশেষ করে দেবে—তুমি বুঝতে পারছ না?'

'শ-শ-শ,' ওকে থামিয়ে দিল জাহিদ, 'আমি জানি ও কি চায়।

এছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই।' মোনার পাশে দাঁড়ানো শাহেদের দিকে তাকাল, 'হ্যাঁ, কতক্ষণ লাগবে বলুন তো?'

একটু চিন্তা করে উত্তর দিল শাহেদ। থানায় ওর ফেরার কথা নয়, ফোন করে সেটা আরও নিশ্চিত করেছে। 'আমার স্ত্রী আমার খোঁজে থানায় ফোন করলে হয়ত ওরা কিছু একটা সন্দেহ করবে। এমনিতে কেউ এখানে আসবে না। তবে রাত বারোটার আগে আমার স্ত্রী বিচলিত হবে না। বহুদিন ধরে পুলিস অফিসারের ঘর করছে, ওর অভ্যাস আছে। অন্তত চার-পাঁচ ঘন্টার আগে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।'

রুস্তম শের অন্যমনস্কভাবে এক হাতে পেপার ওয়েট লোফালুফি করছে, এদিকে মনোযোগ নেই। জাহিদ জিজ্ঞেস করল, 'পাঁচ ঘন্টা কি যথেষ্ট সময়?'

চকচক করে উঠল রুস্তম শেরের চোখজোড়া, 'তুমিই ভাল জান।'

জাহিদ হঠাৎ অনুভব করল শুধু লেখা নয়, আরও অনেক কিছু ভাগাভাগি করে নিতে বসেছে ওরা। লেখাটা একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র, ওর মধ্য দিয়ে এক ধরনের ক্ষমতা বদলাবদলি করবে ওরা, খুব শক্তিশালী এক ক্ষমতা। স্ত্রী আর সন্তানদের জীবনের বিনিময়ে জাহিদকে কিছু একটা দিতে হবে। তৃতীয় নয়ন! রুস্তম শের ওর তৃতীয় নয়নটা চায়!

একদৃষ্টে চেয়ে আছে রুস্তম শের। জাহিদের চামড়ার নিচে আবার সেই অস্বস্তিকর সুড়সুড়ি। না! রুস্তম শের, যথেষ্ট হয়েছে, আর না! প্রাণপণে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করল জাহিদ।

'কি লুকাচ্ছ তুমি, জাহিদ?' কঠোর হয়ে উঠতে শুরু করেছে কোটর ছেড়ে কিছুটা বাইরে বেরিয়ে থাকা রুস্তম শেরের কটা দুই চোখ।

'আমিও তোমাকে একই প্রশ্ন করতে পারি,' সমান তেজে জবাব দিল জাহিদ। 'সময় নষ্ট না করে শুরু কর।'

এই প্রথম বারের মত রুস্তম শেরের চোখে অনিশ্চয়তার আভাস দেখতে পেল মোনা। কিছুটা ভয়ও কি ছিল? দু'এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই স্বাভাবিক মূর্তি ধরল রুস্তম শের। 'এখানে ঘাস কাটতে আসিনি আমি। শুরু কর। মেমসাহেব, ইন্সপেক্টর সাহেবকে নিয়ে নিচে চলে যাও। তোমাদেরকে এখানে দরকার নেই। বাচ্চারা এখানে রইল, কোনরকম বাঁদরামি করবে না।'

'কিন্তু...' আপত্তি জানাতে গেল মোনা।

'কোন ভয় নেই,' জাহিদ ওকে থামিয়ে দিল। 'আমি আছি। তাছাড়া তুমি লক্ষ্য করনি বাচ্চারা ওকে কিরকম পছন্দ করছে?'

'খুব ভালভাবেই লক্ষ্য করেছি,' প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল মোনা। রুস্তম শের, নাকি জাহিদ—কার প্রতি বেশি ঘৃণা হচ্ছে তা বুঝতে পারল না সে।

'ইন্সপেক্টর সাহেব, আপনিও চালাকি করতে যাবেন না যেন। আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ নেই।' খিকখিক করে হাসল রুস্তম শের, 'দরজাটা বাইরে থেকে টেনে দিয়ে নিচের ঘরে গিয়ে বসুন আপনারা।'

হলুদ রঙের পেন্সিল তুলে নিল রুস্তম শের, জাহিদও হাত বাড়াল পেন্সিলের উদ্দেশে।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল মোনা, ওর পিঠে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল শাহেদ। মোনা একদৃষ্টে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

বাইরে চড়ুইদের রাজত্ব। অন্ধকার ছাপিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে জানালার কার্নিস থেকে শুরু করে বাইরের সবকিছু ঢাকা পড়েছে কার্পেটের মত বিছিয়ে থাকা চড়ুই পাখিতে।

দৌড়ে এসে জানালায় দাঁড়াল শাহেদ। যতদূর চোখ যায় ঘাস-

মাটি-গাছপালা ঢেকে ধূসর মোজাইকের মত নেমে এসেছে চড়ুই বাহিনী! রাতের আকাশ ঢাকা পড়েছে উড়ে আসা চড়ুই পাখিতে।

'হায় আল্লাহ্!' হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে নিল মোনা।

দ্রুত ওকে ধরে ফেলল শাহেদ, 'চুপ! ওপরে ওরা শুনতে পাবে!'

বসার ঘরটা বিশাল, কথা বললে মৃদু প্রতিধ্বনি ওঠে। ঝুঁকি না নিয়ে মোনাকে ধরে ধরে কিচেনে নিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল শাহেদ। তারপর ডক্টর ম্যাকলিনের কাছে শোনা কাহিনীর বাকি অংশ খুলে বলল।

'এর অর্থ কি? ভীষণ ভয় করছে আমার,' মুঠো করা হাত কামড়ে ধরে নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করল মোনা।

ভীষণ মায়া হল শাহেদের। মনে পড়ে গেল নিজের স্ত্রী-পুত্রের কথা। ওরা এই মুহূর্তে কি করছে?

'আমি জানি না, ভাবি, কিন্তু বুঝতে পারছি না। শুধু এটুকু আন্দাজ করছি, ওদের দু'জনের কেউ পাখিগুলোকে ডেকে এনেছে। যতদূর মনে হয় জাহিদই ডেকেছে। পাখিগুলোকে দেখেও কথাটা চেপে গেছে সে রুস্তম শেরের কাছে।'

'শাহেদ ভাই, জাহিদ কেমন যেন বদলে গেছে।'

'জানি। বুঝতে পেরেছি।'

'জাহিদ রুস্তম শেরকে পুরোপুরি ঘৃণা করে না, বরং মনে হল যেন পছন্দই করে।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল শাহেদ।

একটু পরে উত্তেজনা চাপতে না পেরে আবার ওরা বসার ঘরে ফিরে এল। জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখতে থাকল।

গাড়ি বারান্দা, সুরকি বিছানো রাস্তা, ঘাসে ঢাকা খালি জমির এক ইঞ্চিও বাদ নেই, শুধু পাখি আর পাখি। ফোক্সওয়াগেনটা পাখিদের নিচে হারিয়ে গেছে, উঁচু টিবিটার নিচে একটা গাড়ি রয়েছে তা বোঝার

সাধ্য নেই। কিন্তু আশ্চর্য, রুস্তম শেরের কালো ফোর্ড এসকর্ট সম্পূর্ণ মুক্ত, একটা পাখিও বসেনি গাড়িটার গায়ে। গাড়িটার চারপাশ থেকে ঘিরে আছে ওরা, কিন্তু একটা অদৃশ্য সীমারেখার বাইরে থেকে। ফোর্ড এসকর্টের চারধারে ফুটখানেক জায়গা একদম খালি।

'স্বপ্ন দেখছি না তো! হয়ত জেগে উঠে দেখব সবকিছু আগের মতই আছে!' অস্ফুটে অভিযোগ জানানর ভঙ্গিতে বলে উঠল মোনা। একটা চড়ুই পাখি উড়ে এসে জানালার কাঁচে ধাক্কা খেলে চমকে উঠে পিছিয়ে এল। শাহেদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কি করব এখন আমরা?'

'সবচেয়ে কঠিন কাজটা,' আস্তে আস্তে বলল শাহেদ, 'আমরা অপেক্ষা করব।'

সময় যেন আর কাটছে না। রাত্রির অন্ধকার শুধু ঘন থেকে আরও ঘন হয়ে উঠল। বাইরে চড়ুইদের শেষ ঝাঁকটা এসে পৌঁছেছে। মোনা আর শাহেদ স্পষ্ট টের পাচ্ছে বাড়ির ছাদে এসে বসেছে ওরা। অথচ কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করছে না। ভৌতিক অপার্থিব নীরবতা বিরাজ করছে পুরো এলাকায়। মোনা অবাক হল, কোটি কোটি পাখি এসে জমায়েত হচ্ছে অথচ আশেপাশের কেউ লক্ষ্য করছে না! বাঁ পাশের টিলাটার ওপারেই শরীফ চাচার বাড়ি, অবশ্য রাস্তা দিয়ে যেতে হলে অনেকটা ঘুরে মেইন রোড ধরে যেতে হয়। ওরাও কি কিছু দেখতে পাচ্ছে না? শরীফ চাচার মৃত্যুর পর চাচী কি অন্য কোথাও গিয়ে থাকছেন, নাকি রাতের অন্ধকারে কেউ কিছু লক্ষ্য করছে না?

মোনার মন পড়ে আছে দোতলার ছোট্ট ঘরটায়। ওখান থেকে কোন শব্দ ভেসে আসছে না। এমনকি বাচ্চাদের কান্না বা হাসির শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। ওরা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? নাকি রুস্তম শের খুন করেছে ওদের সবাইকে! বারবার চেষ্টা করেও মোনা রুস্তম শেরের

পকেটে রাখা রূপালী রঙের চকচকে ক্ষুরটার কথা ভুলতে পারছে না।

দু'কাপ চা বানিয়ে নিয়ে এল মোনা। অন্তত একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকা যাবে কিছুক্ষণ। মুখোমুখি দুটো সোফায় বসে কাপে চুমুক দিল ওরা।

শাহেদ হঠাৎ বলে উঠল, 'যত সময় যাবে রুস্তম শের সুস্থ হয়ে উঠতে থাকবে, আর জাহিদ অসুস্থ হতে শুরু করবে, তাই না?'

চমকে ওঠায় মোনার কাপ থেকে চা ছলকে পড়ল। আশ্চর্য, বাচ্চাদের চিন্তায় মগ্ন থেকে এমন জরুরি ব্যাপারটাই ভুলতে বসেছিল সে।

বাইরে পাখিরা নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে।

পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে—অসহায়ের মত ভাবল মোনা—আর কোন আশা নেই। সব শেষ!

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে কোথায় যেন শক্তিশালী বাতাস গাক খেতে শুরু করল। বাতাসের শোঁ শোঁ গর্জনে চমকে উঠে দাঁড়াল ওরা। ঝড় উঠল নাকি! জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই চেঁচিয়ে উঠল মোনা, 'শাহেদ ভাই···!' চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, পেছন দিকে উল্টে পড়ে যাচ্ছে ও, দু'হাতে নিজের গলা চেপে ধরেছে!

ভাঙা বাঁশীর কর্কশ সুরের মত শিস শোনা যাচ্ছে উপরতলায়। পরমুহূর্তেই গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রুস্তম শের, 'জাহিদ! কি করছ তুমি, জাহিদ? কি করছ তুমি?' ধাতব শব্দ শোনা গেল। তারপর একসঙ্গে কেঁদে উঠল বাচ্চারা।

বাইরে তখন রাতের আঁধার কেটে মাটি ছেড়ে একসঙ্গে শূন্যে ডানা মেলেছে লক্ষ লক্ষ চড়ুই।

শাহেদ আর মোনা দরজা টেনে বেরিয়ে যেতেই নোটপ্যাড টেনে নিল জাহিদ, হাতে পেন্সিল।

'বিয়ে-বাড়ির দৃশ্যটা দিয়ে শুরু করব,' রুস্তম শেরের উদ্দেশ্যে বলল সে।

'হ্যাঁ, ওখান থেকেই শুরু হবার কথা,' আগ্রহ ফুটে উঠেছে রুস্তম শেরের কণ্ঠে।

সাদা কাগজের গায়ে পেন্সিলটা বসাবার আগে একটু অপেক্ষা করল জাহিদ। প্রথম আঁচড় কাটার ঠিক আগের এই মুহূর্তটুকু সব সময়ই উপভোগ করে ও।

তারপর ঝুঁকে পড়ে লিখতে শুরু করল। ধীরে ধীরে লেখার গতি বাড়তে থাকল। পুরো চল্লিশ মিনিট পর থামল জাহিদ। মানসপটে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে বিয়ে-বাড়ির দৃশ্যটা। বঙ্গভবনে মহামান্য প্রেসিডেন্টের মেয়ের বিয়ের আসর। গালকাটা জয়নাল মিশে গেছে সুবেশী অতিথি-অভ্যাগতদের ভিড়ে। রোস্ট করা আস্ত খাসীর পেটে লুকানো আছে মেশিন পিস্তল। মাইল দু'য়েক দূরে হেলিকপ্টারে অপেক্ষা করছে সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী মেজর জেনারেল এবং তাঁর অনুগত তিনজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার। সিগন্যালের জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই, একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রেসিডেন্ট এবং বিয়ে

উপলক্ষ্যে হাজির তাঁর সব সাঙ্গপাঙ্গদের ওপর।

'একটা ফাইভ ফাইভ দাও তো,' পেন্সিল নামিয়ে রেখে রুস্তম শেরের দিকে হাত বাড়াল জাহিদ।

একটু অবাক হলেও পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল, এক আঙুলে মুখটা খুলে একটু ঝাঁকি দিতেই দুটো সিগারেট বেরিয়ে এল। 'তুমি তো সিগারেট ছেড়ে দিয়েছ বহুদিন,' বিস্ময় প্রকাশ করল রুস্তম শের।

'কেন যেন ইচ্ছে করল হঠাৎ।' রুস্তম শেরের বাড়িয়ে ধরা হাত থেকে ম্যাচ নিয়ে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল জাহিদ। প্রথমবার টান দিতেই বিশ্রী স্বাদে ভরে গেল মুখের ভেতরটা, খুকখুক করে কেশে উঠল।

নোটপ্যাডটা রুস্তম শেরের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'এবার তোমার পালা।'

রুস্তম শের গল্পটা জানে, পুরোটা পড়ার দরকার নেই। তাই শুধু জাহিদের লেখা শেষ প্যারাগ্রাফটা পড়ল সে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ভীরু চোখে জাহিদের দিকে চাইল রুস্তম শের।

'আমার ভয় করছে, বস্!' একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে ওকে। একটুও ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না, দু'চোখে নিখাদ শঙ্কা।

হৃদয়ের গভীরে কোথায় যেন ওর জন্যে স্নেহ জেগে উঠল। জাহিদের কোন ভাইবোন নেই, ও জানে না ভাইবোনের মায়া কিরকম। হঠাৎ করে মনে হল এটাই কি ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালবাসা?

না। শক্ত হাতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করল জাহিদ। এ হতে পারে না।

'কোন ভয় নেই। চেষ্টা কর, পারবে।' ওকে অভয় দেবার ভঙ্গিতে বলল জাহিদ।

মনোযোগ দিয়ে আরও দু'বার শেষ প্যারাগ্রাফটা পড়ল রুস্তম

শের। তারপর ধীরে ধীরে লিখতে শুরু করল।

'জয়নাল খাবার টেবিলের আশেপাশে...' একটু থেমে আবার লিখল। 'ঘোরাঘুরি করছে।' আবার কিছুক্ষণ বিরতি, তারপর লিখল 'সময় ঘনিয়ে আসছে, এক্ষুনি অতিথিদের ডাক পড়বে খাবার টেবিলে। খাসীর রোস্টের কাছাকাছি থাকতে হবে ওকে।'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সদ্য লেখা বাক্য তিনটে পড়ল রুস্তম শের। তারপর নোটপ্যাডটা জাহিদের দিকে ঠেলে দিল, দু'চোখে নববধূর লজ্জা।

চোখ বুলিয়ে মাথা নাড়ল জাহিদ, 'এই তো, হচ্ছে।' নিজের অজান্তেই ডান হাতটা ঠোঁটের বাঁ কোণে উঠে এল, জ্বালা করছে জায়গাটা। আঙুল বুলাতে টের পেল তাজা একটা ঘা দেখা দিয়েছে ঠোঁটের কোণে। একটু লক্ষ করতেই দেখল একই জায়গায় রুস্তম শেরের যে ঘা'টা ছিল, তা অদৃশ্য হয়েছে।

ঘটতে শুরু করেছে! পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে!

শিউরে উঠল জাহিদ।

উপুড় হয়ে মনোযোগ দিয়ে লিখছে রুস্তম শের।

আধঘন্টা পর থামল। পিঠ টান করে জ্বলজ্বলে চোখে জাহিদের দিকে তাকাল, 'আশ্চর্য! আমি লিখতে পারছি! তোমার চেয়ে কোন অংশেই খারাপ হচ্ছে না।'

নোটপ্যাডটা টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করল জাহিদ। নয় পৃষ্ঠা লিখেছে রুস্তম শের। তিন পৃষ্ঠা পড়ার পর যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেল জাহিদ।

'খসখসে শব্দ শুনে চড়ুই শক্ত হয়ে মেশিন পিস্তলে চেপে চড়ুই বসল

জয়নালের দু'হাতের আঙুল। টেবিলের চারপাশ থেকে চড়ুই সবাই ছিটকে সরে যাচ্ছে চড়ুই দূরে। জরি আর মহার্ঘ্য সিল্কের চড়ুই পোশাকে ঘষা লেগে চড়ুই অদ্ভুত খসখসে শব্দ উঠছে। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতে চড়ুই চিৎকার করে উঠল মহিলারা।'

রুস্তম শের টের পায়নি! বার বার অকারণে 'চড়ুই' শব্দটা লিখে যাচ্ছে অথচ একটুও টের পাচ্ছে না সে!

উড়ে এসে ছাদের ওপর বসছে চড়ুইরা, খসখসে শব্দ হচ্ছে। রূপক আর রুমকি ঘুমিয়ে পড়ার আগে বারবার ছাদের দিকে তাকাচ্ছিল। ওরাও বুঝতে পারছে অথচ রুস্তম শের কিছু টের পাচ্ছে না!

রুস্তম শেরের কাছে পাখিদের কোন অস্তিত্ব নেই।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে যেতে থাকল জাহিদ। শেষ প্যারাগ্রাফে ঘটনা রূপ নিতে শুরু করেছে।

'গালকাটা জয়নালের চারপাশে শুধু পাখি আর পাখি। ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে। দশ বছর ধরে ওদের সঙ্গে উড়ছে সে। আবার উড়তে শুরু করেছে পাখিরা।'

জাহিদ মুখ তুলে চাইতে রুস্তম শের আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন হয়েছে?'

'খুব ভাল। দারুণ। তুমি তো সেটা জানোই।'

'তাও তোমার মুখ থেকে শুনতে ভাল লাগে।'

'শুধু লেখা নয়, তোমার চেহারাও অনেক ভাল দেখাচ্ছে,' জাহিদ শান্তভাবে বলল।

কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

রুস্তম শেরের শরীরের ক্ষতগুলো মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে।

পাতলা গোলাপী চামড়া জোড়া নিতে শুরু করেছে ঘাগুলোকে হটিয়ে দিয়ে। পচে যাওয়া ত্বকের তলা থেকে ভেসে উঠেছে ভুরুর চুল। শার্টের কলারে গড়িয়ে পড়া পুঁজ শুকিয়ে শক্ত হয়ে উঠেছে।

আঙুলের ডগায় নিজের গালে সদ্য গজানো ঘা দুটো স্পর্শ করল জাহিদ। তারপর চোখের সামনে ধরল আঙুলটা। ভেজা। রস বের হতে শুরু করেছে। কপালের কাটা জায়গাটা স্পর্শ করল জাহিদ। আশ্চর্য! নিখুঁত নিভাঁজ ত্বক—অদৃশ্য হয়েছে কাটা দাগটা।

হাতে ঘড়ি নেই, ক'টা বাজে বুঝতে পারল না জাহিদ। মধ্যরাতের এখনও অনেক দেরি। তবে তাতে কিছু আসে যায় না।

জাহিদের ভাবান্তর লক্ষ্য করল রুস্তম শের, 'তুমি কি ক্লান্ত? একটু বিশ্রাম নিতে পার ইচ্ছে করলে।'

'তাই ভাবছি।' উঠে দাঁড়াল জাহিদ, 'তুমি লিখতে থাক।'

নবউদ্যমে লিখতে শুরু করল রুস্তম শের, জীবনী শক্তির অভাব নেই। জাহিদের দিকে খেয়াল নেই, সব আগ্রহ কাগজ আর পেন্সিলের দিকে। জাহিদ পেন্সিলের বাক্স রাখা টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল। শার্পনার বের করে মনোযোগ দিয়ে পেন্সিল কাটল। তারপর ফিরে আসতে আসতে পকেট থেকে আবুল হাশেম ভূঁইয়ার দেয়া বাঁশীটা আলগোছে তুলে নিয়ে মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে ফেলল। চেয়ারে বসতে বসতে তীক্ষ্ণ চোখে রুস্তম শেরকে লক্ষ্য করল। কিছু সন্দেহ করেনি সে। আপনমনে লিখে চলেছে!

সময় হয়ে গেছে! কোন সন্দেহ নেই এটাই উপযুক্ত সময়। শুধু ভয় হচ্ছে সাহসে কুলোবে কিনা।

হৃদয়ের গহনে কোথায় যেন এক ধরনের প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। লেখাটা শেষ করার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে ভেতরটা। কিন্তু একই সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করছে জাহিদ। ধীরে ধীরে বিযুক্ত হয়ে যাচ্ছে আলাদা দুটো সত্তা। ও আর রুস্তম শের নয়।

শক্ত করে বাঁশীটা মুঠোয় চেপে ধরে সামনে ঝুঁকে শিখতে শুরু করল জাহিদ।

'আমিই আবাহনকারী।'

মাথার ওপর ছাদে পাখিদের নড়াচড়া থেমে গেল।

'আমিই ওদের চালিকাশক্তি।'

বাইরে মৃত্যুর মত নীরবতা। মেঝেতে শুইয়ে রাখা ঘুমন্ত রূপক আর রুমকির নিষ্পাপ মুখের দিকে চেয়ে শক্তি সঞ্চয় করার চেষ্টা করল জাহিদ। আর মাত্র তিনটে শব্দ! তারপরেই বহু আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি! রুস্তম শের, মন দিয়ে লিখে যাও তুমি, মুখ তুলে দেখ না! খোদা, ওকে আর কিছুক্ষণের জন্যে ব্যস্ত রাখ তুমি!

কাঁপা কাঁপা হাতে বড় বড় অক্ষরে লিখল,

'পাখিরা আবার উড়ছে!'

বাইরে ঝড়ের মত শব্দ উঠল। লক্ষ লক্ষ চড়ুই পাখি ডানা ঝাপটে শূন্যে উড়াল দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে খুলে গেল জাহিদের তৃতীয় নয়ন। চড়ুই পাখি ছাড়া ওর জগতে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই।

ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল রুস্তম শের, দু'চোখে সন্দেহ আর সতর্কতা।

লম্বা শ্বাস নিয়ে বাঁশীতে ফুঁ দিল জাহিদ।

'জাহিদ! কি করছ তুমি, জাহিদ? কি করছ তুমি?'

হাহাকার করে উঠল রুস্তম শের। থাবা দিয়ে কেড়ে নিতে চাইল বাঁশীটা। জাহিদের ঠোঁট কেটে দিয়ে ফটাশ করে ভেঙে গেল কাঁচের তৈরি বাঁশী। ঘুম ভেঙে যাওয়ায় চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল রুমকি, রূপকও অবিলম্বে যোগ দিল।

বাইরে চড়ুইদের ডানা ঝাপটানর শব্দ গর্জনে পরিণত হয়েছে।

পাখিরা উড়তে শুরু করেছে।

বাচ্চাদের কান্না শুনে পাগলের মত সিঁড়ির দিকে দৌড়াতে শুরু করেছে

মোনা। জানালার দৃশ্য দেখে কিছুক্ষণের জন্যে চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলল শাহেদ। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পাখি উড়ে আসছে এদিকে, কাঁচ ঢাকা জানালার ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত চড়ুই পাখি ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না—যেন কেউ চড়ুই পাখির তৈরি একটা চাদর গুঁড়ে দিয়েছে জানালাগুলো লক্ষ্য করে। সশব্দে আছড়ে পড়ছে কাঁচের ওপর ছোট্ট ছোট্ট পালকঢাকা নরম শরীরগুলো। ভোঁতা শব্দ উঠছে কাঁচের ধাক্কা খেয়ে।

'ভাবী!' চিৎকার করে উঠল শাহেদ, 'মাথা নিচু করে বসে পড়ুন! ভাবী!'

মোনা থামল না, ওর বাচ্চারা কাঁদছে! কার সাধ্য মোনাকে থামায়? হোঁচট খেতে খেতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। ফাটল ধরতে শুরু করেছে জানালার কাঁচে। প্রাণপণে দৌড় দিল শাহেদ। কাঁচ ভেঙে কয়েক হাজার চড়ুই ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। ঠিক তক্ষুণি মোনাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে লাফিয়ে মেঝেতে শুয়ে গড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল শাহেদ। ঘরময় উড়ে বেড়াচ্ছে কয়েক হাজার চড়ুই, আরও কয়েক হাজার জানালা গলে ঢুকে পড়েছে। মুহূর্তের মধ্যে পাখির ভিড়ে ঘরে তিল ধারণের জায়গা রইল না।

উপুড় হয়ে মোনার পিঠের ওপর শুয়ে পড়ে ওর শরীরটা ঢেকে দিল শাহেদ। একই সঙ্গে ওকে টানতে টানতে সোফার নিচে ঠেলে দিল, নিজেও শুয়ে পড়ল ওর পাশাপাশি। পাখা ঝাপটানির খসখসে শব্দ আর কিচিরমিচির ধ্বনিতে কানে তালা লাগার উপক্রম হল। ঘরের অন্যান্য জানালার কাঁচও ভেঙে পড়ছে ঝনঝন শব্দ তুলে। সোফার তলা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল শাহেদ—সাদা আর বাদামি পালকে ঢাকা শরীরগুলোর নড়াচড়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

জানার ধাক্কা লেগে টেবিল আর শেলফের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ছে পিতলের ফুলদানি, শো পিস, অ্যাশট্রে। ঝনঝন শব্দ তুলে

ভেঙে যাচ্ছে কাঁচের জিনিসপত্র। দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডার আর ফ্রেম করা ছবিগুলো খসে পড়ছে। ঘরময় উড়ছে ম্যাগাজিন আর বইয়ের ছেঁড়া পৃষ্ঠা। রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে কাঁচের প্লেট-গ্লাস ভাঙার শব্দ, মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে হাঁড়ি-পাতিল।

ওপরে কেঁদে খুন হয়ে যাচ্ছে বাচ্চারা, চিৎকার করছে মোনা, 'ছেড়ে দিন আমাকে!' শাহেদের হাতের বাঁধন ছাড়াবার জন্যে ছটফট করছে, 'আমার বাবুসোনারা! আমাকে যেতে দিন! আমি ওদের কাছে যাব! ছেড়ে দিন আমাকে!'

প্রাণপণে মোনাকে মেঝের সঙ্গে চেপে ধরে রাখার চেষ্টা করছে শাহেদ। আঁচড়ে-কামড়ে ওকে ক্ষতবিক্ষত করে দেবার চেষ্টা করছে মোনা, চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে।

'উঃ!' আর্তনাদ করে উঠল শাহেদ, ওর হাতে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে মোনা। বাঁধন শিথিল হতেই গড়িয়ে সোফার নিচ থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল মোনা। মুহূর্তে ওর ওপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়েক'শ চড়ুই। শাড়ির ভাঁজে, চুলের ভেতর ডানা ঝাপটাচ্ছে বিপুল বেগে। পাগলের মত দু'হাতে ঝাপটা মেরে পাখিগুলোকে তাড়ানর বৃথা চেষ্টা করল মোনা। শাহেদ ওর কোমর জড়িয়ে ধরে আবার টেনে নিয়ে এল সোফার তলায়। এক পলকের জন্যে চোখে পড়ল সিঁড়ির ওপর কালো মেঘের মত উড়ে চলেছে চড়ুই পাখির ঝাঁক, পৌঁছে গেছে দোতলায়।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রুস্তম শের, চঞ্চল চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে। গলা ফাটিয়ে কেঁদে চলেছে রূপক আর রুমকি। বুক শেলফ দিয়ে ঢাকা জানালাটার কাঁচ ভেঙে পড়ল, দেয়ালের ওপারে ধপ্‌ধপ্ করে কিছু আছড়ে পড়ছে। নিচ থেকে জিনিসপত্র ভাঙার শব্দ ভেসে আসছে, মনে হল যেন চিৎকার করে উঠল মোনা। চড়ুইদের পাখা ঝাপটানর শব্দ আর কিচিরমিচির ধ্বনি স্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রতিমুহূর্তে।

'বন্ধ কর, জাহিদ!' আর্তনাদ করে উঠল রুস্তম শের। 'বন্ধ কর! যা-ই শুরু করে থাক না কেন, বন্ধ কর! দোহাই লাগে বন্ধ কর!'

টেবিলের ওপর থেকে রিভলভারটা তুলে নেবার জন্যে হাত বাড়াল রুস্তম শের, ঠিক সেই মুহূর্তে সদ্য কাটা পেন্সিলের তীক্ষ্ণ ডগা ছুরির মত ওর গলায় বসিয়ে দিল জাহিদ।

জন্তুর মত চিৎকার করে উঠল রুস্তম শের, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। বাঁ হাতে একটানে পেন্সিলটা গলা থেকে খুলে নিয়ে এল সে, নদীর মত রক্ত বইছে। 'কি হচ্ছে এসব? কি করছ তুমি?' পাখিদের শব্দ শুনতে পাচ্ছে রুস্তম শের, ভীত বালকের মত বারবার বন্ধ দরজার দিকে দেখছে। জাহিদ এই প্রথম ওর চোখে ভয়ের চিহ্ন দেখতে পেল। উল্টে গেছে দাবার ছক।

'গল্পের শেষ দৃশ্যে চলে এসেছি আমরা, রুস্তম শের,' ধীরে ধীরে বলল জাহিদ, 'শেষ লাইনটা লিখে ফেলেছি।'

'ঠিক আছে,' উদভ্রান্তের মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে রুস্তম শের, 'শেষটা তবে সবার জন্যেই হোক!'

এক হাতে পয়েন্ট ফোর ফাইভ আর অন্য হাতে তীক্ষ্ণধার পেন্সিল তুলে বাচ্চাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল রুস্তম শের।

পুরানো কম্বল দিয়ে ঢাকা ছিল সোফাটা যাতে ধুলো পড়ে নষ্ট না হয়ে যায়। বাড়িতে ঢুকে মোনা কম্বলটা ভাঁজ করে একদিকের হাতলের উপর রেখে দিয়েছিল। সোফার নিচ থেকে হাত বাড়িয়ে শাহেদ কম্বলটা খোঁজার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে 'ধ্যাত্তেরিকা' বলে অস্ফুটে গুঙিয়ে উঠে টেনে নিল হাতটা, লক্ষ লক্ষ সুঁই ফোটার অনুভূতি হাতের চামড়ায়।

এদিকে মোনা এখনও ধস্তাধস্তি করছে সোফার নিচ থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্যে। চড়ুইদের কিচিরমিচির আর পাখা ঝাপটানর শব্দে কানে

ভালো লাগার উপক্রম হয়েছে, প্রচণ্ড গোলমাল ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। বাচ্চাদের কান্নার শব্দও চাপা পড়ে গেছে। হাঁচড়ে পাঁচড়ে সোফার তলা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে মোনা।

'ভাবী! দাঁড়ান!' শাহেদ ওকে টেনে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু কে শোনে কার কথা! মোনার বাচ্চারা কাঁদছে, পৃথিবীতে এমন কেউ নেই ওকে এ-মুহূর্তে আটকায়। ডান হাতে মোনার কোমর জড়িয়ে ধরে থাকল শাহেদ, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করার চেষ্টা করছে হাতের পিঠে সুঁই ফোটানর মত যন্ত্রণা। বাইরে বেরিয়ে আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে চড়ুইরা। রান্নাঘরে প্রচণ্ড শব্দ তুলে উল্টে পড়ল কোন ফার্নিচার, সম্ভবত ছোট মিটসেফটা। কাণ্ডটা ঘটাতে কতগুলো চড়ুই পাখির দরকার হয়েছে ভাবতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে উঠল।

সোফার নিচ থেকে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হল শাহেদ, মোনা আসুরিক শক্তিতে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে—একই সঙ্গে পাগলের মত চিৎকার করতে করতে দু'হাতে মাথা ঢেকে চড়ুইদের ছুঁচাল শক্ত ঠোঁটের আক্রমণ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে। এক হাতে ওকে শক্ত করে ধরে থেকে অন্য হাতে কম্বলটা টেনে নিল শাহেদ। ভাঁজ খুলে দ্রুত কম্বলের নিচে ঢুকে পড়ল. মোনাকেও জোর করে কম্বলের নিচে ধরে রাখল। গোটা ছয়েক চড়ুইও ঢুকে পড়েছে ওদের সাথে। পাখার ঝাপটা লেগে শাহেদের ডান গাল জ্বলে উঠল। মাথার তালুতে ঠোক্কর বসিয়েছে আর একটা। বাঁ হাতে ঝাপটা মারতেই একটা পাখি লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। মোনার শাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে গোটাকতক, পাগলের মত লাফাচ্ছে সে।

মোনাকে শক্ত করে ধরে থেকে ওর কানের কাছে চিৎকার করল শাহেদ, 'ভাবী! আমরা হাঁটব। কম্বল মাথায় দিয়ে হেঁটে যাব আমরা। দৌড়াবার চেষ্টা করবেন না। দৌড়ালে আমি কিন্তু ল্যাঙ মেরে ফেলে দেব!' মোনার চুলের ভেতর ঢুকে পড়েছে একটা চড়ুই, আঁচড়ে-খামচে

মেরে ফেলার চেষ্টা করছে ও পাখিটাকে। শাহেদের কথা শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না। মৃগী রোগীর মত কাঁপছে ওর শরীর, পশুর মত গোঙাচ্ছে। শাহেদ মোনার দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকাল, 'ভাবী, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পেলে মাথা ঝাঁকান, প্লীজ!'

হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল মোনা, মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। শিথিল হয়ে গেছে শরীরের মাংসপেশী।

ভালভাবে কম্বল ঢাকা দিয়ে সোফার নিচ থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এল ওরা। মোনাকে ধরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল শাহেদ, তারপর হাঁটতে শুরু করল। দু'হাতে শক্ত করে মোনাকে নিজের শরীরের সঙ্গে চেপে ধরে আছে, বলা যায় না যে-কোন মুহূর্তে ছুট লাগাতে পারে। আন্দাজে সিঁড়ির দিকে এগোল।

এ বাড়িতে বসার ঘরটাই সবচেয়ে বড় আর খোলামেলা। পুরানো দিনের স্থাপত্য, উঁচু কড়িবরগা। অথচ মনে হচ্ছে শ্বাস নেবার মত এক বিন্দু বাতাসও নেই কোথাও। পাখিদের দুর্গন্ধে টেকা দায়। দম বন্ধ হয়ে এল কম্বলের নিচে।

মনে হল যেন অনন্তকাল পরে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছল ওরা। ধীরে ধীরে সাবধানে ওপরে উঠতে শুরু করল। মাথার ওপরের কম্বল আর সিঁড়ির ধাপগুলো সাদা হয়ে গেছে পাখির বিষ্ঠা আর খসে পড়া পালকে। সিঁড়ির মাঝামাঝি আসতেই গুলির শব্দ হল দোতলায়, শাহেদ এখন শুনতে পাচ্ছে বাচ্চাদের বুকফাটা কান্না।

রুস্তম শের রূপকের দিকে রিভলভার তাক করতেই জাহিদ চোখের পলকে ভারী কাঁচের পেপারওয়েইটটা তুলে নিয়ে ওর কব্জি লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। বন্ধ ঘরে বাজ পড়ার মত শব্দ তুলে গুলি বেরিয়ে এল, রূপকের বাঁ পায়ের ঠিক আধ ইঞ্চি দূরে মেঝের চন্টা উঠে ছিটকে পড়ল। ফুসফুস ফাটিয়ে কাঁদছে বাচ্চারা, আত্মরক্ষার স্বাভাবিক

প্রবণতায় জড়িয়ে ধরে আছে ওরা পরস্পরকে।

পরমুহূর্তেই জাহিদের বাঁ বাহুতে বিদ্ধ হল রুস্তম শেরের চোখা পেন্সিল। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠে ওকে ঠেলে দিল জাহিদ। চেয়ারে পা বেধে হোঁচট খেতে খেতে দেয়ালে পিঠ দিয়ে সামলে নেবার চেষ্টা করল রুস্তম শের, বাঁ হাত থেকে রিভলভারটা ডান হাতে নিতে যেতেই হাত ফস্কে মাটিতে পড়ে গেল সেটা।

দরজার ওপারে সমুদ্রের গর্জন, বদ্ধ দরজায় আছড়ে পড়েছে হাজারটা ঢেউ। এক ঢিলতে ফাঁক পেতেই তীরের মত ঢুকে পড়ল একটা চড়ুই, ছুঁড়ে দেয়া ঢিলের মত গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

প্যান্টের ব্যাকপকেট থেকে এক ঝটকায় ক্ষুর বের করল রুস্তম শের। আলো পড়ে একই সঙ্গে ঝিক করে জ্বলে উঠল ক্ষুরের রূপোলী ফলা আর জীঘাংসা ভরা দু'চোখ।

এদিকে সিঁড়িতে থেমে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে শাহেদ আর মোনা। সামনে চড়ুই পাখিদের তৈরি করা দেয়াল। হাজার হাজার চড়ুই একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে থমকে গেছে সিঁড়ির ওপরের দিকটায়, কার সাধ্য সেই ব্যূহ ভেদ করে এগোয়! মোনা ভয় পেয়ে আবার চিৎকার শুরু করেছে। যদিও পাখিরা ওদের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না, আগের মত ওদের ওপর ঝাঁপিয়েও পড়ছে না। কম্বলের নিচে নিরাপদেই আছে ওরা। কিন্তু সামনে এগোনো মুশকিল হয়ে পড়েছে।

'বসে পড়ুন, ভাবী!' মোনার কানের কাছে চিৎকার করল শাহেদ, 'বসে পড়ুন! ওদের নিচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া যায় কিনা দেখি!'

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মোনা আর শাহেদ। কয়েক ইঞ্চি পুরু খসে পড়া পালক আর অসংখ্য রক্তাক্ত পাখির মৃতদেহের ওপর দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আবার থেমে পড়তে হল। কম্বলটা তুলে বাইরে একঝলক তাকিয়েই শিউরে উঠল শাহেদ। হাজার হাজার চড়ুই প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে

যাচ্ছে দোতলার দিকে, সিঁড়ির ওপরের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে রক্তাক্ত শরীরে গড়িয়ে পড়ছে নিচে। মৃতদেহের পাহাড় গড়ে উঠেছে সামনে।

পুরুষ কণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে এল।

শাহেদের শার্টের কলার ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল মোনা, কান্নায় ভেঙে পড়েছে, 'কি করব আমরা, শাহেদ ভাই?'

শাহেদ কোন উত্তর দিল না। দেবার মত উত্তর ওর জানা নেই।

মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মত ক্ষুর হাতে এগিয়ে আসছে রুস্তম শের। ঝট করে আর একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে দ্রুত পিছিয়ে গেল জাহিদ। এরমধ্যেও লক্ষ্য করল রুস্তম শেরের ত্বকের শুকিয়ে আসা ঘাগুলো আবার তাজা হতে শুরু করেছে।

'ওই পেন্সিল দিয়ে তুমি আমার কি করবে, বস্?' বলতে বলতে দরজার দিকে তাকাল রুস্তম শের, বিস্ময় আর আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ দুটো। আধাআধি খুলে গেছে দরজার পাল্লা। নদীর স্রোতের মত ঢুকছে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই পাখি, এগিয়ে যাচ্ছে রুস্তম শেরের দিকে।

'না!' চিৎকার করে উঠল রুস্তম শের, এলোমেলো ক্ষুর চালাচ্ছে চড়ুই পাখির অরণ্যে, 'না! আমি যাব না! কেউ আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না!'

ক্ষুরের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল ছোট্ট একটা চড়ুই, কিন্তু বাকিগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল একযোগে।

মুহূর্তে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। চড়ুই বাহিনী রুস্তম শেরকে নিয়ে যেতে এসেছে! ওরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে মৃতের জগতে, যেখান থেকে ও এসেছে।

পেন্সিলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রূপক আর রুনকিকে কোলে তুলে নিল জাহিদ। পাখিতে ভর্তি হয়ে গেছে ছোট্ট ঘরটা। দরজাটা পুরোপুরি

খুলে গেছে, পাখির স্রোত পরিণত হয়েছে বন্যায়।

দু'হাতে পাখিদের তাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে রুস্তম শের। বৃষ্টির মত করে পড়ছে আক্রান্ত পাখিদের খসে পড়া পালক। কিন্তু ক'জনকে রুখবে সে? তীক্ষ্ণ ঠোঁট, ধারাল নখ আর শক্তিশালী পাখা নিয়ে হামলে পড়েছে শত শত চড়ুই। হাত থেকে খসে পড়ে মেঝেতে জমে ওঠা পুরু পালক আর অসংখ্য প্রাণহীন দেহের নিচে হারিয়ে গেল ক্ষুরটা।

রূপক আর রুমকিকে দু'হাতে যতটা সম্ভব আড়াল করার চেষ্টা করল জাহিদ। যদিও পাখিরা ওদের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না। বাচ্চারা কান্না থামিয়ে অবাক হয়ে দেখছে—জানালায় হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি পরীক্ষা করে দেখার ভঙ্গিতে সামনে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওরা—জলভরা চোখে নির্ভেজাল খুশি। খুলে ধরা ছোট্ট ছোট্ট চারটে হাতের পাঞ্জায় চারটে চড়ুই এসে বসল, কিন্তু ঠোকরাবার চেষ্টা করল না। অথচ রুস্তম শেরকে অবিরাম ঠুকরে যাচ্ছে ওরা।

রুস্তম শেরের সারা শরীর ভেসে যাচ্ছে রক্তে। একটা চড়ুই ওর ঘাড়ে বসে ঠোঁট ঢুকিয়ে দিল গলায় জাহিদের পেন্সিলের আঘাতে তৈরি গোল ছিদ্রে। সেলাই মেশিনের মত উঠছে আর নামছে ঠোঁটটা। অসহ্য যন্ত্রণায় জন্তুর মত গোঙাচ্ছে রুস্তম শের। গলার ওপর থেকে এক ঝটকায় পাখিটাকে তুলে নিয়ে চটকাতে শুরু করল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা তার জায়গা নিল।

জাহিদের কাঁধে এসে বসেছে একটা, কিন্তু আক্রমণের কোন চেষ্টা করল না। একদৃষ্টে চেয়ে আছে রুস্তম শেরের দিকে।

অদৃশ্য হয়ে গেছে রুস্তম শের পাখিদের আড়ালে। ওকে এখন চড়ুই পাখিতে তৈরি বিমূর্ত শিল্পকর্মের মত দেখাচ্ছে।

'ওরা তোমাকে নিতে এসেছে, রুস্তম শের,' বিড়বিড় করে বলল জাহিদ, 'ফিরে যাও তুমি।'

ধীরে ধীরে পাখিদের দেয়ালটা হালকা হতে শুরু করেছে, অনুভব করল

শাহেদ। একটু আগে নিচে বসা ঘরের বাল্ব দুটো বিস্ফোরিত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেছে আলো। ওপর থেকে অল্প আলোর রেখা এসে পড়েছে সিঁড়িতে, কিন্তু কম্বলের নিচে জমাট অন্ধকার। শাহেদ অনুমান করল পথ পেয়ে গেছে পাখিরা, উড়ে চলে যাচ্ছে একযোগে।

'ভাবী!' মোনার হাত ধরে টানল শাহেদ, 'আস্তে আস্তে এগোতে থাকেন।' হাঁটু সমান উঁচু পালক আর মৃত পাখির ভিড় ঠেলে বহু কষ্টে এগোতে থাকল ওরা।

সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছতেই জাহিদের চিৎকার কানে এল, 'নিয়ে যা! নিয়ে যা ওকে, যেখানে ওর থাকার কথা সেখানে নিয়ে যা!'

শেষ চেষ্টা করল রুস্তম শের। পালাবার কোন রাস্তা নেই, তবুও চেষ্টা করল সে। কারণ সেটাই ওর প্রকৃতি।

অবশিষ্ট সমস্ত শক্তি এক করে ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাইল রুস্তম শের। কাপড়ের মত ওর গায়ে সেঁটে থাকা চড়ুইয়ের স্তরটা মুহূর্তের জন্যে একটু দূরে সরে এল, পর মুহূর্তেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে আগাগোড়া মুড়ে ফেলল। বিভীষিকার মত ওই এক মুহূর্তে জাহিদ যা দেখল তা সারাজীবন ধরে দুঃস্বপ্ন হয়ে তাড়া করে বেড়াবে ওকে।

চড়ুইরা রুস্তম শেরকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলছে। চোখের কোন চিহ্ন নেই, শূন্য কোটরে শুধু অন্ধকার। নাকের জায়গায় বড় একটা ফুটো, গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। মাথার খুলিতে চামড়া নেই, সাদা হাড় বেরিয়ে পড়েছে। শার্টের কলারটা এখনও গলায় লটকে আছে, শরীরে কাপড়ের আর কোন চিহ্ন নেই। পাঁজরের হাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পেটটা ফুটো করে দিয়েছে চড়ুইরা, ফুটো দিয়ে নাড়িভুঁড়ি গড়িয়ে পড়েছে বাইরে।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করল জাহিদ।

চড়ুইরা রুস্তম শেরকে শূন্যে তুলে ফেলার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণের

মধ্যেই চেষ্টাটা সফল করে, কারণ প্রতি মুহূর্তেই ওজন হারাচ্ছে রুস্তম শের।

প্রচণ্ড ঘৃণায় চেঁচিয়ে উঠল জাহিদ, 'নিয়ে যা! নিয়ে যা ওকে। সেখানে ওর থাকার কথা সেখানে নিয়ে যা!'

ধীরে ধীরে থেমে গেল রুস্তম শেরের অন্তিম আর্তনাদ। দু'পাশে ছড়িয়ে থাকা দু'হাতের নিচে ভিড় করেছে চড়ুইরা। মাটি ছেড়ে উঠে যাচ্ছে পা দুটো। টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে একের পর এক মৃতদেহ, পরমুহূর্তেই অন্যেরা তাদের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে।

মড়মড় শব্দ তুলে একটা বুক শেলফ উল্টে পড়তে লাগল। জাহিদ বাচ্চাদের নিয়ে আগেই ঘরের এক কোণে সরে এসেছে, ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে যেতেই বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল সে। বুক শেলফের ওপাশের বন্ধ জানালাটার কোন অস্তিত্ব নেই, খোলা গহ্বর দিয়ে কালো ধোঁয়ার মত ঢুকছে আরও কয়েক হাজার চড়ুই।

বাচ্চাদেরকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে ওদের শরীর ঢেকে দিল জাহিদ, দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে ওদেরকে।

এরপর আর কিছু মনে নেই ওর।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে মোনা আর শাহেদ। কম্বলটা ঘাড়ের কাছে নামিয়ে মাথা বের করে ঘরের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল। নড়েচড়ে বেড়ানো কালো একটা মেঘ ছাড়া প্রথমে কিছু দেখা গেল না। অবশেষে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে আকার নিতে শুরু করল ভেতরের দৃশ্যাবলী।

রুস্তম শেরের শরীরের এক ইঞ্চিও খালি নেই, চড়ুই পাখিরা ঢেকে দিয়েছে ওকে। থেকে থেকে প্রতিরোধের চেষ্টা করছে সে, এখনও মরেনি।

'শাহেদ ভাই!' চেঁচিয়ে উঠল মোনা, 'ওরা শূন্যে তুলে ফেলছে

ওকে!'

কদম শেখের শরীরের অবশিষ্টাংশ ধীরে ধীরে মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে যাচ্ছে শাহিদের টেবিল কার্পেটে চড়ে। সবচেয়ে নিচতলাটা দেয়ালের গায়ের গর্তটার দিকে এগোচ্ছে। কদম শেখের শরীর থেকে এখনও দু'এক টুকরো মাংস খসে খসে পড়ছে নিচে। যদিও শাহিদের ভিড়ে ওকে দেখা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বাইরে ভেসে পড়ল ওরা।

হাঁটু সমান আবর্জনা সরিয়ে কোনমতে ঘরে ঢুকে পড়ল শাহেদ আর সোনা। বাচ্চারা তারস্বরে কাঁদছে, জাহিদ ওদেরকে নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে আছে। সোনার গলা শুনে ঘুরে তাকাল জাহিদ।

সোনা বাচ্চাদেরকে তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছে আঘাত কোথাও লেগেছে কিনা, নিঃশব্দে কাঁদছে।

'মনে হয় ওরা ঠিকই আছে,' ক্লান্ত স্বরে বলল জাহিদ।

শাহেদ দৌড়ে দেয়ালের গর্তটার পাশে এসে দাঁড়াল। রাতের আকাশে অভূতপূর্ব এক দৃশ্য। ছোট ছোট পাখির ঝাঁকে ঢেকে গেছে তারার রাজ্য, ঠিক মাঝখানে বিশাল একটা কালো ছায়া—কদম শেখের ভাসমান শরীর! ধীরে ধীরে উপরে উঠে যাচ্ছে ওরা। মাটি থেকে আকাশে ডানা মেলেছে অসংখ্য চড়ুই। এক সময় হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

ঘরের এক কোণে বসে আছে সোনা পা ছড়িয়ে। রূপক আর রুমকিকে হাঁটুতে বসিয়ে দোলাচ্ছে। ওরা কান্না বন্ধ করে হাসতে শুরু করেছে। রূপক হাত বাড়িয়ে মায়ের গাল ছুঁয়ে দিল, যেন ওকে অভয় দেবার চেষ্টা করছে। রুমকি উঠে দাঁড়িয়ে সোনার চুল থেকে একটা পালক তুলে নিল, মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছে।

'ওকে কি ওরা নিয়ে গেল?' শাহেদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে জাহিদ।

'হ্যাঁ,' বলেই দু'হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মত কাঁদতে শুরু করল

শাহেদ। কেন, তা নিজেই বুঝতে পারল না।

জাহিদ ওর পিঠে হাত বুলিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করল।

লজ্জা পেয়ে নিজেকে সামলে নিল শাহেদ, 'আমি ঠিক আছি। হঠাৎ কেন যে...' বাক্যটা শেষ করল না সে।

বাইরে থেকে একটা চড়ুই উড়ে এসে জাহিদের কাঁধে বসল।

'ধন্যবাদ,' পাখিটাকে উদ্দেশ্য করে বলল জাহিদ, 'আমি...'

হঠাৎ করেই নিষ্ঠুরভাবে জাহিদের ডান চোখের ঠিক নিচে ঠোকর দিল চড়ুই পাখিটা, রক্ত বেরিয়ে এল। পর মুহূর্তেই উড়ে গিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে মিশে গেল সে।

'কেন? কেন অমন করল পাখিটা?' মোনা প্রশ্নবোধক চোখে চেয়ে আছে ক্ষতটার দিকে।

উত্তর দিল না জাহিদ। তবে মনে হল যেন উত্তরটা সে জানে। আবুল হাশেম ভুঁইয়াও হয়ত উত্তরটা আঁচ করতে পারতেন। ওকে সাবধান করতে চেয়েছে পাখিটা। পরলোকের ওপর কোন মানুষের নিয়ন্ত্রণ খাটে না। অনধিকার চর্চা করেছে জাহিদ। শাস্তি পেতে হবে ওকে। কিন্তু কি সেই শাস্তি? সেটা কি ও পেয়ে গেছে, নাকি ভবিষ্যতের জন্যে তোলা আছে?

'ও কি মরে গেছে?' কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে প্রশ্ন করল মোনা।

'হ্যাঁ,' দৃঢ় গলায় বলল জাহিদ, 'রুস্তম শের মরে গেছে। ও নামে আর কেউ কোনদিন লিখবে না।'

বাইশ

বাচ্চাদের কোলে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল মোনা। বুক ভরে শ্বাস নিল। ভ্যাপসা গরম পড়েছে, তবুও বাতাসটা অন্তত পরিষ্কার। বাড়ির ভেতরটা নরকে পরিণত হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব দূরে সরে আসতে চাইল মোনা।

শাহেদ আর জাহিদ ওর পেছন পেছন বেরিয়েছে। চেষ্টা করেও জাহিদ এক মুহূর্তের জন্যেও বাড়িটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না। মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধের সময় গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছে বাড়িটা। দেয়ালের কিছু অংশ ধসে পড়েছে, ভাঙা কাঁচে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে জরির কুচির মত ঝিলিক দিচ্ছে। চারপাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে পাখিদের মৃতদেহ আর খসে পড়া পালক।

'আপনি কি শিওর যে এটাই একমাত্র উপায়?' প্রশ্ন করল জাহিদ।

ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল শাহেদ।

'মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম আপনি পুলিস অফিসার, প্রমাণ নষ্ট করে ফেলার জন্যে আবার অসুবিধেয় পড়বেন না তো?'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল শাহেদ, 'কিসের প্রমাণ? এই ঘটনা কেউ বিশ্বাস করবে বলে মনে করেন?'

'না, তা মনে করি না,' একটু ইতস্তত করে বলল জাহিদ, 'তবে

মনে হচ্ছে আপনি আমার ওপর রেগে আছেন। সবকিছুর জন্যে কি আপনি আমাকে দায়ী করছেন?'

'একদিনের জন্যে যথেষ্ট উত্তেজনা গেছে। দয়া করে আমাকে আর খোঁচাবেন না।' সত্যিই রেগে আছে শাহেদ. উষ্ণ স্বরে বলল, 'জলজ্যান্ত একটা লোককে চড়ুই পাখিরা উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল, নিজের চোখে সেটা দেখেছি আমি। এরপরে আর কি আশা করেন আপনি?'

জাহিদ আর কথা বাড়াল না।

সমুদ্রের দিক থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে এল।

'চলুন, কাজ শুরু করা যাক।' কোমরে হাত দিয়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখল শাহেদ, 'কে কি ভাববে কেয়ার করি না। পুড়িয়ে দিতে হবে বাড়িটা। বাতাস নেই, আশেপাশে ছড়াবে না আগুন। চারদিকের জঙ্গল কিছুটা পুড়তে পারে। আগুন ছড়াবার আগেই ফায়ার ব্রিগেড চলে আসবে।'

ফোক্সওয়াগনের চাবি ইগনিশনেই ঝুলছিল, স্টার্ট দিয়ে কিছুটা দূরে রেখে এল শাহেদ গাড়িটাকে, মোনা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চাদের কোলে নিয়ে। তারপর ফিরে এসে কালো ফোর্ড এসকর্টের পাশে দাঁড়াল। পাখির বিষ্ঠায় সাদা হয়ে গেছে গাড়িটা, এক ইঞ্চি জায়গা খালি নেই। আলগোছে হ্যাণ্ডেলে চাপ দিয়ে সামনের দরজা খুলে পাশ ফিরে সিটে বসল শাহেদ, পা দুটো বাইরে রাস্তার ওপর। জুতো খুলতে শুরু করেছে, মোজাও খুলে ফেলল। জাহিদ বিস্মিত হলেও কোন প্রশ্ন করল না। মোজা দুটো হাতে নিয়ে আবার জুতো পরে ফেলল শাহেদ। এই নোংরার মাঝে খালি পায়ে হাঁটার কোন ইচ্ছে নেই ওর। তারপর ঝুঁকে পড়ে ড্যাশবোর্ড খুলতেই একটা ম্যাচের বাক্স পেয়ে গেল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে ম্যাচটা জাহিদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিল শাহেদ। বিনা বাক্যব্যয়ে লুফে নিল জাহিদ। গিঁট দিয়ে মোজা দুটো জুড়ে নিল

শাহেদ। তারপর হেঁটে গাড়ির অন্যপাশে চলে এল. জুতোর নিচে মচমচ শব্দ উঠছে। ফুয়েল ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলে মোজার তৈরি বলিটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল যতদূর সম্ভব। বের করে আনলে দেখা গেল বেশিরভাগ অংশই ভিজে জবজব করছে। শুকনো দিকটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল শাহেদ. ভিজে অংশটা বাইরে ঝুলছে।

জাহিদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'গাড়িটা চলতে শুরু করলেই মোজাতে আগুন ধরিয়ে দেবেন. তার আগে নয় কিন্তু। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল জাহিদ।

'দুর্ঘটনার মত দেখাবে ব্যাপারটা। আশা করি কেউ কোন সন্দেহ করবে না।'

মোনা দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'কি করছ তোমরা? বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ছে।'

'আর এক মিনিট!' চেঁচিয়ে বলল জাহিদ।

শাহেদ দরজা খোলা রেখে ফোর্ড এসকর্টের সিটে এসে বসল। দুর্গন্ধে নাক বন্ধ হয়ে আসছে। ইমার্জেন্সি ব্রেক রিলিজ করে দিয়ে জাহিদের উদ্দেশে চেঁচাল, 'চলা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল জাহিদ।

বাঁ পায়ে ক্লাচ চেপে গিয়ার নিউট্রালে নিয়ে এল শাহেদ।

ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল ফোর্ড এসকর্ট। লাফিয়ে নেমে পড়ল শাহেদ। পর মুহূর্তেই দেখতে পেল জাহিদ ঠিকভাবেই ওর দায়িত্ব পালন করেছে, আগুন জ্বলছে গাড়িটার ফুয়েল ট্যাঙ্কের মুখে।

পনেরো ফুট দূরে বাড়ির সদর দরজা চুরমার করে দিয়ে কিছুটা ভেতরে ঢুকে গেল ফোর্ড এসকর্ট। ঝুরঝুর করে চুনবালি খসে পড়ছে। পেছনের বাম্পারে লাগানো স্টিকারটা পড়ল জাহিদ, 'ওস্তাদের মাইর শেষ রাতে।'

জাহিদের হাত ধরে দৌড়াল শাহেদ, তা না হলে হয়ত ওখানেই

দাঁড়িয়ে থাকত সে। আগুনের শিখা ঘিরে ধরেছে গাড়িটাকে, প্রতি মুহূর্তেই আরও উঁচুতে উঠে যাচ্ছে।

প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হল ফুয়েল ট্যাংক। পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠল। বাচ্চারা ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে পড়ল জাহিদ। আগুনের লালচে আভায় চারদিক দিনের আলোর মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। অকাতরে পুড়ে যাচ্ছে লাল ইঁটের তৈরি বাড়িটা। হু হু করে উঠল বুকের ভেতরটা, মনে হচ্ছে ওখানে কি যেন ফেলে এসেছে ও, হারিয়ে গেছে কিছু একটা চিরদিনের জন্যে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁটতে শুরু করল জাহিদ। মোনা, রূপক আর রুমকি ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan এর সৌজন্যে।

এটি তৈরি করেছেন - মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan